লক্ষ্য নাই বলিয়া বোধ হয়। এমনকি, বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধেও দুইটী বৈচিত্র্যতা, দেখা গেল। প্রত্যেক দোষটী দেখাইয়া দিতে উদ্বোধনের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান হইবে না। আশা করি সম্পাদক মহাশয় এই সামান্য কয়েকটী ইঙ্গিতেই ভবিষ্যতে প্রবন্ধনির্ব্বাচনে পত্রসম্পাদনে এবং প্রুফ সংশোধনে বিশেষ সতর্ক হইবেন।

মরণ গীতি।

——:*:——

(১)

কে ওগো বিজনে বসি মরণের গীতি গায়,
শুনিয়া আকুল প্রাণ ঘরে না রহিতে চায়।
কোথা যাব কোথা চলি
কোথায় এসেছি ভুলি
সদা শুনিতেছি ডাক "আয় আয় আয় আয়"
কে ওগো বিজনে বসি মরণের গীতি গায়।
শুনি সে মূর্চ্ছনা তার,—
প্রলয়ের হুহুঙ্কার,
চমকি উঠিছে সবে, রোমাঞ্চিত সর্ব্বকায়,
স্তব্ধ ধরা তুলি কাণ,
শুনিছে গম্ভীর গান
চমকি কান্তার প্রান্তে চকিতা হরিণী প্রায়।
লতা গুল্ম তরু দল,
মরু সিন্ধু মহাচল,
কি ক্ষুদ্র মহান্ কিবা জড় বা চেতনে হায়,
ছুটাছুটি মিশামিশি
চলে জুড়ি দশদিশি
ভয়ে স্তব্ধ চলে তবু, শুনি গান পায় পায়,
কে ওগো বিজনে বসি মরণের গীতি গায়।

(২)

একি ভীম অভিনয়,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডময়,
কি ভীষণ ব্যাকুলতা, কি করাল সম্বোধন,
"অগ্রসর অগ্রসর"
বজ্রঘোষে নিরন্তর,
জগতের ধ্বংস নীতি কে করিছে বিঘোষণ।
ওরে অন্ধ, ওরে মূক,
মুষ্টিমেয় শোক দুখ,
ভাবিস্‌না ধরিত্রীর সীমাহীন নির্য্যাতন,
এক যায়, আর আসে,
বরিষা নিদাঘে গ্রাসে,
হিমান্তে বসন্ত হাসি দুঃখে সুখ দরশন।
বিশ্বপ্লাবী আশা লয়ে,
এ কাল তরঙ্গ বেয়ে,
আমিও ছুটেছি নাথ! চড়িয়া এ ভাঙ্গা নায়,
পারিব কি যেতে কূলে,
চুম্বিতে ও পদমূলে,
অথবা ডুবিবে তরী ভৈরব তরঙ্গে হায়,
কে ওগো বিজনে বসি মরণের গীতি গায়॥

তারিখ ৩১ মার্চ্চ ১৯১০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।
কোতুলপুর

তিনটী।

গৌরবের তিনটী— জীবে দয়া, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরানুরাগ।
সম্মানের তিনটী— ন্যায়পরতা, নিরহংকারিতা, লাভে উপেক্ষা।
প্রশংসার তিনটী— চিন্তাশীলতা, সদাচার, সদালাপ।
আনন্দের তিনটী—সৌন্দর্য্য, সরলতা, স্বাধীনতা।
আদরের তিনটী—জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য।
ঘৃণার তিনটী—পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা।
চঞ্চল তিনটী—ধন, জন, যৌবন।
অবশ্যম্ভাবী তিনটী—রোগ, শোক, মৃত্যু।
পরিহরণীয় তিনটী—কাম, ক্রোধ, লোভ।
দাতব্য তিনটী—মিষ্টবাক্য, ক্ষমা ও সদ্ব্যবহার।
রক্ষণীয় তিনটী—সত্য, মৈত্রী আত্মসংযম।
বর্জ্জনীয় তিনটী—আলস্য, বাচালতা, রঙ্গরস।
সন্দেহের তিনটী—তোষামোদ, কপটতা, অযাচিত সহৃদয়তা।
কামনার তিনটী— স্বাস্থ্য, চিত্তপ্রসন্নতা, সৎস্বভাব।
সহবাসের তিনটী—সাধু, সদ্‌গ্রন্থ, সচ্চিন্তা।
দুর্ল্লভ তিনটী— মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ সংশ্রয়।
প্রার্থনীয় তিনটী—ভক্তি, প্রেম, শান্তি।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ ঘোষ।
হরিনাভি ৮।৪।১০

গীত—৺জগন্নাথ দর্শনে।

এই দেহ দিব্য রথে, হেরি জগন্নাথে, ভক্তি ভরা চিতে চল চল মন।
হেরে নয়ন জুড়াবে, জনম না হবে, যাতায়াত ভবে হবে নিবারণ।
পথ হেরি কেন কাতর ভয়েতে,গুরু সাথি করে লওরে সঙ্গেতে,
তাঁর করুণায় ঘুচে যাবে ভয়, অভয়ে হেরিবে সে ভবতারন।
মূলাধার হতে গুরুপদাশ্রয়ে, যমনা কালা পানি তর অকাতরে, সুষম্নার পথে,
প্রেমানন্দে মেতে শ্বাস দাঁড় টানি চল অনুক্ষণ।
যদি ক্লান্ত হও পথ পরিশ্রমে, আছে পান্থশাম দ্বাদশদলনামে,
(মন), সে বাসেতে যেও বিশ্রামকারণ, ক্লান্তি দূর হবে (তোর) জনমের মতন।
একাদশ ইন্দ্রিয় ষড়রিপুগণ অহংজ্ঞান এই অষ্টাদশজন, আঠার নালার ধারে দাঁড়াইয়ে
আছয়ে তোমার পরীক্ষা কারণ;
দেহ পঞ্চকোষে বিরাজেন শ্রীনাথ প্রণব উচ্চারি কর প্রণিপাত মন খুলে জ্ঞান আঁখি একবার,
রূপ হের তাঁর প্রাণ বিমোহন।
সর্ব্বস্ব তোমার পুঁটুক করিয়ে বিবেক বিধানে বেঁধে তাঁরে দিয়ে (মন) যাও কণ্ঠমূলে অক্ষয়
বটতলে পাইবে তথায় অক্ষয় রতন।
আছে নীলগিরি দ্বিদল সরোজে জ্যোতি রূপে যথা জগৎ বর্ত্ত। আছে (মন) তেরিয়ে সে
জ্যোতি কর তথা স্থিতি আত্মরূপ সদা হবে দরশন।
সহস্রারে মন আনন্দে বাজার চল ত্বরা করি তথা একবার নাহি ভেদা ভেদ সব একাকার
ব্রহ্মে যথা লয় জীবগণ।
অধম পাতকী কালীদাসী বলে, ষট চক্র ভেদে রাসলীলা খুলে, যথা প্রেমময়ের বাঁশী রাধা
রাধা বলে পাবি তাঁরি দেখা আমিত্ব ঘুচিলে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব।

২

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া সকলেরই মনে হয় ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন? স্ত্রীর সহিত যাঁহার কোন কালেই শরীরসম্বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না তিনি কেন বিবাহ করিলেন, ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যদি বল যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ঠাকুর 'ভগবান', 'ভগবান' করিয়া উন্মাদ প্রায় হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ দিলেন—তদুত্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয়। জোর করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাল্যাবধি কেহ করাইতে পারে নাই। যখন যাহা করিবেন মনে করিয়াছেন তাহা কোনও না কোন উপায়ে নিশ্চিত ঘটিয়াছে। উপনয়ন কালে ধনী নাম্নী জনৈক কামার জাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষা মাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার ন্যায় সমাজ বন্ধন শিথিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, ঠাকুরের পিতা মাতাও কম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল কোন না কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতা রূপে নির্দ্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, তথাপি কেবল মাত্র গদাধরের নির্ব্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল—ইহা একটি কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরেই হইয়াছে?

আবার যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্ব্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, একথাটা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া যদি বলি যে, মানবসাধারণের ন্যায় ঠাকুরেরও বিবাহাদি করিয়া সংসার-সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছাটা প্রথম প্রথম ছিল;

কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল; সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার পূর্ব্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মত কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল, বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়? আমরা বলি কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম—২১ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকে এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়, ঠাকুরের জীবনে কোন ঘটনাটাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান কালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটী নিবাসী শ্রীযুৎ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির আছে! কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক হইবে অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে 'কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা—বিংশ শতাব্দীতে ওসকল কথা কি চলে?' তদুত্তরে আমাদের বলিতেই হইবে, 'তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু, কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন?' পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোনীত হইতেছিল না তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন অমুক গাঁয়ের অমুকের 'মেয়েটি কুটো বেঁধে * রাখা আছে, দেখ্‌গে যা!' অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার বিবাহ হইবে

* পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, সশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্য সেটিতে কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর কেহ আর সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ—অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে, অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রী বলিয়া দেবকর্ত্তৃক রক্ষিতা আছে!

এবং কোথায় কাঁহার কন্যার সহিত হইবে, এবং তাহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই! অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।

তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়ত বিরক্ত হইয়া বলিবেন—তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন হে? সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ? শাস্ত্র টাস্ত্র একটু আধটু দেখিয়া সাধু মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র বলেন ঈশ্বর দর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ জীবকে জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে কতকগুলি তীর তুণে বাঁধা আছে, হাতে একটি তীর এখনি ছুড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুড়িয়াছে। এমন সময় ধর ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়ে সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটা সে পাখীটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়াছে সেটাকে কি আর ফিরাতে পারে? পিঠের তীরগুলি তার যেন জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম্ম বা যে কর্ম্ম সকলের ফল সে এইবার ভোগ করিবে—ঐ উভয় কর্ম্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তার প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি হইতেছে, যে তীরটি সে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মত, তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।

ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি, অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে যথার্থজ্ঞানী পুরুষকে প্রারব্ধ কর্ম্মসকলেরও ফল ভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিবে যে মন, সে মন তিনি চিরকালের নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন। তাহাতে আর সুখ দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল তাঁহার শরীরটার

প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ব কোন বিশেষ কারণে, যথা পরোপকারের নিমিত্ত রাখিয়া দেন তবেই তাঁহার আবার শরীর মনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে 'লোকজিৎ,' 'মৃত্যুঞ্জয়,' 'সর্ব্বজ্ঞ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আর এক কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে পারা যায় না। কেন না, তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ" অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনিই বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিতেছেন! কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব ঈশ্বরাবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐরূপ করিলে তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্ম্মেরই বশীভূত আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অন্য প্রকার মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে বলিব।

ঐ কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন। নিকটে শ্রীযুৎ বলরাম বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কামারপুকুরে যাত্রা করিয়াছেন, কয়েক মাসের জন্য। কারণ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ।

ঠাকুর (বলরাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) "আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হল বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হল? পরণের কাপড়ের ঠিক নাই আবার স্ত্রী কেন?"

বলরাম—(ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।)

ঠাকুর—ওঃ বুঝেছি; (থাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও বলরামকে দেখাইয়া) এই এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর এমন করে রেঁধে

দিত বল। (বলরাম বাবু প্রভৃতি ভক্তগণের হাস্য) হাঁ গো, কে আর এমন করে খাওয়াটা দেখ্‌ত। ওরা সব আজ চলে গেল—(ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়)—রামলালের খুড়ী গো; রামলালের বিয়ে হবে তাই সব কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম্, কিছুই মনে হল না। সত্যি বল্‌ছি; যেন কে তো কে গেল। কিন্তু তারপর কে রেঁধে দেবে বলে ভাব্‌না হল। কি জান সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয়না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁসও থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয়; এটা ওটা করে দেয়; তাই মনে হল—কে করে দিবে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন—"বিয়ে কর্‌তে কেন হয় জানিস্? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে, বিবাহ তারই মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য্য হওয়া যায়।" আবার কখন কখন বলিতেন—"যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয় সে হাড়ি মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্য্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আস্‌বে কেন? যেটা দেখেনি, (ভোগ করেনি,) মন সেইটে দেখ্‌তে চাইবে ও চঞ্চল হবে; বুঝ্‌লে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে—খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।"

সাধারণ মানবের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিলেও ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব। বিবাহটা ভোগের জন্য নয়, একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষারূপ নিয়ম প্রতিপালন ও গুণবান্ পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্ম্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না, শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ দুর্ব্বল মানবচরিত্রের অন্তঃস্তর পর্য্যন্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্ব্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না; লাভ লোকসান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্য্যেও অগ্রসর হয় না! এই স্বার্থটাকে যদি একটা মহান্ উদ্দেশ্যের সহিত সর্ব্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল, নতুবা মানবকে পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগের নিমিত্ত

ছুটিতেছে; আর মনে করিতেছে ঐ সকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম! কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে—এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে? শ্রীযুৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি বলিতেন "দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়"—মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট, পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে একথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না! শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, 'ওরে সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ মনে করিস্ কেন? সুখ দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে হইবে! স্বার্থটাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব্ না যে সুখটাও আমার শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাইব তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য।' অতএব বুঝা যাইতেছে বিবাহিত জীবনে বিচার সংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখ দুঃখ পূর্ণ নানা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাত সুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া তাঁহার দর্শন লাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিচার করিতে করিতে সংসারের কোন বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে নিশ্চিত, এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, 'ওরে সদসদ্‌বিচার চাই। সর্ব্বদা বিচার করে মনকে বল্‌তে হয় যে, মন তুমি এই জিনীসটা ভোগ কর্‌বে, এটা খাবে, ওটা পর্‌বে বলে ব্যস্ত হচ্চ কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড় মাস রক্ত মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাইতেই আবার তোমার, সকল মানুষের, ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দ লাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার কর্‌তে কর্‌তে দু একবার ভোগ করে সেটাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে বলে মন ভারি ধরেছে, কিছুতেই আর বাগ্ মানচে না, যত বিচার কর্‌চ সব যেন ভেসে যাচ্চে। তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে, এ গাল ও গাল করে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বল্‌বি—

মন, এরই নাম রসগোল্লা; এও আলু পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈয়ারি হয়েছে; এও খেলে শরীরে গিয়ে রক্তমাংস মল মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি—গলার নিচে নাব্‌লে আর এ আস্বাদের কথা মনে থাক্‌বে না, আবার বেশী খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছিঃ ছিঃ -এই খেলে, আর খেতে চেও না। (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো, এই রকম করে বিচার বুদ্ধি নিয়ে ভোগ করে ত্যাগ করা চলে; কিন্তু বড় বড় গুলোতে ওরকম করা চলে না; ভোগ কর্‌তে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়! সে জন্য বড় বড় বাসনা গুলোকে বিচার করে তাতে দোষ দেখে মন থেকে তাড়াতে হয়!'

শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজ কাল স্থান পায়? কয়জন বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আপনাদিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন? কয় জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোকহিতকর উচ্চ ব্রতে—ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক—প্রেরণা দিয়া থাকেন? কয় জন পুরুষই বা ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হায় ভারত, পাশ্চাত্যের ভোগসর্ব্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে বর্ত্তমান বিবাহিত জীবনের দোষ দেখাইয়া বলিতেন—'ওরে (ভোগটাকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা করলেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল, তার দোষ কেটে গেল?' বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনও ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র মহা উচ্চ উদ্দেশ্য আছে এ কথা আমরা আজ কাল এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোক-গুরু ঠাকুরের বিবাহ! তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্য্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত!

ঠাকুর বলিতেন, "এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে আমি ষোল টাং কর্‌লে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্! আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি

তো তোরা শালারা পাক্ দিয়ে দিয়ে তাই করবি!"—এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান! ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত—'বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখন করেন নাই, তাই আমাদের উপর লম্বা লম্বা উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।' সে জন্যই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের পর যখন দিব্যোন্মাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণ যৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীতে জগদম্বার আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রী-ষোড়শী মহাবিদ্যা জ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আট মাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত করিলেন, স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শান্তি ও আনন্দের জন্য কখন কামারপুকুরে এবং কখন দক্ষিণেশ্বরে নিজের নিকট আনাইয়া রাখিতে লাগিলেন, এবং কখন কখন শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই একমাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন! দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনও স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন—"সে যে কি ভাবে থাক্‌তেন, তাহা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাব্‌তুম কখন রাত্‌টা পোহাবে। ভাব সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না, এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে ভয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কাণে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তার পর ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন —এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই বীজ শুনাবে! তখন আর তত ভয় হ'ত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁস হ'ত। তার পর অনেক দিন এইরূপে গেলে ঘুমুতে পারি না বলে নহবতে আলাদা শুতে বল্‌লেন।" পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন—এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন কীর্ত্তন

ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন!—হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এই ভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মান্য ভক্তি ও নিস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সে জন্যই বলি এ অপূর্ব্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া এক দিনের জন্যও শরীর সম্বন্ধ না পাতাইয়া স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের লীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য! তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে, ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে! এবং এই উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহা মেধাবী, মহা তেজস্বী গুণবান্ সন্তানের পিতা মাতা হইয়া ভারতের বর্ত্তমান হীনবীর্য্য হতশ্রী হৃতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার—সেই জন্য! শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এ যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে! আজীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র 'ছাঁচ' জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন ঠাকুর যেমন বলিতেন, তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই ছাঁচে ফেল আর নূতন ভাবে গঠিত করিয়া তোল!

'কিন্তু'—গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে,—'কিন্তু'—! বুঝিয়াছি; এবং শ্রীস্বামি বিবেকানন্দ আমাদের সাধন ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি—"তোরা মনে করেছিস্ বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি?—সে নয় মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচ্‌বে না! রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয়—'বনে একটা সিঙ্গিই থাকে'!" হে গৃহী মানব, আমরাও তোমার 'কিন্তু'র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি, ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য রাখা তোমার সাধ্যাতীত তাহা ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ 'এক টাং' বা আংশিক ভাবে করিবে বলিয়া। কিন্তু জানিও, ঐরূপ 'এক টাং' ভাবেও ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার

সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর তবে তোমার আর গতি নাই ; তোমার বিনাশ ধ্রুব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল তাহা ভাবিও —ঈশাকে উপেক্ষা করিয়া ইউদী জাতিটার কি দুর্দ্দশা তাহা স্মরণ রাখিও! যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্ব্বকালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে!

আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহ-বন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিকাশের কথা সাঙ্গ করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথা সকল বলিব। রূপরসাদি বিষয়ের দাস, বহির্ম্মুখ মানবমনে এখনও নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করাটা যে মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা দেখান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্য্যাদাটাও রক্ষা পাইত। কারণ, শাস্ত্র বলেন – উপনীত পত্নীতে অন্ততঃ একটি সন্তানও উৎপাদন করিতে। উহাতে পিতৃঋণের হস্ত হইতে মানবের নিষ্কৃতি হয়। তদুত্তরে আমরা বলি,—

প্রথম, আমরা যতটুকু দেখি, শুনি বা চিন্তা ও কল্পনা করি, সৃষ্টিটা বাস্তবিক কি ততটুকুই? সৃষ্টির নিয়মই বৈচিত্র্য থাকা। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে যদি আমরা সকলে সকল বিষয়ে একপ্রকার চিন্তা ও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে সৃষ্টিধ্বংস হইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। তার পর জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টিরক্ষার সকল নিয়মগুলিই কি তুমি জানিয়াছ এবং সৃষ্টি রক্ষা করিতে যাইয়াই কি তুমি আজ ব্রহ্মচর্য্য বিহীন? বুকে হাত দিয়া উত্তর প্রদান করিও; দেখিও, ঠাকুর যেমন বলিতেন—'ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।' আচ্ছা, না হয় ধরিলাম সৃষ্টি রক্ষার ঐ নিয়মটি তুমি পালন করিতেছ। অপরকে ঐরূপ করিতে বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? ব্রহ্মচর্য্য—বা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য সাধারণ বিষয়ে শক্তিক্ষয় না করাটাও, সৃষ্টিমধ্যগত একটা নিয়ম। সকলেই যদি তোমার মত নিম্নাঙ্গের শক্তিবিকাশেই ব্যস্ত থাকিবে, তবে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশ দেখাইবে কে? ঐরূপ শক্তির বিকাশ তাহা হইলে তো লোপ পাইবে?

দ্বিতীয়, শাস্ত্রের ভিতর হইতে মনের মত কথাগুলি বাছিয়া লওয়াই আমাদের স্বভাব। সন্তানোৎপাদন বিষয়ক কথাটিও ঐ ভাবে বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ, শাস্ত্র অধিকারি ভেদে আবার বলেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহ-রেব প্রব্রজেৎ'—যখনি ভগবানে অনুরাগ বাড়িয়া সংসারে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনি সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব ঠাকুর যদি তোমার মতে চলিতেন, তাহা হইলে এ শাস্ত্রবচনের মর্য্যাদাটি রক্ষা করিত কে? পিতৃঋণ শোধ করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। শাস্ত্র বলেন, যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁহার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ এবং অধস্তন সপ্তপুরুষকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃঋণ শোধ হইল না ভাবিয়া আমাদের কাতর হইবার প্রয়োজন নাই!

অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের জীবনে উদ্বাহবন্ধন কেবল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তই হইয়াছিল। বিবাহিত জীবনের কি উচ্চ পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীশ্রীমার আজীবন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা-জ্ঞানে পূজা করার কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ, অপর সকলের নিকট আপন দুর্ব্বলতা আবরিত রাখিতে পারিলেও, স্ত্রীর নিকট কখনই উহা লুক্কায়িত রাখিতে পারে না, ইহাই সংসারের নিয়ম। ঠাকুর ঐ বিষয়ে কখন কখন আমাদের বলিতেন—"যত সব দেখিস্ হোম্‌রা চোম্‌রা বাবু ভায়া, কেউ জজ্ কেউ মেজেষ্টর, বাইরেই যত বোল্ বোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম! অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হ'লেও সেটা রদ কর্‌বার কারো ক্ষমতা নেই!" অতএব কাহারও বিবাহিতা পত্নী পবিত্র উচ্চ জীবন দেখিয়া যদি তাহাকে অকপটে হৃদয়ের ভক্তি দেয় এবং আজীবন ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাষমাত্র দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

* * * * *

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয়—যেদিন হইতে

তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ঠাকুরের তখন সাধনার কাল, ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদাবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? যিনি গুরু, তিনি চিরকালই গুরু—যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই নেতা। লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আঁটিয়া যে তাঁহাকে গুরু বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে। তিনি যেমন আসিয়া লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানব-সাধারণের মন তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয়! অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে থাকে! ইহাই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—মানুষ মানুষকে যে নেতা বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে; যাঁহারা গুরু বা নেতা হন, তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন! "a leader is always born and never created"—সেজন্য দেখা যায়, অপর সাধারণে যে সকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোক-গুরুরা সেই সকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করে! গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।'—

তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সৎকার্য্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে! বড়ই আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্দ্ধনের পূজা হইতে থাকুক'—লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন—'আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক,' অমনি 'যজ্ঞে হনন করিবার জন্যই পশুগণের সৃষ্টি,' 'যজ্ঞার্থে পশবো সৃষ্টাঃ,' রূপ নিয়মটি সমাজ পাল্টাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে ভোজন করিতে শিষ্যদিগকে অনুমতি দিলেন—তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ দশগণ্ডা বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মান্য করিতে থাকিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ—তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ!

কেন যে ঐরূপ হয়, তাহাও ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর 'আমি'টা চিরকালের মত একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাট্‌ভাবমুখী 'আমিত্ব'টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে 'আমি'টার দশের

কল্যাণ খোঁজাই স্বভাব। আর, ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট্ 'আমি'টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোক আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে! সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট্ 'আমি'টার একটু আধটু ছিটে ফোঁটার মত বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ, এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রকাশে অদ্ভুত লীলা সকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের একেবারে অপৃথক্ ভাবে দেখিতে থাকি! কারণ, তখন ঐ অমানুষি-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া পরা চলা ফেরা নিশ্বাস ফেলার মত একটা সাধারণ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়! কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে? দেখে, যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাটি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি বিশ্বাস ও শরণ গ্রহণ করে।

ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই—যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনান্তে ঐ ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজভাব হইয়া দাঁড়ায়! তখন কখন যে তিনি কোন্ 'আমি'-বুদ্ধিতে রহিয়াছেন, বা কখন যে তাঁহাতে বিরাট্ 'আমি'টার সহায়ে গুরু ভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক সময়ে সাধারণমানবমন-বুদ্ধির গোচর হইত না! কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা এবং যেখানকার কথা সেখানেই উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখন, যৌবনে সাধকাবস্থায় ঐ ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যক।

যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বা মথুর বাবুকে লইয়া। অবশ্য ইঁহাদের দুই জনের কাহাকেও দেখা আমাদের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তবে ঠাকুরের নিজমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি,

তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথম দর্শনেই ইঁহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা এতই গভীর ভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি বিশ্বাস করিতে—এতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া একটা রূপকথার মত মনে হইবে! অথচ উপর উপর দেখিলে ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক-ব্রাহ্মণমাত্র এবং তাঁহারা সমাজে জাত্যংশে বড় না হইলেও, ধনে, মানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে।

আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবধি অতি বিচিত্র! ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যে সকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য করে, তাঁহার গণনায় তাঁহার চক্ষে ওগুলো চিরকালই ধর্ত্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, 'মনুমেণ্টে উঠে দেখ্‌লে তিনতলা চারতলা বাড়ী, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস সব এক সমান হয়ে গেছে দেখায়'—আমরাও দেখি, ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ-সহায়ে সর্ব্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে, সেখান হইতে ধন-মান-বিদ্যাদির একটু আধটু তারতম্য, যাহা লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হই ও 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করি, সব এক সমান দেখা যাইত! অথবা ঠাকুরের মন, চিরকাল, প্রত্যেক কার্য্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া, অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণায় পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইত। কাজেই, ঐ সকল বিষয় যে, উদ্দেশ্য ও চরমপরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোন পথই ছিল না। পাঠক বলিবে, 'কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে, জগতের কোন কার্য্যই আর করিতে দিবে না।' বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না হইয়া থাকে এবং ঈশ্বর-লাভ-রূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি উহার গোড়া বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় করিয়া উদ্যমরহিত ও কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারীও করিয়া তুলিবে।

নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল বিষয়ের অন্তস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বর-দর্শনের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দিবে। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐজন্যই মানবকে সর্ব্বদা সংসারে "জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন" করিয়া বৈরাগ্যবান্ হইতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষ-দৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট তা দেখ—লেখা পড়া করিতে গিয়া কোথায় 'তর্কালঙ্কার' 'বিদ্যাবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি ও নামযশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, হোমরা চোমরা 'তর্কবাগীশ' 'ন্যায়চঞ্চু' মহাশয়দের ন্যায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনীর দ্বারে খোসামুদি করিয়া 'চাল কলা বাঁধা' বা জীবিকার সংস্থান করা; বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ আমোদপ্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন, দুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মত বন্ধন গলায় পরা, অভাব বৃদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটোছুটি করিয়া বেড়ান ও সেই দুদিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা; টাকাতে সংসারে সব করিতে ও সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে লাগিয়া যাইবেন, না, দেখিলেন, টাকাতে—কেবল ভাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হয় না; সংসারে গরিব দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়া 'দাতা' 'পরোপকারী' ইত্যাদি নাম কিনিবেন, না, দেখিলেন আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দু'চারটে ফ্রি স্কুল ও দু'চারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দু'চারটে অতিথিশালা, তার পর মৃত্যু ও জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকা!—এইরূপ সকল বিষয়ে!

ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমানী ও ধনীদের; কারণ, স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও নিকট শুনিতে না পাইয়া, লোকমান্য ও ধনমদে শুনিবার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত তাঁহারা অনেক স্থলে হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে, অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর ভক্তি ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক্ হইতে হয়। মনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার দিব্য

গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন! নতুবা যে ঠাকুর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ ভোজন করিলেও শূদ্রান্ন ভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়া রহিলেন এবং পরেও যিনি কিছুকাল ঐ নিমিত্ত গঙ্গাতীরে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন, যে ঠাকুর মথুর বাবু বারবার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বারবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসিয়া বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা সহজ হইত না।

ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ যৌবন। বিবাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং মা কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন। এবং পূজায় ব্রতী হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের মত হইয়াছেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখন কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ও মুখ ঘস্‌ড়াইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া এত ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়!—লোকে ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে 'আহা লোকটি পেটের শূলব্যথায় অমন অস্থির হইয়াছে!' কখন বা পূজার সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিষ্পন্দ হইয়া যান! কখন বা সাধকদিগের পদাবলী উন্মত্তভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাইতে থাকেন! যখন কতকটাও সাধারণ ভাবে থাকেন, তখন যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে যেমন মান্য দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায়ই করেন। কিন্তু জগন্মাতার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয়—এবং সে ভাবাবেশ যে দিনের ভিতর এক আধ বার একটু আধটু হইত, তাহা নহে—তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শুনেন না—বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনও সে দেবচরিত্রের মাধুর্য্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়। তখনও যদি কেহ বলে, 'মার নাম দুটো শুনাও না', অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্য মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাইতে গাইতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন। ইতিপূর্ব্বেই রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী খাতাঞ্চি মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক

কথা তুলিয়া বলিয়াছেন যে, 'ছোট * ভট্‌চাজ্‌ সব মাটি কর্‌লে, মার (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না, ওরূপ অনাচার কর্‌লে মা কি কখন পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?'—ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফল-মনোরথ হন নাই; কারণ, মথুর বাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে পূজার সময় কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিহ্বল, বালকের ন্যায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আবদার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন, 'ছোট ভট্টাচার্য্য মশায় যে ভাবে যাহাই করুন না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।' রাণী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মার শিঙ্গার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের মার নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই ঠাকুর-বাড়ীতে আসেন, তখনই ছোট ভট্টাচার্য্যকে নিকটে ডাকাইয়া মার নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহা-কেও যে শুনাইতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎরূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুরবাড়ীর ক্ষুদ্র সংসারে যে যার কাজেই ব্যস্ত এবং কাজ-কর্ম্ম ও আপনার স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায়, তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চ্চাদি রুচিকর বিষয় সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একঘেয়েমির অবসাদ দূর করিয়া থাকে! কাজেই ছোট ভট্টাচার্য্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? 'ও একটা উন্মাদ; বাবুদের কেমন একটা সুনজরে পড়িয়াছে, তাই এখনও চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড় লোকের মেজাজ—কিছু কি ঠিক ঠিকানা আছে? খুসী হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ'—ঠাকুর-সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তাই কর্ম্মচারীদের ভিতর কখন কখন হইয়া থাকে, এই মাত্র। ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তখন ঠাকুরবাটীতে আসিয়া জুটিয়াছে।

* ঠাকুরের অগ্রজকে বড় ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেন।

আজ রাণী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাটীতে আসিয়াছেন। কর্ম্মচারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার, সেও আজ আপন কর্ত্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ৺কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রাণী মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্ত্তির নিকটে আসনে আহ্নিক পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া 'মার নাম' গান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন। রাণী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐ সকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা ?"—বলিয়াই রাণীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব! কিন্তু কেই বা তাহা বুঝে!

মন্দিরের কর্ম্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলে হৈ চৈ করিয়া উঠিল। দ্বারপাল ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্ম্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রাণী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির গম্ভীর! কর্ম্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির এবং তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি ও নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন দেখিতে পাইয়া রাণী রাসমণি ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাণীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্ত্তমান! পরে কর্ম্মচারীদের গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙ্গিল ও বুঝিলেন, নিরপরাধী ঠাকুরের প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। বুঝিয়া, সকলকে গম্ভীর ভাবে আজ্ঞা করিলেন—'ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না!' পরে মথুর বাবুও নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর

নিকট হইতে ঘটনাটির সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ম্মচারী-দিগের উপর পূর্ব্বোক্ত হুকুমই বাহাল রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের কেহ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল, কিন্তু কি করিবে, 'বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি' ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়ত ভাবিবে, এ আবার কোন্ দিশি গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার গুরু-ভাবের প্রকাশ? আমরা বলি, জগতের ধর্ম্মেতিহাস পাঠ কর, দেখিবে, লোকগুরু আচার্য্যদিগের জীবনে এরূপ ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে কাজিদলন, গুরু-ভাবে আত্মহারা হইয়া অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতি কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, মহামহিম ঈশার জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই। শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেরুজেলামের য়্যাভে দেবতার মন্দিরে দর্শন পূজাদি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। ৺ বারাণসী শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থান সকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর মনে যেরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, য়্যাহুদি-মনে জেরুজেলামের মন্দির দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাহার উপর আবার ভাবমুখী ঈশার মন। দূর হইতে মন্দির দর্শনেই ঈশা ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া দেব-দর্শন করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত লোক কত প্রকারে দুপয়সা রোজগার প্রভৃতি দুনিয়াদারিতেই ব্যস্ত। পাণ্ডা পুরোহিতেরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক, যাত্রীদিগের নিকট হইতে দুপয়সা ঠকাইয়া লইতেই নিযুক্ত, আর দোকানি পসারিরা পূজার পশুপুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু'পয়সা অধিক লাভ করিব, এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত, ভগবানের মন্দিরে তাঁহার নিকটে রহিয়াছি একথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা পড়িয়াছে? যাহা হউক, ভাববিভোর ঈশার চক্ষে মন্দির-প্রবেশ-কালে এ সকল কিছুই পড়িল না। সরাসর মন্দিরমধ্যে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ, এখানে আসিয়াই ত তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন

যখন আবার নীচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই ব্যাপৃত! তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন, একি, বাহিরে সংসারের ভিতর যাহা করিস্ কর্ না; কিন্তু এখানে—যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ—এখানে আবার এ সকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দু'দণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস্! ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানি পসারিদের বলপূর্ব্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন! তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া, যথার্থই দুষ্কর্ম্ম করিতেছি ভাবিয়া সুড় সুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল! অতি বদ্ধ জীব—যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া বহির্গমন করিল! কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্তব স্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাস্যে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক্ এখন সে সকল পৌরাণিক কথা। গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া ঠাকুর যে কি ভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারি ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রাণী রাসমণি, যাঁহার ধন মান বুদ্ধি ধৈর্য্য সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত! এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথবা যদি কখন কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না, হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত!

তাঁহার অন্যায়াচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, একরূপ দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক্ হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রাণীর দিক্ হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার মনে ক্রোধ অভিমান হিংসাদির উদয় হইল না ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্ব্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি, স্বার্থগন্ধহীন বিরাট্ 'আমিটা'র সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে, রাণীর ন্যায় ভক্তিমতী সাত্ত্বিক প্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবদ্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ এ কথাটি আপনা আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না! আর এক কথা, ঠাকুর যেমন বলিতেন "তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখন কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না, বা মান ক্ষমতা প্রভৃতি হজম* করিতে পারে না!" সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্না রাণীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ কঠোর ভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আর এক কথা, সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেক-চূড়ামণি' নামক গ্রন্থে উহা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

দিগম্বরো বাপি চসাম্বরো বা।
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থ।
উন্মত্তবৎ বাপিচ বালবৎ বা।
পিশাচবৎ বা বিচরত্যবন্যাং॥

ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বল্কল, বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, কেহ বা উন্মাদের ন্যায়, আবার কেহ বা

* মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ ঐ সকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐ সকলের অপব্যবহার না করা।

বহির্দৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক বা শৌচাচার-বিবর্জ্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

বিরাট্ 'আমিটা'র সহিত তন্ময়ভাবে অনুক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইঁহাদের ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণ-সমর্থ গুরুভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুদ্র স্বার্থময় 'আমি-টা'র লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট্ আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণ-সাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ। ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বদা গুরু বা ঋষি পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসদ্বিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। 'দেখাইতে হয়' বলিতেছি এজন্য যে ভিতরে, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মভাবে ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যাদি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত সকল বিষয় ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐ সকল ভাব লইয়া কাল যাপন করিয়া থাকেন; এবং সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্গুরুপদবীস্থ আচার্য্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা, সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, আবার বর্ত্তমান যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ, অবতারকুলে যে সকল বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য শক্তি বা বিভূতি-প্রকাশ শাস্ত্রে এপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল ইঁহাতে এত গুপ্ত ভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে ইঁহাকে দুই চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারই ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যায়—একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্ব গুণে বেদ বেদান্তাদি সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে—'আমি কিছু নহি,

কিছু জানি না; সব আমার মা জানেন'—সর্ব্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন 'মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন,' তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে, কি পরামর্শই দিলেন, ওকথা তো আমরা সকলে 'কথামালা' 'বোধোদয়' পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—"ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন"; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে? ধনে?—নাম যশে তাঁহাকে ধরিবে?—ঠাকুরের নিজের তো ওসকল খুবই ছিল! আবার ওসকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে! কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া! ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইলে, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি, রাণী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবাপন্ন হইলেও ঠাকুরকে ধরিতে পারিলেন এবং তিনি গুরুভাবে আজ যে শিক্ষা দান করিলেন তাহা অভিমান অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন, ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

শিষ্য আজ শনিবার আফিসের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজি এখন মঠেই থাকেন। মঠে এখন সাধন-ভজনের—জপ-তপস্যার খুব ঘটা। স্বামীজি আদেশ করিয়াছেন, কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজির ত নিদ্রা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া ব'সে থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে—শেষ রাত্রে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে ঐ ঘণ্টা সকলের কাণের গোড়ায় বাজান হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়াই স্বামীজির কাছে—উপরে—গিয়াছে। স্বামীজি বল্‌ছেন "ওরে, এখন মঠে কেমন সাধন ভজন হচ্ছে—কাল ভোরে দেখ্‌বি এখন।"

শিষ্য—মশায়, কি হচ্ছে ?

স্বামীজি—সকলেই শেষ রাত্রে উঠে কেমন সব জপ ধ্যান করে। ঐ দেখ্‌না কেমন ঘণ্টা আনা হয়েছে ;—ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঘুম থেকে উঠ্‌তে হয়। ঠাকুর বল্‌তেন, সকাল সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে ; তখন একমনে ধ্যান কত্তে হয়।

শিষ্য—তা বেশ। জপ ধ্যান এ সবই ত মঠের শোভা ; আমাদের শেখ্‌বার বিষয়।

স্বামীজি—তা জানিস্, ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কেমন জপ ধ্যান কত্তুম ? ৩টার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ চান্ করে, কেহ না করে, সব্বাই ঠাকুর ঘরে যেতুম। জপ ধ্যানে সকলেই বিহ্বল হয়ে যেতুম। কে জান্‌ত এ দুনিয়া আছে কি নাই। একমাত্র শশী ঠাকুরের সেবা নিয়ে থাক্‌ত—সে যেন বাড়ীর গিন্নি ছিল। আমাদের খাওয়ানো দাওয়ানো—ভিক্ষা শিক্ষা করে ওই সব যোগাড় কর্‌তো। এমন দিন গেছে, সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপ ধ্যান চল্‌ছে। শশী খাবার নিয়ে ব'সে আছে, অথবা কোনরূপে টেনে হিঁচ্‌ড়ে আমাদের জপ ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!

শিষ্য—মশায়, তখন কি করে চল্‌ত ?

স্বামীজি—কি ক'রে চল্‌বে কিরে ? আমরা ত সাধু সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষা শিক্ষা ক'রে যা আস্‌তো, তাইতেই সব চলে যে'ত। আহা! আজ সুরেশ বাবু, বলরাম বাবু নাই ; তারা দুজন থাক্‌লে এই মঠ দেখে ধেই ধেই করে নাচ্‌তো। সুরেশ বাবুর নাম শুনেছিস্ তো ? তিনি এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা বলে জান্‌বি। তিনি বরাহনগরের মঠের স্থাপনকর্ত্তা। তিনিই তখন সব খরচ পত্র বহন কত্তেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর বিষয় আসয়ের কতক মঠে দিয়া যান। তাঁর আত্মীয়েরা পাছে মনে করেন, আমরা ঐজন্য তাঁর কাছে যাওয়া আসা করি, এই বলে আমরা, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় পড়ে, তখন তাঁর সঙ্গে বড় একটা দেখা কত্তে যেতুম না। একমাত্র হুট্‌কো তাঁর কাছে ছিল। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাব্‌তো। তাঁর ভক্তি বিশ্বাসের কি তুলনা হয়রে বাপ!

শিষ্য—তাঁর সঙ্গে মৃত্যুকালে কেন দেখা হ'লো না?

স্বামীজি—সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখ্‌বি সংসারে তুই বাঁচিস্ কি মরিস্ তাতে পরিজনের বড় কিছু একটা আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আসয় রেখে যেতে পারিস্, তোর মরবার আগেই দেখ্‌তে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি সুরু হয়েছে। তোর মৃত্যু শয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেহ নাই- স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার।

স্বামিজী আবার বল্‌ছেন—দেখ্, বরাহনগরের ভাঙ্গা বাটী থেকে মঠ ফঠ তুলে দিতে কখন কখন লাঠি ধর্‌তুম। তা শশীকে কিন্তু কিছুতেই হঠাতে পার্‌তুম না। শশী আমাদের মঠের central figure (কেন্দ্র-স্বরূপ) বলে জান্‌বি।

আবার বল্‌ছেন "এক এক দিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে কিছু নেই। ভিক্ষা ক'রে চাল আনা হলো ত নুন নাই। এক একদিন সুধু নুন ভাত চল্‌ছে, তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নাই; জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আম্‌রা তখন সব ভাসচি। তেলাকুচ পাতা সেদ্ধ, নুন ভাত এই মাসাবধি চল্‌ছে—আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখ্‌লে ভূত পালিয়ে যেতো—মানুষের কথা আর কি বল্‌বো। ও সব রাখাল শশী ওদের কাছে জেনে নিবি। যত circumstances against এ (অবস্থা প্রতিকূলে) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ। তবে এখন মঠে এ সব খাট বিছানা, এমন খাওয়া বন্দোবস্ত করেছেন কেন?

স্বামীজি—কি জানিস্, আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তা কি দুনিয়ায় কেউ পেরেছে না পার্‌বে? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি কিনা, তাই দুঃখ কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আনতুম্ না। এখনকার ছেলেদের তত কঠোর কত্তে হবে না, পার্‌বেও না। তাই একটু থাক্‌বার জায়গা করা হয়েছে; একমুটো অন্নেরও বন্দোবস্ত ক'রে যেতে ইচ্ছা আছে। মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো খুব সাধন ভজনে মন দিবে, জীবহিত-কল্পে জীবন পাত কর্‌তে শিখ্‌বে।

শিষ্য—মশায়, এ সব খাট বিছানা দেখে বাইরের লোকে কত কি বলে!

স্বামিজী—বল্‌তে দেনা। ঠাট্টা করেও ত এখান্‌কার কথা একবার মনে আন্‌বে। শত্রুভাবে শিগ্‌গীর মুক্তি হয়—এ কথা জানিস্? ঠাকুর বল্‌তেন—'লোক না পোক' এ কি বল্লে, ও কি না বল্লে, তাই শুনে বুঝি চল্‌তে হবে? ছিঃ ছিঃ!!

শিষ্য—এই না আপনি বলেন—"সব নারায়ণ, দীন দুঃখী আমার নারায়ণ", আবার এই বল্‌ছেন 'লোক না পোক', এর মানে কি?

স্বামীজি—ওরে সবই নারায়ণ তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন দীনদুঃখী এসে কি মঠের খাট্ ফাট্ দেখে criticise কর্‌ছে (গালি দিচ্চে)? যারা criticise কর্‌ছে, নিজের রোকে কার্য্য করে যাব, তাদের দিকে দৃক্‌পাত কর্‌বো না এই sense এ (ভাবে) "লোক না পোক" এ কথা বলা হয়েছে—বুঝ্‌লি? কথার "মানেটা" বুঝে নিবি, মার্ পেঁচ্‌টা ছেড়ে দিবি।

শিষ্য—হাঁ মশায়, বুঝেছি।

স্বামীজি আবার আপন মনে বলে যাচ্ছেন—কি দুঃখের দিনই না গেছে; না খেতে পেয়ে রাস্তায় অবশ হয়ে একদিন পড়েছিলুম্। এক পস্‌লা জল হযে যায়। সেই জলে ভিজে তবে consciousness (হুঁস) ফিরে এলো। তখন মঠে গিয়ে খেতে পেলুম। আবার বল্‌ছেন—যার রোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারো শীগ্‌গীর, কারো বা একটু দেরীতে, এই যা তফাৎ। হবেই হবে।

শিষ্য—মশায়, এতদিন আপনার পাদপদ্মে এসেছি; কই হলো কি?

স্বামীজি—হবে না কি রে? এখানকার সাধুদের ভালবাসা পেয়েছিস্, আবার চাস্ কি? কালে সব ভেতরকার সাধুবৃত্তি ঐ ভালবাসা থেকে ফুটে বেরোবে।

শিষ্য—মশায়, আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বামীজি—আশীর্ব্বাদ ছোট কথা। তোকে যে কত ভালবাসি। (বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়েছে)।

শিষ্য—মশায়, আপনাকে স্থির হয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে মন কেমন করে। আমিও যেন স্থির হয়ে যাই। আবার গল্প বলুন্। এইবার স্বামীজি আবার মঠের সাধন-ভজনের কথা তুল্‌ছেন্। "কাল তুই ঘণ্টা বাজিয়ে তবে সাধুদের তুল্‌বি। আজ আমার ঘরে শু'য়ে থাক্‌বি; আমি তোকে ৪টায় তুলে দিব—দেখ্‌বি কেমন মজা হবে। রাখাল টাকাল সকলকে তুল্‌তে হবে। খুব জোরে জোরে রাজার কাণের কাছে গিয়ে ঘণ্টা নাড়্‌বি। দেখ্‌বি, কত গাল মন্দ খেতে হবে।" বলিতে বলিতে স্বামীজি হেসে আকুল হচ্ছেন।

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজি মধ্যে মধ্যে "শিব, শিব" উচ্চারণ করিতেছেন। স্বামীজির মুখে সেই 'শিব শিব' নাম যারা শুনেছে, তারাই

জানে সে কি মধুর উচ্চারণ। শিষ্যের বোধ হ'ত যেন শিব নিজেই নিজের নাম কচ্ছেন।

স্বামীজি পুনরায় বল্‌ছেন—ওরে সন্ন্যাস্ কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নাই। একটু বেচালে পা পড়্‌লো ত একবারে পাহাড় থেকে খডে পড়্‌লো। হাত পা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কাণাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি; রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে; দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হলো। লোকটাকে বল্‌লুম, "ওরে ছিলিম্‌টে দিবি?" সে যেন জড় সড় হয়ে বল্‌লে "মহারাজ, হাম্ মেথর হ্যায়।" আমিও শুনে একটু হটে পড়্‌লুম। সংস্কার কিনা? তাই তামাক না খেয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম। খানিকটা গিয়েছি, মনে বিচার এলো, তাইতো সন্ন্যাস্ নিয়েছি; জাত কুল মান সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম? তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না? এইটে ভেবে ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। তখন প্রায় একপো পথ এসেছি। আবার ফিরে যেতে হ'লো। আবার সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি, তখনো লোকটা সেখানে ব'সে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লুম 'ওরে বাপ্, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়'। তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বল্লুম, ঐ ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে? অবশেষে সে তামাক সেজে দিলে, আনন্দে ধূমপান করে তবে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিলে জাতি-বর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখতে হয়, বুঝলি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ; আপনার কথা যা শুন্‌চি তাতে অবাক হচ্ছি, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই!

স্বামীজি—আমাদের বুঝি তেমন সাধু ঠাওরেছিস্! যা বলা, তাই করা। ঠাকুরের ভক্তদের এটা বিশেষত্ব জান্‌বি। দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেল্‌লেও এরা একচুল এদিক্ ওদিক্ করবে না।

শিষ্য—মশায়, আপনি যে কখন কি বলেন, কিছু বুঝতে পারি না। কখন বলেন তোরা গৃহী, মঠের চার্ ধারে বাড়ী ঘর করে দিবেন। আবার কখনো ত্যাগের ideal (আদর্শ) নির্দ্দেশ করে প্রাণে আতঙ্ক আনেন। এ কি রকম?

স্বামীজি—ওরে, সব শুনে যাবি; যেটা ভাল লাগে সেটা ধরে থাক্‌বি—bull dog এর মত কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌বি।

বলিতে বলিতে শিষ্য-সহ স্বামী নীচে আসিতেছেন আর 'শিব শিব' উচ্চারণ করিতেছেন। আবার কখন বা গুণ গুণ করে গান ধরিতেছেন "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী" ইত্যাদি।

ক্রমশঃ

ভক্তিরহস্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইষ্ট।

হিন্দুদের ইষ্টসম্বন্ধীয় মতবাদসম্বন্ধে পূর্ব্ব বক্তৃতায়ই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি—আশা করি, ঐ বিষয়টী আপনারা বিশেষ যত্নসহকারে আলোচনা করিবেন; কারণ, ইষ্টনিষ্ঠাসম্বন্ধে ঠিক ঠিক বুঝিলে আমরা জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। 'ইষ্ট' শব্দটী ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে—উহার অর্থ—ইচ্ছা করা, মনোনীত করা। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানবের চরম লক্ষ্য একই—মুক্তিলাভ ও সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান, তথায়ই কোন না কোন আকারে এই মুক্তিবাসনা ও দুঃখনিবৃত্তিরূপ ভাবদ্বয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য ধর্ম্মের নিম্নাঙ্গ সমূহে ঐ ভাবগুলি তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সুস্পষ্টই হউক আর অস্পষ্টই হউক, আমরা সকলেই ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই দুঃখের হাত—প্রতিদিন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহার হাত—এড়াইতে চাই, আর আমরা সকলেই স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের—চেষ্টা করিতেছি। সমগ্র জগতের সমুদয় কার্য্যের মূলেই ঐ দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা। কিন্তু যদিও সকলের গম্যস্থান এক, তথাপি উহাতে পঁহুছিবার উপায় নানা, আর আমাদের প্রকৃতির ভিন্নতা ও বিশেষত্ব অনুযায়ী এই সকল বিভিন্ন পথ বা উপায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্ম্মপ্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। এক প্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ

সকলের চরম লক্ষ্য এক হইলেও উহাতে পঁহুছিবার উপায় নানা।

থাকিতে পারে। এখন আমরা যে বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। এক জনের প্রকৃতিতে পুত্রবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালবাসা, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা। কাহারও বা স্বদেশপ্রীতি অতিশয় প্রবল—আবার কেহ কেহ জাতিধর্ম্মদেশনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর যদিও আমরা সকলেই এমন ভাবে কথা কই, যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের জীবনের নিয়ামক, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি এক শত জনের উপর আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্পমাত্র কয়েকজন সাধুই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন—তাঁহারাই উক্ত শব্দটীর সৃষ্টি করিয়াছেন—ক্রমশঃ উহা একটী চলিত শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তার পর আহাম্মকেরাও ঐ শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাদের মাথায় ত আর কিছু নাই। সুতরাং নিরর্থক তাহারা ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব দেখা গেল, মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই এই সার্ব্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন আর তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া আমার মত লোক তাহার প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদয় মহৎ ভাবগুলিরই পরিণাম এই। তবে আমরা প্রার্থনা করি, কালে এইরূপ অধিক সংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হইবে, আর যতই অল্পসংখ্যক হউন, জগৎ যেন কখন এরূপ লোকশূন্য না হয়।

সার্ব্বজনীন প্রেমসম্পন্ন লোক অতি বিরল।

যাহা হউক, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই, একটী নির্দ্দিষ্ট পথেও সেই ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় রহিয়াছে। সকল খ্রীষ্টিয়ানগণই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেস্‌বিটেরিয়ানের * দৃষ্টি খ্রীষ্টের

খ্রীষ্টসম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা।

* প্রেস্‌বিটেরিয়ান (Presbyterian)—এই খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বিশপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া 'প্রেস্‌বিটার' নামধারী অধ্যক্ষগণের চার্চ্চের কার্য্য নিয়মনে তুল্য অধিকার স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায় শাসনের (discipline) বিশেষ পক্ষপাতী।

জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, যে সময়ে তিনি একটী চার্চ্চের ভিতর পোদ্দারদের লেন দেন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ' বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে অন্যায়ের প্রতি তীব্র আক্রমণকারী রূপে দেখিয়া থাকে। কোয়েকারকে * জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত বলিবেন—খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কোয়েকার খ্রীষ্টের ঐ ভাবটীই গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, খ্রীষ্টের জীবনের কোন্ অংশ আপনার খুব ভাল লাগে, তিনি হয়ত বলিবেন, 'যখন তিনি পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' † প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ই তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, এক বিষয়েই কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ থাকে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল আপনাদিগকে অভ্রান্ত ও অপর সকলকে ভ্রান্ত মনে করে।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সব অবান্তর বিভাগগুলির মধ্যে একটীকে অবলম্বন করিয়া শুধু যে অপর সকল ব্যক্তির তাহার নিজ ধারণানুসারে জগৎসমস্যার ব্যাখ্যা করিবার অধিকার অস্বীকার করে, তাহা নহে, তাহারা এমন কি, অপরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাহারাই কেবল অভ্রান্ত—এই কথাও বলিতে সাহসী হয়। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা তাহার সহিত বিরোধে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, তাহারা যাহা বিশ্বাস করে, যে

* কোয়েকার (Quaker) ইংলণ্ডের লিষ্টার শায়ার নিবাসী জর্জ্জ ফক্স নামক ব্যক্তি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহারা আপনাদিগকে Society of Friends নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রচারের সময় এতদূর আগ্রহের সহিত শ্রোতৃবৃন্দকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপথে যাইতে উপদেশ দিতেন যে, সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃন্দ ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন—অনেকের কম্প হইত। এই 'কম্প' হইতেই এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিগণ বিদ্রূপচ্ছলে ইহাদিগকে Quaker বা কম্পনশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত করে। অসৎপথ হইতে নিবৃত্তির জন্য তীব্র অনুতাপ ও শত্রুর প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমা—এই সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা।

† রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশ্বাস করেন, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে পিটরকেই সর্ব্বপ্রধানরূপে মনোনীত করিয়া তাঁহারই উপর সমুদয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার কার্য্য পরিচালনার প্রধান ভার প্রদান করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস- পিটর রোমের চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রথম বিশপ হন। আর এই কারণেই তাঁহার পোপ নামধারী উত্তরাধিকারিগণ সমগ্র রোমান ক্যাথলিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজার অধিকারী হইয়াছেন। সেণ্ট ম্যাথিউ লিখিত গস্পেল ১৬শ অধ্যায়, ১৯শ শ্লোকে 'And I will give unto thee the keys of the Kingdom of heaven' ইত্যাদি পিটরের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের বাক্যগুলি দেখুন

কেহ তাহা না মানিবে, তাহাকেই তাহারা মারিয়া ফেলিবে। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগের আলোচনায় কিরূপ ভাব আশ্রয় করিতে চাই? আমরা শুধু অপরে ভ্রান্ত নহে, ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহি না— আমরা সকলকেই বলিতে চাই যে, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক করিতেছে। আপনার প্রকৃতি অনুসারে বাধ্য হইয়া আপনাকে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, আপনার পক্ষে সেই পন্থাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অবস্থার ফল-স্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন, উহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, নয় বলুন, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দ্দেশ করুন না কেন, এই অতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকেরই দেহ মনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

ভক্তিযোগী সকল প্রকার সাধন প্রণালীরই সত্যতা স্বীকার করেন।

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, যে বিশেষ সাধনপ্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই ইষ্ট কহে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, আর আমরা আমাদের নিজ নিজ সাধন প্রণালীকে আমাদের ইষ্ট বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—কোন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশক্তিমান্ শাসনকর্ত্তা। যাহার ঐরূপ ধারণা, তাহার স্বভাবই হয়ত ক্ষমতাপ্রিয়—সে হয়ত একজন মহা অহঙ্কারী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে একজন সর্ব্বশক্তিমান্ শাসনকর্ত্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অপর একজন—সে হয়ত একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কঠোর-প্রকৃতি। সে ভগবান্‌কে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, পুরস্কারশাস্তিবিধাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী দর্শন করিয়া থাকে আর আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপে দেখিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের ইষ্ট কহে। আমরা আপনাদিগকে এমন

ইষ্ট—প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ঈশ্বরধারণা।

এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, যেখানে আমরা ঈশ্বরকে ঐরূপেই, কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে পারিনা। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, আপনি অবশ্য তাঁহার উপদেশকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আপনার ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হয়ত আপনার একজন বন্ধুকে যাইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিলেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা কুৎসিৎ উপদেশ সে আর কখন শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশে কোন ভুল নাই, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টীই আর একটু ব্যাপকভাবে বলিলে বলিতে পারা যায়, এটা সত্য—সত্যও বটে, আবার মিথ্যাও বটে। আপাততঃ কথা দুইটী বিরোধিবৎ প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, নিরপেক্ষ সত্য একমাত্র বটে, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য নানা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সমষ্টিবস্তু হিসাবে অপরিবর্ত্তনশীল, সমরস সত্তা মাত্র, কিন্তু আপনি আমি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, নিজের নিজের পৃথক্ পৃথক্ জগৎ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকি। অথবা সূর্য্যের কথা ধরুন। সূর্য্য একমাত্র, কিন্তু আপনি আমি—এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি—উহাকে বিভিন্ন সূর্য্যরূপে দেখিবেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই সূর্য্যকে বিভিন্ন ভাবে দেখিতে হইবে। এতটুকু স্থান পরিবর্ত্তন করিলে একব্যক্তিই পূর্ব্বে সূর্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন আর একরূপ দেখিবে। বায়ুমণ্ডলে এতটুকু পরিবর্ত্তন হইলে সূর্য্যকে আর একরূপ দেখাইবে। সুতরাং বুঝা গেল, আপেক্ষিক জ্ঞানে সত্য সর্ব্বদাই বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু একমাত্র। এই হেতু যখন দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে সকল কথা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত আপনার বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও আপনাদের উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ব্যাসার্দ্ধ এক সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্ত্তী হয়, দুইটী ব্যাসার্দ্ধের দূরত্বও তত অধিক হয়, কেন্দ্রের যত সমীপবর্ত্তী হয়, দূরত্ব ততই অল্প হয় আর যখন সমুদয় ব্যাসার্দ্ধগুলি কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়।

নিরপেক্ষ সত্য একত্র হইলেও আপেক্ষিক সত্য নানা।

এই কেন্দ্রই সমুদয় মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঐ কেন্দ্রত রহিয়াছেই—কিন্তু উহা হইতে এই যে সব ব্যাসার্দ্ধ শাখাপ্রশাখারূপে বহির্গত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের প্রকৃতিগত বাধা বা আবরণস্বরূপ, যাহার মধ্য দিয়াই আমাদের পক্ষে উহার কোনরূপ দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে—আর এই প্রকৃতিগত বাধারূপ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে অবশ্যই এই নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে হইবে। এই কারণে আমাদের কেহই অঠিক নহে, সুতরাং কাহারও অপরের সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

বিরোধ ভঞ্জনের প্রকৃত উপায়—সেই নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধি।

ইহার একমাত্র মীমাংসা—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের মধ্যে শত শত ব্যক্তির প্রত্যেকের বিভিন্ন মত। এখন আমরা যদি সকলে মিলিয়া বসিয়া তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা আমাদের বিভিন্নতার মীমাংসার চেষ্টা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। ইহার একমাত্র মীমাংসা—এগিয়ে যাওয়া—সেই কেন্দ্রের দিকে যাওয়া—আর শীঘ্র শীঘ্র উহা করিতে পারিলে অতি সত্বরেই আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা নাশ হইয়া যাইবে।

দল বাঁধিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না।

অতএব ইষ্টনিষ্ঠা অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে অধিকার দেওয়া। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন না, অথবা আপনি যাঁহাকে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব আর এই যে সব চেষ্টা—কতকগুলো লোককে জড় করিয়া 'চাপেন শাপেন বা' জোর জার করিয়া—অধিকারী বিচার নাই—কিছু নাই—যাকে তাকে ধরিয়া এক বেড়ার মধ্যে পুরিয়া এক প্রকারে ঈশ্বরোপাসনা করাইবার চেষ্টা—কখন সফল হয় নাই,কোন কালে সফল হইতেই পারে না; কারণ, ইহা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এমন নরনারী একটীও দেখিতে পাইবেন না, যে কিছু না কিছু ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা না করিতেছে—কিন্তু কটা লোক ধর্ম্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে? খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে। কেন বলুন দেখি?—কারণ, যা

হবার নয়, তার জন্য লোকে চেষ্টা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্ম্ম অবলম্বন করান হইয়াছে।

মনে করুন—আমি একটী ছোট ছেলে—আমার বাবা একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই এই রকম—অমুক জিনিষ এই এই রকম। কেন, আমার মনে ঐ সব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? আমি কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়া তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইবার চেষ্টা করেন—আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি—আমার মনের বিকাশ—কিছুই হয় না। আপনারা একটা গাছকে কখন শূন্যের উপর অথবা উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া ফলাইতে পারেন না। যে দিন আপনারা শূন্যের উপর গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেই দিন আপনারা একটা ছেলে-কেও তাহার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

জোর করিয়া এক জনের ভাব অপরের ভিতর প্রবেশ করানোর চেষ্টায় ঘোরতর কুফল।

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে আপনারা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্ন দূর করিয়া 'নেতি' মার্গে সাহায্য করিতে পারেন। জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিতে পারেন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; উহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—বাস্, আপনার কার্য্য ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। উহা নিজ প্রকৃতিবশেই সূক্ষ্ম বীজ হইতে স্থূল বৃক্ষাকারে প্রকাশ হইয়া থাকে। ছেলেদের শিক্ষা-সম্বন্ধেও এইরূপ। ছেলে নিজে নিজেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছেন, যাহা শিখিলেন বাটী গিয়া নিজ মনের চিন্তা ভাবগুলির সহিত

অপরকে যথার্থ সাহায্য করিবার প্রকৃত উপায়—তাহার উন্নতির বাধাগুলি অপসারিত করিয়া দেওয়া।

মিলাইয়া দেখুন দেখি। দেখিবেন, আপনারাও চিন্তা করিয়া ঠিক সেই ভাবে —সেই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন—আমি কেবল সেইগুলি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন কালে আপনাকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনাদিগকে নিজেদের শিক্ষা নিজেই করিতে হইবে—হয়ত আমি সেই চিন্তা—সেইভাব—সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি। ধর্ম্মরাজ্যে এ কথা আরো অধিক সত্য। ধর্ম্ম নিজে নিজেই শিখিতে হইবে।

কাহারও কাহাকেও নিজ ভাব জোর করিয়া দিবার অধিকার নাই—উহার ঘোরতর কুফল।

আমার মাথায় কতকগুলা বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুব এই সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এসব জিনিষ আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে—ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা ও না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে—জগতে আজ কি ভয়ানক অমঙ্গল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে, ভাবুন দেখি! কত কত সুন্দর ভাব, যাহা অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলি দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভাবুন দেখি। এখনও আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের বাল্যকালের ধর্ম্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম্ম এই সব লইয়া কি ঘোর কুসংস্কাররাশি রহিয়াছে, ভাবুন দেখি। ঐ সকল কুসংস্কার শুধু আপনাদিগকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা নহে, আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলে মেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না—সে একরূপ ভালই বলিতে হইবে—কারণ, একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে সে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহা সে জানে না। এই প্রাচীন উক্তিটী সম্পূর্ণ সত্য যে, "দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্ব্বোধেরা সেখানে বেগে অগ্রসর হয়।" গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে? 'ইষ্ট-নিষ্ঠা' মতে বিশ্বাসী হইয়া। নানা প্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার অধিকার নাই—জোর

করিয়া কোন আদর্শ আপনাকে দিবার আমার অধিকার নাই। আমার কর্ত্তব্য—আপনার সাম্‌নে এই সব আদর্শ ধরা আর আপনার কোন্‌টা ভাল লাগে, কোন্‌টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন্‌টা আপনার প্রকৃতি-সঙ্গত, সেইটী যাহাতে আপনি দেখিতে পান। যে কোনটী হয় গ্রহণ করুন, আর সেই আদর্শ লইয়া ধৈর্য্যের সহিত সাধন করিয়া যান—আর এই যে আদর্শটী আপনি গ্রহণ করিলেন, সেইটীই আপনার ইষ্ট হইল, আপনার বিশেষ আদর্শ হইল।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। আসল ধর্ম্ম প্রত্যেকের নিজের নিজের কায। আমার নিজের একটা ভাব আছে—আমাকে উহাকে পরম পবিত্রজ্ঞানে গোপনে নিজ হৃদয়ের ভিতর রাখিতে হইবে, কারণ, আমি জানি, আপনার ও ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিয়া কি হইবে?

লোককে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইলে তাহারা আমার সহিত আসিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। জগৎ কতকগুলি পাগল ও আহাম্মকে পূর্ণ। কখন কখন আমার মনে হয়, জগৎটা একটা পাগলা গারদ—ভগবানের চিঁড়িয়াখানা। আমার ভাব তাহাদের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াইতে থাকি, তবে সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অতএব বলিয়া ফল কি? এই ইষ্ট প্রত্যেকেরই গোপন থাকা উচিত—আপনার নিজের ব্যাপার অপরের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা আপনি জানিবেন আর আপনার ভগবান্ জানিবেন। ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ভাগ বা মতবাদগুলি সর্ব্বসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে, সর্ব্ববিধ জনগণের সমক্ষে উহা প্রচার করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধনাঙ্গ সর্ব্বসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে না। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত কর বলিলেই কি ফস্‌ করিয়া কেহ উহা করিতে পারে?

প্রত্যেকের ইষ্ট প্রত্যেকের প্রাণের বস্তু ও গোপন থাকা উচিত।

সমবেত হইয়া ধর্ম্ম করা রূপ এই তামাসার প্রয়োজন কি? এ ধর্ম্মকে লইয়া ঠাট্টা করা—ঘোর নাস্তিকতা মাত্র। এই কারণেই চার্চ্চগুলি ভদ্রমহিলাদের ভাল ভাল পোষাক পরিয়া বাহার দিবার জায়গা দাঁড়াইয়াছে!

চার্চ্চ এখন ধর্ম্ম-বিবাহের স্থান না হইয়া বিবাহের পূর্ব্বে যাইয়া বাহার দিবার জায়গা হইয়া উঠিয়াছে! মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের বন্ধন সহ্য করিবে? এখনকার চার্চ্চের ধর্ম্ম ব্যারাকে সৈন্যগণের ড্রিলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! হাত তোল, হাঁটু গাড়, বই হাতে কর - সব ধরা বাঁধা। দু'মিনিট ভক্তি, দু'মিনিট জ্ঞান-বিচার, দু'মিনিট প্রার্থনা—সব পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া থেকেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই সব ধর্ম্মের হাস্যাস্পদ বিকৃত অনুকরণ এখন আসল ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে আর যদি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এরূপ চলে, তবে ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। তখন আর চার্চ্চে থাকিবে কি? চার্চ্চ সকল যত প্রাণ চায়, মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক না কেন, কিন্তু উপাসনার সময় আসিলে, আসল সাধনার সময় আসিলে যেমন যীশু বলিয়াছিলেন, "প্রার্থনার সময় আসিলে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও এবং সেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর," তদ্রূপ করিতে হইবে।

আধুনিক চার্চ্চের ধর্ম্ম

ইহারই নাম ইষ্টনিষ্ঠা। আপনারা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, অপরের সহিত বিবাদ যদি এড়াইতে হয় ও যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে দেখিবেন—এই ইষ্টনিষ্ঠাই ইহার একমাত্র উপায়। তবে আমি আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনারা যেন আমার কথার অর্থ এরূপ ভুল বুঝিবেন না যে, আমি গুপ্তসমিতি গঠনের সমর্থন করিতেছি। যদি সয়তান কোথাও থাকে, তবে আমি গুপ্তসমিতিসমূহের ভিতর তাহাকে খুঁজিব। গুপ্তসমিতি—এ সব পৈশাচিক ব্যাপার।

ইষ্ট গোপনীয় বলিয়া আমি গুপ্তসমিতি গঠনের পক্ষপাতী নহি।

ইষ্ট প্রকৃত পক্ষে কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে, উহা পরম পবিত্র বলিয়া আমাদের প্রাণের বস্তু। অপরের নিকট আপনার ইষ্টের বিষয় কেন বলিবেন না? না—আপনার প্রাণের বস্তু বলিয়া উহা আপনার নিকট পরম পবিত্র। উহা দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা আমি কিরূপে জানিব? মনে করুন, কোন ব্যক্তির প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনায় অসমর্থ—

সে কেবল নির্গুণ ঈশ্বরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের—উপাসনায় সমর্থ। মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম আর সে বলিতে লাগিল—একজন নির্দ্দিষ্ট পুরুষ স্বরূপে ঈশ্বর কেহ নাই, তুমি আমি সকলেই ঈশ্বর। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব তাহার প্রাণের বস্তু বলিয়া তাহার নিকট পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে।

'ইষ্ট' গোপন রাখার তাৎপর্য্য।

কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এ সব পাশ্চাত্য ভাব—ঐগুলি এখন ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা এ সব গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না আর ভারতে এইরূপ গুপ্ত সমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইউরোপে কোন ব্যক্তিকে চার্চ্চের মতের বিরুদ্ধ একটা কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে এই গরিব বেচারারা যাহাতে নিজেদের মনোমত উপাসনা করিতে পারে, তজ্জন্য পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া গুপ্ত সমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু অপর ব্যক্তি হইতে বিভিন্নধর্ম্মমতাবলম্বী হওয়ার দরুন কেহ কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। ইউ-রোপীয়েরা ভারতে যাইবার পূর্ব্বে তথায় কোন কালে কখন গুপ্ত ধর্ম্মসমিতি ছিল না, সুতরাং ঐরূপ সব ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন।

ভারতে কোন কালে গুপ্ত সমিতি ছিল না।

উহা অপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার আর কল্পনায় আনিতে পারা যায় না—সহজেই ঐ সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। আমার জগতের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এই সব গুপ্ত সমিতির আসল তাৎপর্য্যটা কি—কত সহজে উহারা বাধাহীন প্রেম-সমিতি, ভূতুড়ে সমিতি রূপে দাঁড়ায়। লোকে উহাতে আসে—আপনার মনের মানুষ খুঁজিতে—লোকে শপথ করিয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অপর নরনারীর হাতের পুতুল হইয়া দাঁড়ায়। আমি এই সব বলি-তেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে

গুপ্ত সমিতির ভিতর-কার গলদ।

পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হয়ত পাঁচ সাত জন লোক আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই পাঁচ সাত জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি লোক হয়। আমি কতকগুলো বাজে ঝামেল চাহি না। কতকগুলো লোক জড় হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় গোটাকতক লোকের দ্বারাই জগতের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে - অবশিষ্ট-গুলি ত গড্ডলিকাপ্রবাহ মাত্র। এই সমস্ত গুপ্ত সমিতি ও বুজরুকি নর-নারীকে অপবিত্র, দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, আর দুর্ব্বল ব্যক্তির দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নাই, সুতরাং সে কখন কোন কার্য্য করিতে পারে না। অতএব ওগুলির দিকেই যাইবেন না। ও সব হৃদযের ভিতরকার কাম বা ভ্রান্ত রহস্যপ্রিয়তা মাত্র। আপনাদের মনে ঐ সব ভাব উদয় হইবামাত্র তখনই একেবারে উহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। যে এতটুকু অপবিত্র, সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। পচা ঘাকে ফুল চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। আপনারা কি ভাবেন, আপনারা ভগবান্‌কে ঠকাইতে পারিবেন? কেহই কখন পারে না। আমি সাদা-সিদে সরলপ্রকৃতি নরনারী চাই, আর ঈশ্বর আমাকে এই সব ভূত, উড্ডীয়-মান দেবতা ও ভূগর্ভোত্থিত অসুর হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিদে ভাল লোক হউন। যখনই লোকে এই সব অলৌকিক দাবী করে, তখনই এই কথাগুলি স্মরণ করিবেন।

অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কার বিদ্যমান—দেহের যে সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতে অসাড়ে হইয়া যায়, সেইগুলি ইহার উদাহরণ। ইহা হইতে আমাদের আর এক উচ্চতর বৃত্তি আছে—তাহাকে বিচার-বুদ্ধি বলা যায়—যখন বুদ্ধি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতে একটী সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাকেই বিচার-বুদ্ধি বলে। ইহাপেক্ষা জ্ঞানলাভের আর এক উচ্চতর প্রণালী আছে—তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান বলে—উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না—উহাতে সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুস্কিল। আজকাল অতি আহাম্মকেরা আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাহারা

সহজাত সংস্কার, বিচারজনিত জ্ঞান ও দিব্য জ্ঞান।

বলে, "আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি—আমার জন্য একটা বেদী করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড় হও, আমার পূজা কর।"

কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছে বা জুয়াচুরি করিতেছে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? দিব্যজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষা এই যে, উহা কখনই যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবাবস্থার বিরোধী নহে, উহার বিকাশমাত্র; এইরূপ আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তি-বিচারের ভিতর দিয়াই দিব্যজ্ঞানে পঁহুছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না—যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিন্। আপনার অজ্ঞাতে দেহের যে সকল গতি হয়, সে গুলি ত যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। একটা রাস্তা পার হইবার সময় গাড়ী চাপা যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য অসাড়ে আপনার দেহের কেমন গতি হইয়া থাকে। আপনার মন কি বলে, দেহকে এরূপে রক্ষা করাটা নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে? কখনই বলে না। খাঁটি দিব্যজ্ঞান কখন যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা আগাগোড়া জুয়াচুরি বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই দিব্যজ্ঞান সকলের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া চাই। উহাতে লোকের উপকারই হইবে, নাম যশ বা কোন কোন বদমায়েসের পকেট ভর্ত্তি যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। সর্ব্বদাই উহা দ্বারা জগতের—সমগ্র মানবের—কল্যাণই হইবে—দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন। যদি এই দুইটী লক্ষণ মেলে, তবে আপনি অনায়াসে উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় লক্ষে এক জনের এইরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কি না সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে আর আপনারা প্রত্যেকেই এইরূপ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। এখন ত আমরা ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র, এই দিব্য জ্ঞান হইলেই আমাদের ধর্ম্ম যথার্থ আরম্ভ হইবে। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছেন—"এক্ষণে আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সাম্‌না সাম্‌নি দেখিব।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

দিব্যজ্ঞানের লক্ষণ।

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব।

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি' বলিয়া দাবী শুনা যায়, আর কখনই এরূপ শুনা যায় নাই আর এই যুক্ত রাজ্যে এইরূপ দাবী যত দেখা যায়, আর কোথাও তত নহে। এখানকার লোকে বলিয়া থাকে, রমণীগণ সব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন আর পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন স্ত্রীলোক অপেক্ষা ঐরূপ পুরুষের সংখ্যা কখনই কম নহে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের এইটুকু বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মূর্চ্ছা ও স্নায়বীয় রোগ প্রবল। জুয়াচোর ঠকের কাছে ঠকা অপেক্ষা ঘোর অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল। বিধাতা আপনাকে অল্প স্বল্প তর্কবিচারশক্তি দিয়াছেন—দেখান—আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। তার পর উহাপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বিষয়ে হাত দিবেন।

দিব্যজ্ঞানের অনর্থক দাবী।

আমার সহিত একবার একজন দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুর সাক্ষাৎ হয়—সে এ দিকে বেশ সুশিক্ষিত, কিন্তু হিমালয়বাসী অদ্ভুতশক্তিশালী মহাত্মাদের গল্প শুনিয়া তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। আমি যখন বলিলাম, ও সব মহাত্মাদের বিষয় আমি কিছুই জানি না এবং সম্ভবতঃ ওসব গল্পের ভিতর কিছু সত্য নাই, তখন সে ব্যক্তি আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গেল এবং আমাকে একজন জুয়াচোর ঠাওরাইল।

জগতের ভাবই এই আর এই সব নির্ব্বোধ যখন আপনাদিগের নিকট এইরূপ একটা গল্প করিবে, তখন তাহাদের নিকট উহা অপেক্ষা আর একটু রঙদার গল্প করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই রহস্যপ্রিয়তা একটা ব্যারাম—এক প্রকার অস্বাভাবিক বাসনা। উহাতে সমগ্র জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া দেয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া দেয়—সদা সর্ব্বদা একটা অস্বাভাবিক ভূতের ভয় বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। এই সব বিকট গল্পগুলিতে স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিক বিকৃত করিয়া রাখে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য্য হইয়া যায়।

অদ্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধানে মানুষকে হীন-বীর্য্য করিয়া ফেলে।

আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ সব অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতর নাই।

'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।'

'মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা ছোট কূয়া খুঁড়িতে যায়।'

'মূর্খ সে, যে হীরার খনির নিকট থাকিয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে।'

ঈশ্বরই সেই হীরক-খনি। আমরা ভূতের গল্প ও এইরূপ সমুদয় বৃথা বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ত্যাগ করিতেছি—ইহা যে মূর্খতা—তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাতে মানুষকে হীনবীর্য্য করিয়া দেয়—ও সব সম্বন্ধে কথা কওয়াই মহাপাপ! ঈশ্বর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা—এ সব ছাড়িয়া এই সব বৃথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া! অপরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট যদি আমাকে অপর লোকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে ত আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বী হউন, নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়ান, প্রেমের ভগবান্‌কে অন্বেষণ করুন। ইহাই মহাতেজের—মহাবীর্য্যের নিদান। পবিত্রতার শক্তি হইতে আর কোন্ শক্তি শ্রেষ্ঠ? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন এই ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারে না- অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোন দিকে দুর্ব্বল হইবেন না। ঐ সব ভূতুড়ে কাণ্ড কেবল আপনাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—আর সব অসত্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর সমুদয় বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে। মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা! ঈশ্বর, কেবল ঈশ্বরের সেবা করুন।

আসল বস্তু ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অদ্ভুততত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন নষ্ট করিবেন না।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা [১৩০৯]।

[স্বামী সত্যকাম।]

হিমালয়-কন্দর-নিঃসৃতা, স্বচ্ছসলিলা, বেগবতী গঙ্গা; গঙ্গাবক্ষে দ্বীপ-পুঞ্জ; তটে প্রস্তর অথবা ইষ্টকাবৃত সৌধাবলি, তদুপরি কারুকার্য্যশোভিত দৃঢ়-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজি ও স্থানে স্থানে এক একটী মন্দির; তৎপশ্চাতে বণিক্‌সম্প্রদায়ের নানা প্রকারের পণ্যদ্রব্যসজ্জিত দোকানের পার্শ্বে সুবৃহৎ প্রাসাদসমূহ অথবা যাত্রীদের থাকিবার আবাসশ্রেণী; পরে পদব্রজে

আসিবার সুবিস্তৃত পথ ও পথপার্শ্বে কতিপয় ধনী বণিক্ প্রতিষ্ঠিত পান্থশালা এবং সর্ব্বোপরি মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান শিবালিক পর্ব্বত—ইহাই আমাদের পুণ্যভূমি হরিদ্বার।

গঙ্গাতটে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ সৌধাবলির স্থানে এক্ষণে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত বড়, ছোট প্রস্তরখণ্ড ও স্তূপীকৃত বালুকারাশি—পার্শ্বে প্রকাণ্ড হাবেলি নিচয় বা প্রস্তরনির্ম্মিত, কারুকার্য্যমণ্ডিত বৃহৎ বাটী সকল ভগ্নাবস্থায় অথবা পুরাতনাবস্থায় দণ্ডাযমান; গঙ্গাভ্যন্তরে অধিকাংশ প্রবিষ্ট সুন্দর উদ্যানাবলি; নূতন ও পুরাতন মন্দির ও সাধু মহাত্মাদের প্রতিষ্ঠিত নূতন ও পুরাতন মঠসমূহ; দ্বিখণ্ডিত গোলাকার প্রস্তরখণ্ডমণ্ডিত সুবিস্তৃত রাস্তা; পশ্চিমী পল্লিগ্রামী ও সহুরে ভাবের একত্র সম্মিলনে নির্ম্মিত বাজার; পরস্পর দূর-সন্নিবেশিত অট্টালিকাসমূহ ও তন্মধ্যগত প্রস্তরাবৃত পথ এবং পরিশেষে বিখ্যাত হরিদ্বার-কানপুরের নহর বা খাল—ইহাই হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান কনখল।

দক্ষালয়ে রাজার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, উদ্দেশ্য সৃষ্টি-লয়ের নিষ্প্রয়োজনত্ব সপ্রমাণ করা! কাজেই এ যজ্ঞ শিবহীন যজ্ঞ। মহা উৎসাহে যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। নারদ স্বর্গ, মর্ত্ত্য চারিদিকে দেবগণ ও ঋষিগণকে নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন। কেবলমাত্র কৈলাসভূমি অনিমন্ত্রিত রহিল। সতী এ সংবাদ পাইলেন। ত্বরায় কোনরূপে মহাদেবের আদেশ লইয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন এবং যাহাতে কৈলাসে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হয়, সেজন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। ফলে পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ ও মহাদেবের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক যজ্ঞভূমির অন্যরূপ ধারণ—এ সব ব্যাপার এই কনখলের গঙ্গাতীরেই অনুষ্ঠিত বলিয়া পুরাণে কথিত। ঐ সকল ঘটনার নিদর্শনস্বরূপ যজ্ঞস্থলে পরে "দক্ষেশ্বর" নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাত্রীরা এখন ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সতীঘাট নামে গঙ্গাতীরস্থ একটী ঘাটের পার্শ্বে বহু পুরাকালে কতকগুলি সতীদেহ দাহ করা হয়। এখন সেই সেই স্থানে এক একটী ছোট ছোট গম্বুজ নির্ম্মিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী গঙ্গার বন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যেগুলি আছে, সেগুলিকে আজ পর্য্যন্ত যাত্রীরা দেখিয়া নয়ন সার্থক করেন ও ভক্তিভরে পূজা করেন।

পুরাণ বলেন, যজ্ঞস্থল হইতে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেবের বাহ্যজ্ঞান-

শূন্যাবস্থায় গঙ্গাপার হইয়া অভ্রভেদী হিমালয়ের প্রথম শৃঙ্গোপরি যেমন আরোহণ করা, অমনি বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা পশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর স্থানে স্থানে ঐ মহাপবিত্র সতী-অঙ্গের অংশ পতিত হইয়া পীঠস্থান সকলের উৎপত্তি। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া মহাদেব যে শৃঙ্গে যাইয়া উঠেন, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম এক্ষণে "চণ্ডীর পাহাড়।" এখানে মন্দিরাভ্যন্তরে চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পাণ্ডারা এখনও যাত্রীদিগকে এ সব পৌরাণিক কথা শুনাইয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়। পুরাণ পড়িয়া সকলেরই এই সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিতে অভিলাষ হয়। আমরাও ঐরূপে মুগ্ধ হইয়া হরিদ্বারে যাই এবং সার্দ্ধ দুই বৎসরকাল কনখলে বাস করি। বলা বাহুল্য, হরিদ্বার হইতে কনখল ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। নির্জ্জনতাপ্রিয় জনগণের পক্ষে হরিদ্বারাপেক্ষা কনখলই আদরের আবাসস্থান সন্দেহ নাই।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে পর্ব্বদিনে কত শত লোকের, কত শত রাজা রাজড়ার স্নান ও দান, কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ; দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া গঙ্গাহীন দেশের লোকদের মৃত আত্মীয় ব্যক্তির 'ফুল' বা অস্থি রজতখণ্ড অথবা সুবর্ণখণ্ড সংযোগে গঙ্গায় দেওন; শ্রবণনাথ মন্দির দর্শন; অরণ্যাভ্যন্তরস্থ ও পর্ব্বতপার্শ্বস্থিত বিল্বেশ্বর শিব দর্শনানন্তর কনখলে আগমন; তথায় আসিয়া সতীঘাটে স্নান ও মৃত সতীদের উদ্দেশ্যে গম্বুজোপরি জল দেওন; ব্রাহ্মণ, চারব (আচার্য্য কথার অপভ্রংশ—ইঁহারাও এক প্রকার ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের কার্য্য যাত্রীদের আনীত "ফুল" গঙ্গায় নিক্ষেপ করা) এবং সাধু মহাত্মাদিগকে ভোজন করান ও দান; দক্ষেশ্বর শিব দর্শন, সতীকুণ্ডের—এখানেই সতীর দেহত্যাগ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ; নীলধারা দর্শন করিয়া গঙ্গাপারে চণ্ডীর পাহাড়ে গমন ও চণ্ডীদেবীর পূজাদি দেওন এবং বৎসরমধ্যে নির্দ্দিষ্ট দুই দিবস সেই পর্ব্বত নিম্নে গঙ্গাতটে এখানকার অধিবাসী স্ত্রীপুরুষদিগের সকলে মিলিয়া গমন করিয়া বনভোজন ও আনন্দ; স্বধর্ম্মপরায়ণ ধনীদিগের প্রতিষ্ঠিত ছত্র হইতে সাধুদের মাধুকরী ভিক্ষা; এখানকার অধিবাসী স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বনদেবীর পূজা হস্তে সুমধুর 'ভজন' গাহিতে গাহিতে গমন, বনভোজন ও প্রত্যাবর্ত্তন; রামলীলা, ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপার দিনের পর দিন এক একটী

করিয়া যতই দেখিতে লাগিলাম, হৃদয় ততই ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

হেথায় থাকিবার সময় শীতের শেষাশেষি একদা রাত্রি ১২টার সময় গরুর গাড়ী করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া, অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা—কোথাও বা ঐ সকল একত্র মিলিত হইয়া নদী-রূপে পরিণতা—পার হইয়া, অসংখ্য ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া, উঁচু নীচু রাস্তায় গাড়ী চলিতে লাগিল। যে গাড়ীখানিতে আমি ছিলাম, তাহার সঙ্গে আরও দুইখানি গাড়ী যাইতেছিল। তিনখানি গাড়ীই কনখলের কোন বণিকের। কনখল হইতে মাল লইয়া যাইতেছিল। বণিকের সঙ্গে আমাদের আলাপ থাকায় তিনি আমাকে সর্ব্বশেষ গাড়ী-খানিতে যাইবার অনুমতি দেন।

অন্ধকার রজনী। আমি কখনও বসিয়া গাড়োয়ানের সহিত তাহার দেশের কথা কহিতেছি, কখনও বা শুইতেছি, এই ভাবে চলিলাম। রাত্রি এখন ২॥ টা আন্দাজ হইবে, আমার বেশ একটু নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ "লাগাও," "লাগাও" শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র উঠিয়া বসিলাম। নিমেষমাত্রে চক্ষু একবার রগ্‌ড়াইয়া লইয়া লাঠি হস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া দেখিলাম, দুই দলে ক্রমাগত লাঠি, মুষ্ট্যাঘাত চলিতেছে। তখন ব্যাপার কি হইয়াছে, জানিবার আর সময় হইল না—শশব্যস্তে এই ব্যাপারে যোগদান করিলাম। অন্ধকারে কোন্‌গুলি আমাদের গাড়োয়ান আর কোন্‌গুলি অপরপক্ষীয়, কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শত্রুপক্ষদিগকে প্রহার করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বলিল "স্যাবাস্ মহারাজজি, শালেকো অচ্ছেতরহসে লাগাও," অপর একজন "পুলিষ" "সিপাই" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই দুই জনই যে আমাদের গাড়োয়ান ইহা আর তখন জানিতে বাকি রহিল না। দেখিলাম, ঐ দুই জনের অন্য চারিজন প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এই চারি জনের মধ্যে একজন আমাদের তৃতীয় গাড়োয়ান হইবে প্রথমে ভাবিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমাদের গাড়োয়ান দুইজন ঐ চারি জনকেই প্রহার করিতেছে, তখন আমার ভ্রম হইয়াছে জানিতে পারিয়া উক্ত চারি জনকেই প্রহার করিতে লাগিলাম। তাহারাও যথাসাধ্য উত্তম মধ্যম দিতে কুণ্ঠিত হইল না। এইরূপে প্রায়

আধ ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষে সজোরে লাঠি মুষ্ট্যাঘাত চলিবার পর আমাদের একজন গাড়োয়ান অপরপক্ষীয়ের একজনকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল। অপর গাড়োয়ানটী এবং আমি ইত্যবসরে অপর তিন জনের দিকে অগ্রসর হইলাম। তাহারা নিজেদের একজন সঙ্গীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই বোধ হয় ভয়ে পলায়ন করিল। আমরাও দুই চারি হাত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া যখন দেখিলাম যে, আমাদের পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ানটী অপরপক্ষীয় লোকটীকে বেশ শিক্ষা দিয়াছে, তখন অনেক করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে বলাতে সে অগত্যা ছাড়িয়া দিল। সে লোকটী অতি কষ্টে পলায়ন করিবার পর আমাদের তৃতীয় গাড়োয়ানটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করাতে একজন গাড়োয়ান বলিল, "ওহ গাড়ীকি তলে মেঁ পড়া হায়।" গাড়ীর একটী লণ্ঠন সাহায্যে তাহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিলাম যে, সে তাহার একটী হাতের এক জায়গায় সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে। অবশেষে তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া আমিই গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলাম। অপর দুইখানি গাড়ী পূর্ব্বে যেমন আমাদের গাড়ীর আগে আগে চলিতেছিল, সেইরূপই চলিতে লাগিল। তখন যাইতে যাইতে ব্যাপারটা কি হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করায়, আঘাতপ্রাপ্ত গাড়োয়ান বলিল যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা গাড়ী হাঁকায় এবং মধ্যে মধ্যে সুবিধামত মাল বোঝাই গাড়ী পথিমধ্যে পাইলে গাড়োয়ানদের মারপীট করিয়া কিছু মাল কাড়িয়া লইতেও ছাড়ে না। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমাদের নিকট আসিয়া প্রথমে গালি দিতে থাকে। পরে ক্রমে মারামারি হইয়া পড়ে।

গাড়ী চলিতে লাগিল। পথে আর কোন উপদ্রব হইল না। ক্রমে প্রাতঃসমীরণ বহিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী নববস্ত্রপরিধানা হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে বহিরাগমন করিলেন। সূর্য্যদেব নিজ সুন্দর প্রাতঃ-কিরণ জগতের উপর ঢালিয়া দিলেন। যে অরণ্য রাত্রিতে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অরণ্যই অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিল। বেলা ৮॥০ টার সময় আমাদের পূর্ব্বের গাড়ী দুইখানি এক স্থানে আসিয়া থামিল। আমিও আমাদের গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম—

শিবালিক-শৃঙ্গ উত্তরে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণেও পশ্চিমে নিবিড় অরণ্য—হিংস্র জন্তুর বাস। মধ্যে বন্ধুর নাতি দূরবিস্তৃত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র প্রস্তরাবৃত তপোভূমি "হৃষীকেশ।" আর পূর্ব্বে পুণ্যসলিলা গঙ্গা তপোভূমির চরণ ধৌত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অতি বেগে ধাবিতা! সে বেগে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আজ কোথা হইতে আসিয়া দুই দিন পরে স্রোতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! সে শ্রুতিমধুর অথচ বজ্রনিনাদবৎ তরঙ্গোত্থিত "হর হর বম্ বম্" শব্দে আপনা হইতেই সাধুর চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়! আবার সে জল এমনই স্বচ্ছ যে, নীচের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডগুলিও গণিয়া লইতে পারা যায়। বড় বড় মৎস্য সকল স্বাধীনতার পূর্ণ মাত্রায়, সাধু ও ভক্তদিগের প্রসাদে উদর পূরণ করিয়া ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছে। পূর্ব্বদিকে গঙ্গার অপর পার হইতে অভ্রভেদী হিমালয়ের আরম্ভ।

একটী ধর্ম্মশালায় আমাদের বাসা ঠিক করা ছিল। তিন দিন এখানে রহিলাম। এখানে তখন বড় ঝাড়ি, ছোট ঝাড়ি এবং পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহে অল্প বিস্তর সহস্রাধিক সাধু মহাত্মার সমাগম দেখিলাম। তাঁহাদের প্রাতঃস্নান-করণান্তর মহিম্নঃ স্তব কিম্বা গীতাদি পাঠ, গঙ্গাবক্ষে এক একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ডের উপর অচল অটল সুমেরুবৎ বসিয়া ধ্যান, দিবা নয়টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উন্মুক্তদ্বার সত্র হইতে যখন যাঁহার ইচ্ছা মাধুকরী লইয়া গঙ্গার কূলে বসিয়া ভক্ষণ ও তৎপরে পাণিপুটে জলপান, বৈকালে কোথাও বা কতকগুলি সাধু একত্রিত হইয়া ভাগবৎ বা আত্মপুরাণ পাঠ, কিম্বা ভগবদ্বিষয় চর্চ্চা এবং একক এক একটী ক্ষুদ্র "কূপে" ('ফুশ' নামক এক প্রকার খড় নির্ম্মিত ঠিক ধান্য রাখিবার মরাইয়ের ন্যায় কুটীরে) বাস—এ সমস্ত দেখিয়া মনে যে কি এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল, তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। যিনি স্বচক্ষে এ পবিত্র তপোভূমি দর্শন করিবেন, তিনিই কেবল প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিবেন, এবং আনন্দ অনুভব করিবেন।

তিন দিন পরে কনখলে প্রত্যাগমন করিলাম। এস্থানে হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ আসিবার পথের সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু বলা ভাল। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ ঠিক ১৪ মাইল পথ। হরিদ্বার হইতে একাগাড়ী একখানা ২৲ টাকা ভাড়ায় এপর্য্যন্ত আসে। এখানে গরুর গাড়ীতে, ঘোটকারোহণে অথবা পদব্রজে আসিতে পারা যায়। আর একটী পথও আছে; যথা—হরিদ্বার হইতে রেলযোগে 'রাইওয়ালা' (হরিদ্বারের পরের ষ্টেশন) যাইয়া তথা হইতে ৯ মাইল পদব্রজে আসিলেই এখানে পৌঁছান যায়। আমরা এ পথ

দিয়াও তিন চারি বার যাতায়াত করিয়াছি। পথিমধ্যে হরিদ্বার হইতে ৭ মাইল দূরে 'সত্যনারায়ণ' চটি আছে। এই চটিতে একটী মন্দির ও তৎ-সংলগ্ন ধর্ম্মশালা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে সত্যনারায়ণের শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিদ্যমান। এরূপ সুন্দর শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি খুব কমই দেখিয়াছি। মন্দির-সংলগ্ন একটী ছত্র আছে। তথায় সন্ন্যাসীদিগকে অতি যত্নে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করান হয় এবং ব্রহ্মচারীদিগকে সিধা দেওয়া হয়। আমরা এ ছত্রে একবার খাইয়াছিলাম। যতবারই হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ গিয়াছি, উক্ত বার ব্যতীত অন্য কোন বারেই আমাদের কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় নাই। অতএব এই পথ যে সুকঠিন, ইহা কেহ যেন ধারণা না করেন। প্রত্যুতঃ দিনে যাইলে কোনরূপই ভয়ের কারণ নাই।

আমাদের কনখলে থাকিতে থাকিতে হরিদ্বারে কুম্ভমেলার জন্য মঠধারী মহান্ত এবং রাজসরকার উভয় পক্ষ হইতে বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কারণ, সাধু এবং গৃহস্থ অসংখ্য লোক মেলায় উপস্থিত হইবেন। কনখলে প্রবেশ-পথের উপর "নির্ব্বাণী" সাধুদের যে প্রকাণ্ড বাগান আছে, তাহার ভিতরে উঁহাদের প্রকাণ্ড লম্বা কুটীর নির্ম্মাণ করা হইল। এইরূপে হরিদ্বার এবং কনখলের মধ্যবর্ত্তী মায়াপুর নামক স্থানে গঙ্গার উপর "নিরঞ্জনী"দের, হরি-দ্বারে 'ভৈরব আখাড়া' নামক আখড়ার "জুনা"দের, কনখলে গঙ্গাতীরে অটল আখাড়ার "অটল"দের, কনখলে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী বালুকারাশির উপর তাঁবু প্রভৃতি বিস্তার করিয়া "বড় আখাড়ার," নির্ব্বাণীদের সম্মুখে কনখলে প্রবেশপথের উপর ছাউনিতে "ছোট আখাড়ার," হরিদ্বার ষ্টেশনের নিকট "নির্ম্মলা"দের এবং গঙ্গামধ্যস্থ চড়ার উপর "বৈরাগী"দের জমায়েৎ আসিয়া থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত হইল। নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা ও অটলেরা, শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পথ-প্রদর্শিত দশনামান্তর্গত চারি প্রকার নাগা সাধু। শ্রীনানক-প্রচলিত উদাসী পন্থের দুইটী আখাড়া আছে—একটী বড় আখাড়া অপরটী ছোট আখাড়া। নির্ম্মলা সম্প্রদায়ে শ্রীনানক-প্রদর্শিত ভাবসমূহ কতকাংশে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংএর উপদেশাবলিই বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। রামায়ত, বৃন্দাবনী, বল্লভাচারী, রামানুজী প্রভৃতি কয়েক প্রকার বৈরাগী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। আরও অনেক ছোট ছোট মঠের, ছোট বড় মণ্ডলীর পক্ষ হইতে গঙ্গামধ্যস্থ চড়ায় এবং অন্যান্য স্থানে স্ব স্ব সাধুদের জন্য বড় বড় তাঁবু, কুটীরাদির বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে সকল

সম্প্রদায়েরই জমায়েৎ বা দল আসিয়া গেল। জমায়েৎ আসিবার কালে নগ্ন ও ভস্মাচ্ছাদিত সাধুদের জয়ধ্বনি, সুসজ্জিত হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র ও বাদ্যাদির আড়ম্বর এবং লাঠিখেলা প্রভৃতি দেখিবার উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

এখন কনখল হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত "সপ্তস্রোত" বা "সপ্তধারা" (গঙ্গা এখানে সাতটী ধারা হইয়া হরিদ্বারাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন) পর্য্যন্ত গঙ্গাবক্ষে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ গৈরিকবসনধারীতে পরিপূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নানা পন্থের এত সাধু একত্রে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এই কুম্ভ মেলাতে ৩টী স্নানের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটী ১৩০৯ সালের শিবরাত্রির দিনে। ঐ দিনের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সাধুরা হরিদ্বারে পৌঁছিতেই পারেন নাই। অতএব যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল স্নান করিলেন। এ দিনও তত যোগের দিন ছিল না। স্নানের দ্বিতীয় দিন ছিল ১৪ই চৈত্র, ইংরাজী ২৮শে মার্চ্চ ১৯০৩, অমাবস্যার দিনে। ঐ দিনের পূর্ব্বেই সকল সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন, কেবল মাত্র বৈরাগীদের সকলে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। স্নানের প্রথম দিনাপেক্ষা দ্বিতীয় দিনটীতে বিশেষ যোগও ছিল। বেলা ৯টার মধ্যে গৃহস্থেরা সকলে স্নান করিয়া লইলেন। কারণ ৯টার পর হইতে সাধুমণ্ডলী বা জমায়েৎদের স্নান করিবার সময় রাজসরকার হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হরিদ্বারে যখনই কুম্ভমেলা হয়, তখনই নিরঞ্জনীরা প্রথমে স্নান করেন। জুনারা ইঁহাদের আশ্রিত। অতএব প্রথমে নিরঞ্জনীরা ও তৎসঙ্গে জুনারা হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলেন। আমরাও নিরঞ্জনী আখাড়ার বিশেষ অনুরোধে উঁহাদের সঙ্গে যাইয়া স্নান করিলাম। ইঁহাদের স্নানান্তে নির্ব্বাণী ও অটলরা (অটল আখাড়া নির্ব্বাণীদের আশ্রিত), পরে বৈরাগীরা, পরে উদাসী বড় আখাড়া, ছোট আখাড়া ও নির্ম্মলারা ক্রমশঃ একে একে আসিয়া স্নান করিলেন। মেলায় আসিবার সময় যে প্রকারে হস্তী, ঘোটক, বাদ্যাদি সহকারে জমায়েৎ আসে, সেই ভাবে সুসজ্জিত হইয়া জমায়েৎ সকল স্নান করিতেও যায়। নিরঞ্জনী, জুনা, নির্ব্বাণী ও অটলেরা স্নানকালে প্রথমে "গুরু মহারাজকী ভেলা"র স্নান করাইয়া পরে আপনারা স্নান করে। ঐরূপে বড় আখাড়ার সাধুরা শ্রীগুরু নানকের কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাদুকার স্নান পূর্ব্বে করাইয়া পরে নিজেরা স্নান করে। কেবল

ছোট আখাড়া ও নির্ম্মলা সাধুরা স্নান করিয়া গঙ্গাজল লইয়া আসিয়া শ্রীগ্রন্থ সাহেবের উপর ছিটাইয়া দেয়।

স্নানের তৃতীয় বা সর্ব্বশেষ দিন ছিল ৩০শে চৈত্র, ইংরাজী ১৩ই এপ্রেল। ঐ দিনই সর্ব্বপ্রধান যোগের দিন। দূর হইতে গৃহস্থ যাত্রীদের সকলে উহার পূর্ব্বদিনেই আসিয়া গেলেন। এ সময় হরিদ্বার ও কনখলের রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে এত ভিড় হইল যে, বিনা ধাক্কা খাইয়া এক পাও চলা কঠিন হইয়া পড়িল। এ দিনও ৯টার মধ্যে গৃহস্থেরা সকলে স্নান করিয়া লইলেন। তাহার পর ৯টা হইতে জমায়েৎ সব পূর্ব্বদিনের মতন স্নান করিলেন। এই দিনে স্নানের সময় একজন প্রাচীন সাধু শরীর ত্যাগ করেন। সেই মহাপুরুষের কথাটী এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি যেন এই শুভদিনের শুভযোগে গঙ্গাসলিলে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া শরীর ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়েই এতদিন এই দেহভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল, ধ্যানাবস্থায় শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! ইংরাজ সরকার হইতে মেলায় পুল নির্ম্মাণ প্রভৃতি অতি সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। কতদিনের আয়োজন, কতদিনের আগ্রহ সবই এই দিনে শেষ হইয়া গেল! যে মেলাভূমি প্রায় মাসাবধিকাল তিন লক্ষ লোকের সমাগমে হাসিতে-ছিল, আজ স্নানের পর উহা অনেক জনশূন্য দেখা গেল। মেলার সময় কত শত শেঠ ও রাজারা আসিয়া সাধুদিগকে (ভাণ্ডারা) ভোজন করাইলেন, এবং ছাতি ও বস্ত্রাদি দানে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। গরীব গৃহস্থেরাও নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী এই সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। রাজ-পুতনার একজন নগণ্য মজুর স্বীয় যৎসামান্য নিত্য আয় হইতে দুই একটী করিয়া পয়সা বাঁচাইয়া কত বৎসরে একশত মুদ্রা পূরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন —ইনিও আজ এই অবসরে সাধুভোজনে উহা ঢালিয়া দিলেন। এ প্রকার সাধুভক্তি এখনও ভারতে বিরল নহে দেখিয়া এ পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করা বহু ভাগ্যফলে হইয়া থাকে বলিয়া আমাদের মনে হইতে লাগিল। মেলার সময় প্রতি আখাড়ায় প্রতি মণ্ডলীতে প্রত্যহ কোথাও পাঠ, কোথাও ভজন, কোথাও বক্তৃতা, আবার কোথাও বা ধর্ম্মচর্চ্চা হইল। সকল পন্থীর সাধুরাই এ সময় কি এক অপূর্ব্ব শক্তিতে যে আত্মহারা হইয়া শ্রীজগদ্‌গুরুর মহিমাকীর্ত্তনে ধাবমান হইয়াছিলেন, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম যে একটা জীবন্ত জাগ্রত জিনিষ তাহা এই মেলা দেখিয়া যতদূর মনে ধারণা হয়, এমন আর কিছুতে হয় কিনা সন্দেহ।

মধুর রস ও বৈষ্ণবকবি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

শ্রীরাধার এই অপরূপ ভাব মহাকবি বিদ্যাপতি বর্ণনা করিয়াছেন।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সু লেহ।
আপন বিরহ আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোর হি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রতই তহি
আধ আধ কহু বাণী॥
রাধা সঙ্গে যব গুণ তহি মাধব
মাধব সঙ্গে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তব্ হি নাহি টুটত
বার ত বিরহ বাধা॥
দুহুদিশ দারুদহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐ ছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভণ॥

শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের এই অমৃতময় ফল। চিন্তার কত প্রগাঢ়তায়, সাধনার কত একাগ্রতায়, তপস্যার কত প্রখরতায় এই অবিনশ্বর আত্মপরমাত্মসংযোগ সাধিত হয়, তাহা বৈষ্ণবকবির বিরহচিত্রগুলির অনুশীলন করিলে বুঝা যাইবে। দর্শনের কঠিন ও কঠোর গবেষণায় যাহা হৃদয়ে সম্যক্রূপে প্রস্ফুরিত হয় না, কবির অমর তুলিকার স্পর্শে সেই গভীর তত্ত্ব একটী অনিন্দ্যসুন্দর ভক্তিবর্ণোজ্জ্বল চিত্রের সাহায্যে হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের হ্লাদিনী ও আনন্দময়ের বেদ-বেদান্ত-

সুপ্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব মিলন বর্ণনাই বৈষ্ণব কবি করিয়াছিলেন; এবং মহাকবি বিদ্যাপতির পূর্ব্বোদ্ধৃত পবিত্র পদটী রচিত হইবার প্রায় শত বৎসর পরেই পবিত্র বঙ্গদেশে এই অপূর্ব্ব মিলনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-তনুতে দেখা দিয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছিলেন, এবং মহাকবির পদের প্রত্যেক অক্ষরের সত্যতা জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

এই আত্মার মধ্যে পরমাত্মার স্ফুরণ, আত্মার সহিত পরমাত্মার সংমিশ্রণ যখন সম্যক্ ধারণা হইল, তখনই ভক্তের ভগবৎসাধনা, রাধার কৃষ্ণানুশীলন চরম সীমায় উপস্থিত হইল। ইহা কেবল আবেশ মাত্র নহে। কৃষ্ণাবেশে শ্রীরাধা অনেকবার মুরলী মুখে দিয়া কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়াছেন। তাহা আত্ম বিস্মৃতি বটে, কিন্তু তাহা এই অবস্থার অনেক দূরে অবস্থিত। এখন শ্রীরাধার যে ভাব, তাহা মহাভাবময়ীর আনন্দময় যন্ত্রণাময় আত্মহীন কৃষ্ণতন্ময়ত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্ব সম্পাদক"। শ্রীরাধার প্রেমের এই নিরাবিল সার্থকতা, এই অমৃতময় ফল। জ্ঞানলব্ধ ধন প্রেমের বন্ধনে চির সম্মিলিত হইতে চলিয়াছে ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে? তাই শ্রীরাধার কৃষ্ণের বিরহানুভূতি দ্বারা উপনীত কৃষ্ণতন্ময়ত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় অপার আনন্দ! যন্ত্রণার আনন্দ, অশ্রুজলের পবিত্র অভিষেক!

এই অদ্বৈত-জ্ঞান-সম্পাদনই বিরহের প্রধান কীর্ত্তি, ভগবানের সর্ব্বোত্তম "প্রসাদ"। এই অদ্বৈত জ্ঞানের এই সংমিশ্রণের পর যে দ্বৈতজ্ঞান, সে বড় মধুর, সে বড় রসময়, সে বড়ই লোভনীয়! ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, "চিনি হ'তে চাই না মাগো, চিনি খেতে ভালবাসি"। ভক্ত মাত্রেরই এই আকাঙ্ক্ষা: ভক্ত মুক্তি চান না, ভালবাসিতে চান। ভক্ত ভাবের বশীভূত হইয়া অনন্ত ভালবাসা দিয়া ভগবৎ-রসাস্বাদন করিবার জন্য উন্মুখ, সেইজন্য পরমাপরোক্ষানুভূতির পরও তাঁহার বিরহানন্দ ঘুচে না। তাই মহাভক্ত কবি বিদ্যাপতি কহিয়াছেন—

রাধা সঙ্গে যব শুণ তহি মাধব
মাধব সঙ্গে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তব্‌ হি নাহি টুটত
বাঢ় ত বিরহ বাধা॥

এইরূপে বৈষ্ণবকবি-চিত্রিত শ্রীরাধার হৃদয়ে এককালে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের অপূর্ব্ব সংমিলন হইতেছে। কিন্তু শ্রীরাধা পরক্ষণেই অদ্বৈত ভাব

দূরে ফেলিয়া দিয়া, ভক্তভাব, প্রেমিকার ভাব আশ্রয় করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেনঃ -

সজনি কো কহে আওব মাধাই
বিরহ পয়োধি পার কি যে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়লু জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জায়ব
কি করব মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জায়ব
কি করব বারিদ মোহ।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লোহ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
অব নাহি হোও নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

আবার পরক্ষণেই স্বপ্নবশীভূতা হইয়া আশার রজ্যে বিচরণ করিতে করিতে প্রেমময়ী বলিতেছেন।

বঁধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর রসের সাগর
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি গদ গদ করি

কহিব বচন ঘোর॥
তবহি মিলন দেখিয়া বদন
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছল ছলে গর গর বোলে
কত না সাধিব মোরে॥
সময় জানিয়া থির মানিয়া
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি
কহয়ে অনন্ত দাস। (১)

তার পর এই শুভদিন আসিলে কেমন করিয়া প্রিয়তমের সম্ভাষণ করিবেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে আদর করিবেন, তাহা কল্পনা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। পাঠক দেখিবেন, সেই অভ্যর্থনা প্রেমিকার নায়ককে অভ্যর্থনা মাত্র নহে, ইহা ভক্তকৃত দেবতার উদ্বোধন ঃ—

যব্ হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর॥
আলিঙ্গন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গলকলস করব কুচ ভার॥
সহকার পল্লব চূচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ লেবি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

স্বপ্নাবেশে রসময়ী শ্রীরাধিকার হৃদয়ে কত মধুর ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। মনে কত মধুময়ী কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে—কত সোহাগ, কত ভালবাসা জাগিয়া উঠিয়াছে ঃ—

---

(১) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক এই পদটী জ্ঞান দাসের বলিয়াছেন। তৎসম্পাদিত জ্ঞান দাসের পদাবলী দেখ।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন তঁহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সু পুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়াব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহু ধনি তুয়া জীবনে॥

সত্যই তাঁহার জীবন ধন্য—যিনি ভগবানের সহিত এমন সোহাগ, এমন আনন্দ করিতে পারেন!

আবার নূতন ভাব—

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি দেখব সে চান্দ বয়ান॥

ভক্ত চিরকাল ভগবানের "চান্দ বয়ান" "দিঠি ভরি" দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না, এ দেখিবার আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি নাই; অন্তরে, বাহিরে, জগতে, বিশ্বময়, ছোট বড় সকল বস্তুতে সেই "চান্দ বয়ান" জন্মে জন্মে, মুহূর্তে মুহূর্তে, প্রতি পলে, প্রতি নিমেষে দেখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। প্রিয়সম্ভোগ-লালসার অন্ত নাই, তৃপ্তি নাই, ক্লান্তি নাই। এ আনন্দ অবর্ণনীয়!

আজ শ্রীরাধার বিরহযন্ত্রণার শেষ হইয়াছে—তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়তম তাঁহার সহিত চির-সম্মিলিত হইতে আসিয়াছেন—তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।

আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥

'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।' দুঃখের পর সুখ বড় মিষ্ট—"Sweet is pleasure after pain ." গভীর বিরহের পর অনন্ত মিলন। এ মিলন দেহে, মনে, ও আত্মায়। সর্ব্বত্যাগের পর মিলন। আর শ্রীরাধার সংসার নাই, ঘর নাই, পরিবার নাই, এখন সকল ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণানু-রাগিণী। তিনি এখন জানিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বস্বধন ; তিনি জানিয়াছেন সব বস্তুতে, সব আত্মাতে তাঁহার সেই সর্ব্বস্বধন বিরাজ করিতেছেন ; তিনি জানিয়াছেন—দেহ দেহ নহে, যাবৎ সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গম না হয়—ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় নহে, যাবৎ তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুভব বা শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ না হয়। তাঁহার আত্মা,তাঁহার মন, তাঁহার দেহ, তাঁহার গৃহ, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় এখন শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনে সকল বিরহদুঃখ ভুলিয়া তিনি কহিয়াছিলেন ঃ—

আজু রজনী হাম ভাগ পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল আনন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করত চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবহন যবহুঁ মোহে পিয়া ছোয়ত

তবহুঁ মানব নিজ দেহা।

তাই কবি আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন ঃ—

বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগী নহ

ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

নিত্য নূতন রসোৎপাদক শ্রীরাধার প্রেম ধন্য! শ্রীরাধার এক মুহূর্ত্তে সকল দুঃখ শেষ হইয়াছে—তাঁহার অসীম একাগ্রতার সহিত অনুষ্ঠিত তপস্যার ফল লাভ হইয়াছে, আর কষ্ট নাই। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" আজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মন্দিরে। শুধু মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহার কাছে অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছেন এবং বলিতেছেন—

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিলা বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥

যাঁহার জন্য এত কান্না, তিনি যদি এত আদর, এত সোহাগ করেন, তবে কি দুঃখ থাকিতে পারে? তাই আজ আনন্দে অধীরা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন :—

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমার আমার একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের দুখ
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে

আর না যাইব ঘর।

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে

আর কি কাহাকে ডর॥

এ তহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া

পড়িল শ্যামের কোরে।

জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর

ভাসিল নয়ন লোরে॥

শ্রীরাধার এখন হৃদয়ের যোগ হইতে নিজের হীনত্ব জ্ঞান আসিয়াছে, পরশমণির স্পর্শ হইয়াছে, প্রীতির চরম অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে! তিনি বুঝিযাছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" (১)

"বঁধু তুমি সে পরশমণি, হে, বঁধু তুমি সে পরশ মণি।

ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার

সোণার বরণ খানি॥

তুমি রসশিরোমণি, হে, বঁধু তুমি রসশিরোমণি।

মোরা অবলা অখলা আহিরিনী বালা

তো সেবা নাহি জানি॥

* * * * *

অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন, আমি হৃদয়ে মাখিয়া রাখি।

ওদুটী চরণ পরাণে ধরিয়া নয়ান মুদিয়া থাকি॥"

প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস হৃদয়ের সহিত সায় দিয়া কহিতেছেন—

চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি তুহুঁ সে পিরীতি জান হে।

বঁধু যে তোমার এক কলেবর দুহুঁ সে এক প্রাণ হে॥

প্রেমময়ী নিজের অশেষ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, শুধু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া বারবার শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভিক্ষা চাহিতেছেন—'অনুগত জনে দয়া না ছাড়িও তুমি'। আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিও, হে বঁধু, হে কালিয়া, তুমি অখিলের নাথ, আমি গোপ গোয়ালিনী, আমি ভজন জানি না,সাধন জানি না,

(১) মহাপ্রভুর বচন।

পাপ জানি না, পুণ্য জানি না, সুখ জানি না, দুঃখ জানি না, সংসার জানি না, মান জানি না কুলশীল লাজভয় কিছুই জানি না, জানি—শুধু তোমার রাঙ্গা চরণ দুখানি, জানি—শুধু তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে, জানি যে, তুমিই আমার।

"ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার।

তোমার রূপ চিনি না, তুমি চিনাইলে চিনিব ; কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার দেহ, মন, জীবন ; যাহা কিছু আমার, সকলি তোমার ; তুমি এই বিশ্বের সকল বস্তুতে বিস্ফুরিত ; তুমিই আমার সব। হে প্রাণাধিক, গলায় বসন দিয়া তোমার পায়ে নিবেদন—"জীবনে মরণে না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়"। আমি হীনা দীনা—

আহীরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥

কিন্তু তুমি তো দয়ার সাগর, তোমার গর্ব্বে আমার গর্ব্ব, তোমার রূপে আমার রূপ, তোমার গভীর প্রীতির মর্ম্ম আমি কি বুঝিব প্রভু! তোমায় কি দিয়া পূজা করিব তাহা জানি না, তোমায় কোথায় রাখিব তাহা জানি না, কোথায় বসাইব জানি না, 'তুমি আমার আধ আচরে বস', আমার আসন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই, তুমি আমার এই নগ্ন হৃদয়ের আধ আচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি। তোমায় কোথায় লুকাইব, কেমন করিয়া তোমায় সর্ব্বদা কাছে রাখিব, তাহা জানি না—

তুমি মণি নও মাণিক নও
যে হার করে গলায় পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ॥

"হে প্রেমময়, তুমি আমায় কত আদর কর, হাম মতিহীনে এতেক আদর! আমি তোমায় কি দিব"?

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

আমার জ্ঞানে কাজ নাই, মানে কাজ নাই, আমায় শুধু প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে দাও. আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥

হে দয়িত ! তুমি শিখাইলে আমি শিখিব, তুমি আমায় শিখাও, তুমি কেমন—'তুহুঁ কৈছে মাধব কহবি মোয়।' আমি শুধু জানি যে,তুমি সুন্দর, তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব, বিশ্বের যথাসর্ব্বস্ব।

হাতক দর পণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহুঁ জানি ॥

এই মনোহর আত্মসমর্পণে শ্রীরাধার বিরহযন্ত্রণার সমাপ্তি হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিকে নিন্দা করেন, যাঁহারা বলেন যে, বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতা কল্পিত উপকথা মাত্র, তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে,তাঁহারা এই সকল চিত্রগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখেন। যদি দেখেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এমন প্রগাঢ়, এমন গভীর আত্মত্যাগ যে কবিগণের প্রতিপাদ্য, যে কবিগণের বিরহচিত্র গভীরত্বে, পবিত্রতায় গাম্ভীর্য্যে ও চমৎকারিত্বে জগতের কাব্যকাননে, বোধ হয়, অদ্বিতীয়, তাঁহাদের সম্ভোগ-চিত্র শুধু নায়ক নায়িকার ইন্দ্রিয়চপল সম্ভোগ-চিত্র নহে ; ইহার অভ্যন্তরে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে ; কেবল তাহাই নহে, এই সম্ভোগ-চিত্র লজ্জার খাতিরে, তথা-কথিত শীলতার অনুরোধে, অথবা কাহারও কাহারও ভাল না লাগিতে পারে, ব্যক্তি বিশেষ তাহা বুঝিতে না পারে এইরূপ বিবেচনা-পরিচালিত হইয়া না প্রকটন করিলে তাঁহাদের চিত্র নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

অনেকের আপত্তি যে, বৈষ্ণব কবিতা শুধু দেবতার গান কেন বলিব ? আমি বলি, উহা না বলিলে যদি বৈষ্ণব কবির গানে অকারণ একটা কলঙ্ক স্পর্শে, তবে তাহা বলিতেই বা দোষ কি ? বৈষ্ণব কবি যে, কোনও নীচ-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া সম্ভোগ বর্ণনা করেন নাই—ইঁহাদের সম্ভোগচিত্র যে অপবিত্রভাব প্রসূত নহে—পরন্তু পরম রমণীয় ভক্তিরস

প্রস্তুত, তাহাই আমরা এতদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এই প্রস্তাবের উপসংহারকালে আবার একবার আমাদিগকে এই সম্ভোগের কথা বলিতে হইবে। এই সম্ভোগচিত্রও বৈষ্ণব কবিতার অবশ্য প্রদর্শনীয়। দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক প্রেমিকার মিলনে যে আনন্দ, তাহা সব কবিরাই বর্ণনা করিয়াছেন; বৈষ্ণব কবিও তাহা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণব কবি এই খানেই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। ভক্ত ভগবানের সুদীর্ঘ বিরহের পর যে সম্ভোগ, তাহাকে তাঁহারা "সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ" উপাধি দিয়াছেন। উহাতে আত্মার সহিত আত্মারামের রতি অনন্ত সুখপ্রদ, অনন্ত বৈচিত্র্যময়, অচিন্তনীয় রসের আকর। বৈষ্ণব কবি বিরহান্ত মিলনের বড় মধুময় ছবি আঁকিয়াছেন। আনন্দে তাঁহাদের কবিতা নাচিয়া নাচিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, বহু বিচিত্রতাময় ছন্দোবন্ধে সুন্দর সাজে সাজিয়াছে :—

মন্দ পবন   কুঞ্জ ভবন
  কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ   নব সমাজ
  ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
দেখরে সখি   শ্যামচন্দ
  ইন্দু বদনী রাধিকা
বিবিধ যন্ত্র,   সখিনী বৃন্দ
  গাওত রাগ মালিকা॥
তরল তাল,   গতি দুলাল
  নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণ নাথ   করত হাত
  রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গ অঙ্গ   পরশ ফোর
  কেহ রহতু কাহ কোর।
জ্ঞানদাস   কহত রাস
  জৈছনি জলদ বিজুলি জোর॥

ভক্ত ভগবানের এমন সুন্দর, এমন চমৎকার একত্ব ও তাঁহাদের পরস্পরের

অচ্ছেদ্য মিলনে কত নিবিড় আনন্দ—কত হৃদয়োন্মাদক আকর্ষণ,তাহা বৈষ্ণব কবি ভিন্ন আর কেহও জগতে ধারণা করিতে পারিয়াছেন কি না,বলিতে পারি না। ভক্তের কাছে ভগবানের এত নম্রতা, এত বিনয়, ভক্তিবিগলিত-প্রাণ বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেহও ধারণা করিতে সাহস করেন নাই, বর্ণনা করা ত দূরের কথা। ভক্তিলভ্য দিব্য জ্ঞানের প্রসাদে, প্রেমগম্য অসমসাহস ও অন্তর্লীনতার অসাধ্য সাধক ক্ষমতার প্রভাবে, বৈষ্ণব কবি ভক্তের আনন্দ, ভগবানের আনন্দ, ভক্ত ভগবানের চির সম্মিলনে উভয়ের প্রেমোল্লাস ও অভেদে অনন্ত ভেদময় সমরসে সহস্র রস রঞ্জিত তৃপ্তিহীন, ক্লান্তিহীন, শত হিল্লোলময় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ নির্ভীক ও অসঙ্কুচিত তুলিকায়, উজ্জ্বল রাগে চিত্রিত করিয়াছেন বা চিত্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই মহীয়ান্ সম্ভোগ প্রেমিকের চির লোভনীয়, ভক্তের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন, ইহার অমৃতাধিক আনন্দজনক রস অবর্ণনীয়। ইহা ভক্তের হৃদয়ে বসন্তের মলয় পবন, শীতের রৌদ্র, গ্রীষ্মের রজনীর চন্দ্রমার সুধাংশু,সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল। বিশ্বের যত আনন্দ, যত সুখ, যত সৌন্দর্য্য, যত উপভোগ সকলই এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে কেন্দ্রীভূত হইয়া এক মহান্ বিরাট বর্ণনাতীত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে ঃ—

সখিরে কি অনুভব পুছসি মোয়
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

হে অবিশ্বাসী! একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, এই রসোদ্গার কি কামকুক্কুরচর্ব্বিত তুচ্ছ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিসুখের রসোদ্গার? যাহার সৃষ্টি শারীরিক উত্তেজনায় যাহার আনন্দ কেবল মস্তিষ্কের উষ্ণতায়—যাহার পরিসমাপ্তি ক্লান্তিতে, সেই ইন্দ্রিয়পরিচালনার ফল কি এমন অমৃতময় হইতে পারে? একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, কোনও পার্থিব নায়িকার মুখে কি এমন অপূর্ব্ব প্রেমের অক্লান্তি, অতৃপ্তি ও ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল আগ্রহ প্রকাশিত হইতে পারে? প্রেমের কত প্রগাঢ়ত্বে, কত উচ্চতায়, কত পবিত্রতায়, সম্ভোগের কত মহদ্ভাবোন্মেষে, হৃদয়ে এই অসীম অতৃপ্তি, এই নিত্যোজ্জ্বল দিব্যতার সৃষ্টি হয়! যদি বিশ্বাস করিতে এখনও প্রবৃত্তি না হয়, তবে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, তোমাদের অবিশ্বাসজনিত বিষাক্ত নিশ্বাসে বৈষ্ণব কবির পবিত্র হৃদয় সঙ্কুচিত করিও না, বৈষ্ণব পদাবলীর পবিত্র ক্ষেত্র মলিন করিও না। দূরে—অতিদূরে অবস্থান কর; যদি বিশ্বাস না করিতে পার, তবে বৈষ্ণব কবিতা তোমার পক্ষে অগ্নি, ইহা খেলার সামগ্রী নহে—ইহাকে লইয়া খেলা করিতে যাইও না, দগ্ধ হইবে। যদি বিশ্বাস না করিতে পার, তবে তোমার পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা সর্পের মত ভয়ঙ্কর—ইহাকে লইয়া খেলাইবার চেষ্টা করিও না—সর্পবিষে অঙ্গ জর্জ্জরীভূত হইবে। বৈষ্ণব কবিতা পবিত্র নির্ঝরিণী, এখানে তোমাদের মলা ধুইও না। বৈষ্ণবকবিতা উজ্জ্বল নক্ষত্র, গগণের পূর্ণ শশধর; তোমাদের অবিশ্বাস-মেঘে ইহাদিগের পবিত্র কান্তি মলিন করিও না; তোমাদের অবিশ্বাসাস্ত্রে প্রতিকূল ধ্বনির দ্বারা বৈষ্ণবকবির আনন্দময় কুহুধ্বনি বিনষ্ট করিও না—ভক্তের আনন্দ নষ্ট করিও না, জগতের আনন্দ, আশা ও উৎসাহ দূর করিও না।

Dark-brow'd sophist, come not anear;
  All the place is holy ground;
Hollow smile and frozen sneer
  Come not here.
Holy water will I pour
  Into every spicy flower
Of the laurel-shrubs that hedge it around.
  The flowers would faint at your cruel cheer.
In your eye there is death,
  There is frost in your breath
Which would blight the plants.
  Where you stand you cannot hear
From the groves within
  The wild-birds din.

In the heart of the garden the merry bird chants.
It would fall to the ground if you came in. (1)

আর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, স্বার্থবিজড়িত, কামপরাহত, ইন্দ্রিয় বশীভূত, সংসারাসক্ত তুচ্ছ জীব! হে সুন্দর! আমার মনে কি তোমার ভক্ত কবিগণের অমৃতময়ী শিক্ষা প্রতিফলিত হইবে? আমার মনে কি তোমার ভালবাসার অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হইবে? আমি কি জন্মজন্মান্তরেও সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে, মানে অবমাননায়, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব সময়ে—মনে, দেহে, আত্মায় তোমার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়া রাখিতে পারিব? কখনও কি তোমার বিশ্ববিমোহনকারী মুরলীরবের প্রবল আকর্ষণে ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া যাইতে পারিব? কখনও কি তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া আমার হৃদয়-যমুনা উছলিয়া উঠিবে না? কখনও কি আমার হৃদয়ে এই পরম পবিত্র বৈষ্ণব গীতির অপরোক্ষ ধ্বনি চির-মুখরিত হইয়া তোমার অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়, গভীরাদপি গভীরতম সম্পদে আনন্দ, দুঃখের আশাস্বরূপ ভালবাসা জাগরূক করিবে না? হে দয়িত! আমায় বল, আমায় দেখাও, কোন্ জন্মান্তরে আমার এই ক্ষুদ্র দেহ তোমার স্পর্শে উজ্জ্বল হইবে? কোন্ জন্মান্তরে আমার আমিত্ব ঘুচিবে, তুচ্ছ স্বার্থ চিন্তা—যাহাতে এখন সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন রহিয়াছি—তাহা দূর হইবে, এই প্রবল সর্ব্বস্ব বিজয়িনী সংসারাশক্তি তিরোহিত হইবে? কবে এই রিপুর দাসত্ব ঘুচিবে—কবে সেই ভক্তাবতার জগৎ পবিত্রকারী বিশ্ব পূজ্য মহাত্মার মহৎ বাক্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্ম হতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণ নাথস্তু স এব না পরঃ॥

আমরা এই খানে বৈষ্ণবকবির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম। যদি ইহা দ্বারা আমার নিজের ও এক জনেরও হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম জাগরূক হয় তাহা হইলে শ্রম সফল মনে করিব। আমি বৈষ্ণব কবির গূঢ় রহস্যময়ী পদাবলীর ব্যাখ্যা করিবার নিতান্ত অযোগ্য। যাহা বলিয়াছি, তাহা সবই বৈষ্ণব মহাজনগণের কথা, আমার নহে এবং তাহাও বলিয়াছি, কেবল বৈষ্ণব পদাবলীকে ভালবাসি বলিয়া এবং তাহাদের অযথা নিন্দা সহ্য করিতে পারি না বলিয়া। আশা করি ভক্তগণ আমাকে ঐ ধৃষ্টতার জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

(1.) Tennyson.—The Poet's Mind.

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সমর্পণমস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মুদ্রাযন্ত্রের দোষে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যার (আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের) উদ্বোধনে পৃষ্ঠাসংখ্যা ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে উহা সংশোধিত হইল। গ্রাহকগণ এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। ইতি

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [স্বামী সারদানন্দ।

ঠাকুরের গুরুভাব ও মথুরানাথ।

(৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "বড় ফুল ফুট্‌তে দেরী লাগে; সারবান্ গাছ অনেক দেরীতে বাড়ে"। ঠাকুরের জীবনে অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুভাবের বিকাশ হইতেও বড় কম সময় ও সাধনা লাগে নাই। দ্বাদশবৎসরব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার এ স্থান নহে। এখানে চিৎসূর্য্যের কিরণমালায় সম্যক্ সমুদ্ভাসিত গুরুভাবরূপ কুসুমটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা পূর্ব্বাবধি শেষ পর্য্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোন কথা আসিয়া পড়িবে। যে সকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থার সময় সম্বন্ধ, তাঁহাদের কথাও কিছু না কিছু আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।

মথুর বাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার। মথুর, ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন; বিষয়ী হইলেও ভক্ত; হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান্; ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্য্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক—কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত—কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোক কান বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই

হউন বা অন্য যে কেহই হউন ; উদারপ্রকৃতি ও সরল—কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়কর্ম্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মত ঠকিয়া আসিবেন, তাহা ছিল না—বরং বিষয়ী জমীদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে অসদুপায় সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সে সকলেরও তাঁহাতে কখন কখন প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রাণী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্ত্তমান থাকিলেও, বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুর বাবুই তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ; এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি একত্রিত হওয়াতেই রাণী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্‌দপা হইয়া উঠিয়াছিল।

পাঠক হয়ত বলিবে, এ ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন? ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুর বাবু কেন? কারণ, গুটী কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইতেছিল, তখন মথুরই তাহার ভাবী সৌন্দর্য্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাণী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য একথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি। তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখন কখন কিছু কিছু পাইলেও ঐ সকল কার্য্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তি ও শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন, অথচ তাহারা জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীনভাবে, অন্য উদ্দেশ্যে বা ঐ সকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য—তাঁহাদেরই কার্য্যের সহায়ক হইবে বলিয়া—তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা বিঘ্নগুলি সরাইয়া তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া—আর মানুষ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইয়া থাকে! কৈকেয়ীর

শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ, বসুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ, সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রমোদকানন নির্ম্মাণ দেখ, ক্রূর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য্য শঙ্করকে অভিচারাদি সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ। রাজপুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ, আর দেখ—মহামহিম ঈশাকে মিথ্যাপরাধে নিহত করিবার ফল! সর্ব্বত্রই 'উল্টা বুঝিলু রাম' * হইয়া গেল! অথচ মহা-পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ স্বপক্ষকুল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি সহায়ে চিরকালই অন্যরূপ ভাবিয়া অন্য উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে! তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ সকলে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে—শত্রুভাবে ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতি বিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনও কখন উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই মাত্র; এবং ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জ্জিত হইয়া ঐ ভাবে মুক্তি ও চির শান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুর বাবুর ক্রিয়াকলাপও এই শেষ ভাবের হইয়াছিল।

অবতার মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবীশক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হই, এই পর্য্যন্ত। নতুবা আপন আপন

---

* এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গের সাথী তসলা লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল একটি ঘোড়া পাই ত মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই 'এক ঘোড়া দেলায় দে রাম বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোড়া ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ায় উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল "তাইত পল্টন এখনি এ স্থান হতে অন্যত্র কুচ করিবে; ঘোটকী হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সদ্যোজাত শাবকটিকে কেমন করিয়া লইয়া যাই।" ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটি বহন করিবার জন্য একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই 'ঘোড়া দেলায় দে রাম' সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বল পূর্ব্বক তাহাকে শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—'উল্টা বুঝিলু রাম! কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না তাঁহাকে ঘোটকশাবক বহন করিতে হইল!

দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতার, মানবজীবনের বহুঘটনার তুলনায় আলোচনার উহাই বিশেষ ফল। অবতার মহাপুরুষদিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের এইরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ, তাঁহাদের অলৌকিক জীবনাবলীই ত ইতর সাধারণের জীবন গঠনের ছাঁচ (type of model) স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই ত সাধারণ মানব আপন জীবন গঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও পাইবে? দেখনা, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারতজীবন, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন দখল করিয়া বসিয়াছেন! আবার ঐ সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের জীবনাদর্শ সকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকালমধ্যেই বর্ত্তমান ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে! কালে ইহা কি ভাবে কত দূরে যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয়, বল, আমরা কিন্তু, হে পাঠক! উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।

আর এক কথা, মথুর বাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে, 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' ভক্তিবিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ন্যায় সন্দেহদুষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে—'লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষকে মানুষ এতটা বিশ্বাস ভক্তি করিতে পারে কখন? আমরা যদি হইতাম ত একবার দেখিয়া লইতাম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তিবিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন।' যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি বিশ্বাসের উদয় হওয়াটাই একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার! সে জন্যই ঠাকুরের নিকট হইতে মথুর বাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুর বাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি আমাদের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধিমান্ বা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্য্যকলাপে সন্দেহবান্ হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতিপদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনও কোন যুগে মানব যেরূপ নয়নগোচর করে নাই,

বিজ্ঞাননাদিনী প্রেমাবর্ত্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব মন্দাকিনীর সেই গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অল্পকালেই স্খলিত, মথিত, ধ্বস্ত, ও বিপর্য্যস্ত হইয়া চিরকালের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্ব্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্যমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঠাকুরের সরল বালকভাব মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমাবস্থায় ঠাকুরের যখন কখন কখন দিব্যোন্মাদাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং আপনার ভিতর তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তিনি কখন কখন আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী মথুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা বলিয়া উঠিল, 'যাঁহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।' সেই জন্যই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, 'না, যুবক গদাধর অনুরাগ ও সরলতার মূর্ত্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তিবিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন।' তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, 'যা রয় সয়, তাই করা ভাল, ভক্তিবিশ্বাস কথাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাজন তো হইতে হইবেই, আবার দেশে যাহা বলে, তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা!' কিন্তু ঐ সকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অন্তরনিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগ্রতা হইয়া বলিয়া উঠিত, 'কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এই-রূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে, শ্রীগদাধরের ঐরূপ

আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে?' কাজেই, মথুর ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায়, তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর, অধীনস্থ সামান্য কর্ম্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্য্যের পরিচায়ক নহে!

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকারসকলের ন্যায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অন্যে সংক্রমণ আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থুল ও সূক্ষ্ম, সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজ কাল আর কেবলমাত্র বৈদিক ঋষি-দিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই—জড়বিজ্ঞানও একথা প্রায় প্রমাণিত করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব জাগ্রত হইয়া অন্যের মধ্যে নিহিত সুপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এজন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকেই ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তিভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পর পর কার্য্য সকলে আমরা ইহার বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। তবে বিষয়ী মনের যেমন হয়. এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ—এইরূপ বারবার অনেকদিন পর্য্যন্ত দোলায়মান থাকিয়া তবে যে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন দৃঢ় ও অবিচল হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেজন্যই দেখিতে পাই, ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও, ঠাকুরের জীবনে দিন দিন ঐ সকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের মনে সন্দেহের উদয়—ইঁহার ত বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং সুচিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐ সকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।

ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি মথুর বাবুর মন্দ ছিল না, এবং ইংরাজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া 'আমিও

একটা কেও কেটা নই,' অপর সকলের সহিত সমান—এইরূপ যে একটা স্বাধীন ভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাবটাও মথুর বাবুর কম ছিল না। সে জন্য যুক্তিতর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুর বাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুর বাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয় কি না—এ বিষয়ের কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন—"মথুর বলেছিল, 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চল্‌তে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই!' আমি বল্লুম, 'ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে কল্লে সে তখনি তা রদ কর্‌তে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।' সে কথা কিছুতে মান্‌লে না। বল্লে—'লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেন না, তিনি নিয়ম করে দিযেছেন। কৈ, লাল ফুলের গাছে সাদাফুল তিনি এখন করুন দেখি?' আমি বল্‌লুম—'তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।' সে কিন্তু ওকথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবা ফুলের গাছে, একই ডালের দুটো ফেঁকড়িতে দুটি ফুল, একটি লাল, আর একটি ধপ্‌ধপে সাদা, ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরের সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্লুম, 'এই দেখ।' তখন মথুর বল্লে 'হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে'!" এইরূপে, শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখন কখন এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্বলতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায়, এবং কখন কখন ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিন্তই বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতর

শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন লাভ করিয়া পূজার সামগ্রী সকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন; কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্ম্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরন্তু ভগবান্ লাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘস্‌ড়াইতে ঘস্‌ড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি!

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর মহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব্বভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও যাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে, সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবীপৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতীও যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনই তাহা করিতে পারেন না!

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জ্বলন্ত অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বল্‌ব," আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বহিয়া গণ্ড হইতে বক্ষ এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল। সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ন্যায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীরা চতুর্দ্দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা

অবাক্ হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা 'ওঃ, ছোট ভট্‌চাজের পাগলামি, আমি বলি আর কিছু; আজ কিছু বেশী বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি', কেহ বা—'শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বস্‌বে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল'—ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গ রসের ঘটাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না!

ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের হুঁস্ আদৌ নাই। শিবমহিমানুভবে তন্ময় মন তখন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্ত্তা কখনও পৌঁছে না। কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে, বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে?

মথুর বাবু সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লইয়া, শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুর বাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্ম্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সরাইয়া আনার কথা কহায়, বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়!' কর্ম্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতক্ষণ বাদে ঠাকুরের বাহ্যজগতের হুঁস্ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীদের সহিত মথুর বাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?' মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ কর্‌ছিলে, পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম!'

ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (সাধনকালে) যারা এখানে আস্‌ত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর উদ্দীপন হত। এঁড়েদা থেকে দুজন আস্‌ত; তারা জেতে খাট, কৈবত্ টৈবত্ এমনি একটা; বেশ ভাল; খুব ভক্তিবিশ্বাস কর্‌ত ও প্রায়ই আস্‌ত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি আর তাদের ভিতর একজনের একটা অবস্থা হয়! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা

কইতে পাচ্চে না, দাঁড়াতে পাচ্চে না; দু'বোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয় তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙ্গে না! তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, 'মা একে কি কল্লি? লোকে বলবে আমি কি করে দিয়েছি। ওর বাপ টাপ্ সব বাড়ীতে আছে, এখনি বাড়ী যেতে হবে।' তার বুকে হাত বুলিয়ে দি আর মাকে ঐ রকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে সে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী যায়!"

ঠাকুরের জ্বলন্ত সঙ্গে মথুর বাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার এক-সময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্ব্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠাকুরবাড়ী ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটী পৃথক্ বাড়ী আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুর বাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়া-ছিলেন। মথুর বাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশী না হওয়ায় বেশ নজর হইতে-ছিল। কাজেই মথুর বাবু কখন ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনও বা বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধা-রণ করিতেছিলেন। মথুর বাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য কবিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি?—দুইজনের সাংসারিক, সামাজিক ও অন্য সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্য বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরই ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকিলে মথুর বাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ, ধনী মানী বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন বাবু যাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীর ও রাণীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাঁহার সুনয়নে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনও ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্য নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে লোকে তখন নির্ব্বোধ উন্মাদ অনাচারী বলিয়াই

জানিত ও বিদ্রূপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে বল? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয় অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল—মথুর বাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

ঠাকুর বলেন, "বল্লুম, তুমি এ কি কর্‌চ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন কর্‌তে দেখ্‌লে কি বল্‌বে? স্থির হও, উঠ।' সে কি তা শুনে! তার পর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বল্‌লে - 'অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল!' বল্লে 'বাবা তুমি বেড়াচ্চ আর আমি স্পষ্ট দেখ্‌লুম, যখন এদিকে আগিয়ে আস্‌তে দেখ্‌চি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ. দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাব্‌লুম চখের ভ্রম হয়েছে. চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখ্‌লুম. দেখি তাই! এইরূপ যত বার কর্‌লুম, দেখ্‌লুম, তাই!' এই বলে আর কাঁদে! আমি বল্লুম 'আমি তো কৈ কিছু জানিনা বাবু. কিন্তু সে কি শুনে! ভয় হল, পাছে একথা কেউ জেনে গিন্নিকে (রাণী রাসমণিকে) বলে দেয়। সেই বা কি ভাব্‌বে, হয়ত বল্‌বে কিছু গুণ টুন করেছে। অনেক করে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা কর্‌ত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল! মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাক্‌বে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে. রক্ষা করবে!"

এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে, প্রথম দর্শনেই যাঁহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না বুঝিয়া নিন্দা করিলেও যাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন, জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন?—এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুর বাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষ রূপে বৃদ্ধি পাইল।

মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল মন্দ দুই প্রকার কর্ম্ম মানুষকে করিতে হইবেই।

সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, মুক্তপুরুষদিগেরও! সাধারণ মানব স্বয়ংই নিজকৃত সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এখন মুক্তপুরুষদিগের শরীরকৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না? কারণ, সুখদুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান, অহংকার, তাহা ত চিরকালের মত তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া পুড়িয়া গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্ম্মফল তো অবশ্যম্ভাবী এবং মুক্ত-পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মত পড়িয়া না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল মন্দ কতকগুলি কাজ হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন—যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মা-দিগের কৃত শুভ কর্ম্মের এবং যাহারা তাঁহাদের দ্বেষ করে, তাহারাই তাঁহা-দের শরীরকৃত অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। * সাধারণ মুক্ত পুরুষ-দিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফল লাভ হয়, তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল, তাহা কে বলিতে পারে? যাক্ ও কথা, আমরা পূর্ব্বকথার অনুসরণ করি।

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুর বাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট—স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া, ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল, যথা ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার চিকিৎসা, ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুর বাবুর দ্বারা আহুত পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের অবতারত্ব প্রতিপাদন, মহাবৈদান্তিক জ্ঞানী তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ, ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর দক্ষিণে-শ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষ ভাবে সম্বদ্ধ। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার

* "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং।"

বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—"তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাং' ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতং' ইতি"।

পরবর্ত্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পাঁইজোর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন সেইরূপ পরাইবার সাধ হইল, মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন; ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখী-ভাবে সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন ইচ্ছা হইল—মথুরা-নাথ তৎক্ষণাৎ এক স্যুট ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসি সাড়ি ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন; পানিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড় ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দরোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীর রক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি তেমনিই আবার অপরদিকে নষ্ট স্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কি না পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ীর দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় 'কি আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্' ? বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমীদারী সংক্রান্ত দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া উদ্ধার কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের উদ্ধার হইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐ সকল ঘটনাবলী হইতেই আমরা মথুর বাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপই বা হয় কিরূপে ? ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক দেবদুর্ল্লভ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা যে মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল ! মথুর দেখিলেন লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াও ইঁহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইঁহার মনে বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান যশেও—কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান্ বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে—ইঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েই ইনি প্রার্থী নন—অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্ব্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতে

ছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন, ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও যে দেশে রজনী নাই সেই রাজ্যের লোক, ইঁহার ত্যাগ অদ্ভুত, সংযম অদ্ভুত, জ্ঞান অদ্ভুত, ভক্তি অদ্ভুত, সকল প্রকার কর্ম্ম অদ্ভুত এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইহার করুণা ও ভালবাসা অদ্ভুত!

আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—এ অদ্ভুত চরিত্রের মাধুর্য্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইঁহার ভিতর দিয়া হইলেও, ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই—এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাহার এতটুকু লুকান নাই, ভিতরে বাহিরে নিরন্তর একভাব, যাহা মনে তাহাই অকপটে মুখে ও কার্য্যে প্রকাশ—অথচ অন্যের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে, তাহা কখনও বলা নাই, নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব? মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত, ঠাকুরের প্রতি মথুর বাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর, ভাবে, 'লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণ টুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে।' ভাবে, 'তাই ত, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভাণ দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক্ 'বশীকরণের' ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝুড়ে একটু বেগে আস্‌ছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?'

এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ কি করে থাক্‌তে পাব, কি করে তাঁর আরও অধিক সেবা কর্‌তে পাব এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সে জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ নির্ব্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন, অপরাহ্নে 'বাবা চল বেড়াইয়া আসি' বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠে প্রভৃতি কলিকাতার নানা স্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। 'বাবাকে কি যাতে তাতে খেতে দেওয়া চলে' ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক সুট বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন

পানীয় দেন, উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন, 'বাবা, তুমিই ত এই সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বইত নয়; এই দেখনা, তুমি সোণার থালে রূপার বাটি গেলাসে খেয়ে দেয়ে ফেলে রেখে চলে গেলে, আর আমি আবার তুমি খাবে বলে, সেগুলোকে মাজিয়ে ঘষিয়ে তুলে রাখি, চুরি গেল কিনা দেখি, ভাঙ্গল চুরলো কিনা খবর রাখি, আর এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকি।'

এই সময়ে এক জোড়া বারাণসী শালের দুর্দ্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনীস আর কাহাকে দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শালজোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান্, কারণ, উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্ব্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনীস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শাল-খানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মত মহা আনন্দিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে দেখাইতে ও মথুর বাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল! ভাবিলেন—'এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বইত নয়? যে পঞ্চ ভূতের বিকারে সকল জিনীস, সেই পঞ্চ-ভূতেই ত এটাও তৈয়ারী হয়েছে; আর শীত নিবারণ—তা লেপ কম্বলেও যেমন হয়, এতেও তেমনি; অন্য সকল জিনীসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে! এতে এত দোষ! এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, থু, থু, বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন! এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার করে! মথুরবাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন—'বাবা বেশ করেছেন!'

উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়, মথুর বাবু ঠাকুরকে নানা ভোগ সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত

উচ্চে, কোথায় নিরন্তর থাকিত! যেথানেই থাকুক্ না কেন, এ মন সর্ব্বদা আপন ভাবে বিভোর; অপর সকল মন যেখানে কেবল অন্ধকারের উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে,—আলোয় আলো—ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধিরহিত আলো—যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র সূর্য্য তারকার আলো, বিদ্যুতের চক্‌মকানি, অগ্নির ত কা কথা—সব মিট্‌মিটে প্রায় অন্ধকারতুল্য! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা! আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দুদিনের জন্য করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র! অতএব মথুর বাবুর ভোগসুখবিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়ীতে থাকিলেও, যে ঠাকুর, সেই ঠাকুর—নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কারী, আপন ভাবে আপনি নিশি দিন মাতোয়ারা!

জানবাজারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্দ্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিতেছে। বাহ্য জগতের অল্পে অল্পে হুঁস আসিতেছে। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত; এবং ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বারবার বলিতে লাগিল—'অ বামুন, বল্‌না, বাবুটাকে কি করে হাত কর্‌লি? কি করে বাগালি, বল্‌না? চঙ্ করে চুপ্ করে রইলি যে? বল্‌না?' বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ, ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া 'যা শালা বল্লি না' বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমানী ঠাকুর, মথুর বাবু একথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কিছুকাল পরে অন্য অপরাধে মথুর বাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে দুঃখে বলিয়াছিলেন—'বাবা, এ কথা আমি আগে জান্‌লে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকৃত না।'

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুর বাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়।

উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন—'বাবা মানুষ নন ; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করবো? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান।' তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন, তাহা নহে, কার্য্যতঃও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্য্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন! বাবা সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় অন্দরে অবাধ গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি? বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন, ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে ত বাবাকে দেখিয়া অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন অথবা একটি পাঁচ বছরের ছেলে! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর কখন কখন স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৺দুর্গাপূজার সময় অন্দরের স্ত্রীলোকদিগেরই সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর বীজন করিতেছেন, কখন বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া বেশ-ভূষা পরাইয়া স্বামীর সহিত কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে হয় তাহা কাণে কাণে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন—এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে জানিয়া আমরা ইঁহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া থাকি! ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে দেবতা জ্ঞান যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতু ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট উঠা বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতে ঠিক ঠিক আনিতে পারি না!

একদিকে ঠাকুরের মথুর বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপর দিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্য জ্ঞান

ও অনুপম বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, এ বহু বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতর কিরূপে হইয়াছিল ? এ বহুরূপী ঠাকুর কে ?

৺রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্ত্তিদ্বয় তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়ন-ঘর হইতে মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে আনিয়া বসান হইত এবং পূজা ভোগ রাগাদির অন্তে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসা হইত। আবার অপরাহ্নে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহাসনে আনিয়া পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ রাগাদির অন্তে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত। এখন মর্ম্মর পাথরের মেজে জল পড়িয়া পিছল হওয়ায়, ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ গোবিন্দজীর মূর্ত্তিটীর পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ! একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পূজারী ত নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে কাঁটা ! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। কি হইবে ? ভাঙ্গা বিগ্রহে ত পূজা চলে না—এখন উপায় ? রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সহরের সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল পণ্ডিতেরা কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হৈ চৈ ব্যাপার এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মান রক্ষার জন্য বিদায় আদায়ে টাকারও শ্রাদ্ধ ! সকলে পাঁজি পুঁথি খুলিয়া, বার বার বুদ্ধির গোড়ায় নস্য দিয়া বিধান দিলেন—ভগ্ন মূর্ত্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হউক। কারিকরকে নূতন মূর্ত্তি গঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গকালে মথুরবাবু রাণীমাতাকে বলিলেন—'বাবাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা ত হয় নাই ? বাবা কি বলেন, জানিতে হইবে।' বলিয়া, ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন—'রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর এক জনকে তার জায়গায় এনে বসান হত, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত ? এখানেও সেই রকম করা হক। মূর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা করা হক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য ?' সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক্ ! তাইত, কাহারও মাথায় ত এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই ? বাস্তবিকই ত মূর্ত্তিটি যদি ৺গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব ত

ভক্তের হৃদয়ের গভীর-ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায়? হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্ত্তিতেই বা না হইতে পারে কেন? মূর্ত্তিভঙ্গের দোষাদোষ ত আর সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না? তার পর যে মূর্ত্তিটিতে তাঁহার এত কাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে, যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে পারে? তার পর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্ত্তিটি ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্ত্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, তাহা প্রেমহীন ভক্তি-পথে সবেমাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্যই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসায় মতভেদ হইল। কেহ বা আবার মতভেদ প্রকাশে বিদায় আদায়ের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না। আর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্ত্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও তাহার পূজাদি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিকর নূতন মূর্ত্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু পরলোক গমন করিলে, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ, কখন কখন ঐ নূতন মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৺গোবিন্দজীর নূতন মূর্ত্তিটি এখনও সেই ভাবেই রাখা আছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

[শ্রীম— কথিত।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে, জন্মোৎসবদিবসে, বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

25th May, 1884.

[পঞ্চবটীমূলে ভক্তসঙ্গে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটী ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুনমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিন্তু তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এতদিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী কীর্ত্তনী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনী।

আজ রবিবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদ।

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই। অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথা? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ কেমন দু'জনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে দ্বাদশাধিক

বৎসর হইল রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—'বাঁদুরে ছানার ভাব! পড়লে ছাড়ে না।'

সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুমি উপরে এসো না। এমন টা (অর্থাৎ পা মেলা) বেশ হবে।'

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন—কি হে বিলাতে যাবে না কি?

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে!

ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শম্ভু এক দিন বল্‌ছে, 'ওহে তুমি তাই লেংটো হয়ে বেড়াও!—বেশ আরাম!—আমি এক দিন দেখলাম।'

সুরেন্দ্র। আপীষ থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ!

[সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-অভিমান, সঙ্কোচ,—এই সব।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান— আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা,
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা)।
ইত্যাদি।

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশাবায়ুভরে উড়ে বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
ইত্যাদি।

"মায়া দড়ি কি না মাগ ছেলে। 'বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি'। বিষয়—কামিনীকাঞ্চন।

গান—ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙ্গার দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জাছক্কায় বদ্ধ হলাম।

ছ' দুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমরা বশ,
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল !

"পঞ্জুড়ী অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া।

"ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব"*। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে।

"তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে। সত্ত্ব গুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারে না।

বিজয় (সহাস্যে)। সত্ত্বও চোর কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ। বাঃ!—কি চমৎকার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এ খুব উচু কথা।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধনের কারণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

[কামিনীকাঞ্চন আবরণ। 'মাগসুখত্যাগ জগৎসুখত্যাগ'।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—"আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ?—এই আবরণ! এই আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ!

"দ্যাখো না,—যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে'ত জগৎসুখ ত্যাগ করেছে! ঈশ্বর তার অতি নিকট।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী'।]

ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে!—এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ!

* একথাগুলি গানের একটী চরণে আছে, সেটি পাওয়া গেল না।

তোমাদের ত এত বড় বড় গোঁফ—তবু তোমরা ঐ-তেই রয়েছ!—বল!—মনে মনে বিবেচনা করে দেখ!—

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—

"সকলকেই দেখি মেয়ে মানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম;—তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে। সে মাগ-ও তেম্নি—'ক্যা হুয়া,' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে, যে ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাস্য।)

"টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়,—'আমি দু'টো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম্ম, কিন্তু করে দিচ্ছে না। এক জন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।

[স্ত্রীলোক ও 'কলমবাড়া রাস্তা।']

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন বোধ হলো, যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পর দেখি যে চারতোলার নীচে এসেছি! কলমবাড়া (sloping) রাস্তা!

"যাকে ভূতে পায়, সে জান্‌তে পারে না আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে, আমি বেশ আছি।

বিজয় (সহাস্যে)। রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কথার বেশী উত্তর দিলেন না; কেবল বলিলেন যে, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়! (সকলের হাস্য)।

"যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবা বোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে।

"স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন,—'হে রাম, তোমার অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারূপিণী সীতা—তাঁর অংশে—যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না—কেবল এই কোরো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!'

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছে। গিরীন্দ্র আফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)। তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। ছাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে।—এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা;—কখনও এখানে এলি,—দুই দিন থাক্‌লি।'

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাক্‌বে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাক্‌বে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটী ভাল হয়,—আর যারা শুনে তাদেরও আহ্লাদ হয়।

"ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ কর্‌বে।

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস্। সাপের ন্যাজ্ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন! গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন—'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আস্‌তে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাহিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গত কল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি)। হ্যাঁগা, ছাতিটা এনেছ?

গোপাল। আজ্ঞা, না, গান শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে গেছি।

ছাতিটী পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে;—গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। আমি যে এত এলো মেলো তবু অত-দূর নয়!

"রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১১ই!

"আর গোপাল—গরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

"সেই যে স্যাক্‌রাদের গল্পে আছে—এক জন বল্‌ছে 'কেশব,' এক জন বল্‌ছে 'গোপাল', এক জন বল্‌ছে 'হরি', এক জন বল্‌ছে 'হর'! সেই গোপা-লের মানে গরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন—'কানু কোথায়?'

[ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে।]

কীর্ত্তনী গৌরসন্ন্যাস গাইতেছেন—ও মাঝে মাঝে আঁখর দিতেছেন—

(নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম!)
(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে) (নারী হেরিবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন! ভবনাথ, রাখাল, ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য; বিজয়, কেদার, রাম, মাষ্টার, মনমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনামমহোৎসব করিতেছেন!

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সচ্চিদানন্দ!—কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি!—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই তুমি!—মন, বুদ্ধি, সবই তুমি!—গুরুর প্রণামে আছে—

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"তুমিই অখণ্ড—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়!

"প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন,—বাবু, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ?

বিজয় (বিনীতভাবে)। আজ্ঞা, না।

কীর্ত্তনী আবার গাহিতেছেন—'আঁধল প্রেম!' কীর্ত্তনী যাই আঁখর দিলেন—'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে!' ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!—ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটী রহিয়াছে!

কিঞ্চিৎ বাহ্য হইলে কীর্ত্তনী আবার আঁখর দিতেছেন—'যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে, তার কি এতো দুঃখ?'

ঠাকুর কীর্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্ত্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)। প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেবের—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে; আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন।

গান—হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে।
(সে দিন কবে বা হবে)
(অঙ্গে পুলক হবে) (সংসারবাসনা যাবে)
(আমার দুর্দিন ঘুচে সুদিন হবে) (কবে হরির দয়া হবে)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় আছেন। কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন—

'হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্, সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

ঠাকুরের ক্রমে ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন ও

শ্রীভগবানের নাম করিতেছেন—ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া!—ভাগবতভক্ত ভগবান্!

যে স্থলে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইয়াছিল, সেই স্থানের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।

[সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা।]

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন—'হা কৃষ্ণ চৈতন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল!

ভবনাথ। তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! কি ভাব!

এই বলিয়া গান ধরিলেন।

গান—প্রেমধন বিলায় গোরারায়!
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ গৌর ডাকে আয়!
(ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। বেশ বলেছে কীর্ত্তনে,—'সন্ন্যাসী নারী হেরবে না' এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কি ভাব!

বিজয়। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখ্‌বে—তাই অত কঠিন নিয়ম! সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না!—এমনি কঠিন নিয়ম!

"কালো পাঁটা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা থাক্‌লে হয় না। রমণীসঙ্গ তো করবে না—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত কর্‌বে না।

বিজয়। ছোটহরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ কর্‌লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য।

"মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে; তা লতে পারলাম না।

"সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ কর্‌তে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই!—যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

"এক জন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে 'উঁহুঃ' করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও'। যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

"কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন।—তাই লোক-শিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (কেশব)—বুঝেচো?

বিজয়। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিক্ ওদিক্ দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পার্‌লেন না।

বিজয়। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার কত্তে চাইবে।—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে চেষ্টা কর্‌বে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ কর্‌লেন।

"সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্‌বে।

"আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখ্‌বে না। ত্যাগী—সন্ন্যাসী—জগৎ গুরু!—তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই!'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]

গত রাত্রে শিষ্য স্বামীজির ঘরে ঘুমাইয়াছে। রত্রি ৪টার সময় স্বামীজি শিষ্যকে জাগাইয়াছেন, আর বলিতেছেন—যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু ব্রহ্মচারী-দের জাগাইয়া তোল্। শিষ্য ঘুমন্ত চোকে প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইতেছে। তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন। তার পর নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু ব্রহ্মচারীদের তুলিয়াছে। সাধুরা তাড়াতাড়ি করিয়া শৌচাদি সারিয়া,কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া, ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে প্রবেশ করিতেছেন।

রাখাল মহারাজের কাণের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজানয় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন "বাঙ্গালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হ'লো।" শিষ্য স্বামীজিকে ঐ কথা বলায় স্বামীজি হাসিয়া অস্থির হইতেছেন। বলিতেছেন "বেশ করেছিস্"।

স্বামীজিও শৌচ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরে শিষ্যসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার সেই আনন্দিত দেবমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া এখনো অলক্ষিতে শিষ্যের অশ্রুপাত হয়।

স্বামীজির জন্য পৃথক্ আসন রাখা হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসি-গণ ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামীজি উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়াছেন। শিষ্যকে বলিতেছেন "যা ঐ আসনে ব'সে ধ্যান কর্"। শিষ্য স্বামীজির সম্মুখে বসিয়াছে। সকলেই ধ্যানে বসিয়া কেহ মন্ত্রজপ, কেহ বা অন্তর্যোগমুখে শান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সে দৃশ্যের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনো আকাশে তারা জ্বলিতেছে। অরুণোদয় হয়নি। স্বামীজি আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছেন। যেন সুমেরুবৎ অচল। ধিকি ধিকি শ্বাস বহিতেছে। শিষ্যের মন ধ্যানে নাই। সে কেবল স্বামীজির রূপসুধা পান করিয়া নির্নিমিষে অবস্থান করিতেছে। যতক্ষণ না স্বামীজি উঠিবেন, ততক্ষণ কাহারই আসন ছাড়িয়া উঠিবার আদেশ নাই। শিষ্যের পায়ে ঝিন্ ঝিনি ধরায় উঠিবার সাধ হইতেছে। কিন্তু উঠিবার আদেশ না থাকায় মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে।

স্বামীজি একেবারে ধ্যানস্থ। শিষ্য দেখিতেছে—ঠিক বুদ্ধদেব যেন নির্ব্বাণকল্পভাবে সাম্‌নে অবস্থান করিতেছেন। বদ্ধ পদ্মহস্তদ্বয় স্বামীজির নাভিকমলে শোভা পাইতেছে। শিষ্য মধ্যে মধ্যে সমাসীন স্বামীজির রূপ হৃদ্‌কমলে ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ধ্যানে আবার ঐরূপ না দেখায় চোক্ মেলিয়া স্বামীজির অনিন্দিত রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে। এক ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। তবু স্বামীজির ধ্যান ভাঙ্গে না। রাখাল মহারাজেরও চক্ষু মুদ্রিত। মুখে যেন অমল ধবল চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামীজি "শিব শিব" বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইয়াছেন। স্বামীজির চক্ষু অরুণ-রাগে রঞ্জিত। মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীজি নীচে নামিতেছেন, শিষ্যও পশ্চাতে পশ্চাতে নামিতেছেন। শিষ্যের মুখে কোন কথা নাই—স্বামীজির এই প্রশান্ত ভাব দর্শন করিয়া। নীচে নামিয়া স্বামীজি মঠ-প্রাঙ্গণে পাইচালি করিয়া বেড়াইতেছেন। শিষ্যকে বলিতেছেন—'দেখ্ দেখি, এখানে সাধুরা কেমন জপ ধ্যান করেন ; তোর কেমন ধ্যান হলো?'

শিষ্য—মশায়, আপনি সাম্‌নে বসে ছিলেন। আমি বার বার কেবল আপনার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখ্‌ছিলুম। আমার ঐটী দেখ্‌তে বড় ভাল লাগ্‌ছিল।

স্বামীজি—বরাহনগরের মঠে ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দর্শন হয়েছিল। একটু চেষ্টা করলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার পর সুষুম্নার দর্শন পেলে কত কি দেখতে পাবি। যা দেখতে চাইবি, তাই দেখতে পাবি।

শিষ্য—মশায়, আমি অত শত দেখার সাধ রাখিনা। আপনার মূর্ত্তি যথা তথা দেখ্‌তে পেলেই আমার ধ্যান সার্থক জান্‌ব।

স্বামীজি গম্ভীর হয়ে বল্‌ছেন—তা গুরুভক্তি থাক্‌লে তার আর সাধন ভজনের প্রয়োজন নাই। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ।"

শিষ্য স্বামীজির জন্য তামাক আন্‌তে গিয়েছে। রাখাল মহারাজ বলছেন—"আহা, নরেনের সঙ্গে ধ্যানে বস্‌লে যেন তখনি ডুবে যেতে হয়। এমনটী আমার একলা হয় না।"

শিষ্য তামাক সেজে স্বামীজির কাছে এসেছে। স্বামীজি আস্তে আস্তে ধূম পান কর্ত্তে কর্ত্তে বল্‌ছেন—'ভেতরে সিঙ্গি রয়েছেন ; ঐটেকে জাগাতে হয়—ধ্যান ধারণা ক'রে। তিনি যখন জেগে উঠেন, তখন দুনিয়া উড়ে

যায়। সবার ভেতরেই সমভাবে তিনি আছেন, তা যে যত সাধন ভজন করছে তার ভেতর সেই কুণ্ডলিনী শক্তি ততই নাড়াচাড়া দিয়ে উঠ্ছেন। সে শক্তি যতই উপরে উঠবেন, ততই দৃষ্টি খুলে যায়। বুঝলি ?

শিষ্য—মশায়, শাস্ত্রে এ সব পড়েছি মাত্র। কিছুই ত প্রত্যক্ষ হলো না।

স্বামীজি—'কালেনাত্মনি বিন্দতি' সময়ে হতেই হবে। তবে কারো শিগ্গীর, কারো বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্তে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নামই যথার্থ পুরুষকার। বুঝলি ?

শিষ্য—মশায় আমি অত শত বুঝি না। আমায় কিছু করে কয়ে দিতে হয় দিন্, নতুবা নিজ চেষ্টায় কিছু হবে বলে আশা নাই।

স্বামীজি—তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। তা জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কি না, ধ্যানের সময়ও ঐরূপ মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রথম প্রথম হয়। তা মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন ? কি কি ভাব উঠছে, ঐগুলি স্থির হয়ে প্রথম প্রথম দেখ্তে হয়। দেখে দেখে তার পর মন স্থির হয়ে যায়, তখন আর মনের তরঙ্গ থাকে না। তরঙ্গ মানে কি—না মনের সংকল্পবৃত্তি। আগে আগে যে গুলি তীব্রভাবে ভেবেছিস্ তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, তাই ধ্যানকালে ঐগুলি মনে উঠে। তোর মন যে স্থির হতে যাচ্ছে, ঐগুলি তার প্রমাণ। তা মন কখনো বা কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়—এর নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে—তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যে মন গলে যায়। এর নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর সাধন ভজন করে ঐ অবস্থা আন্তে হতো না। তখনি তখনি হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁকে দেখেই ত এসব ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পেরেছিলুম। নতুবা কি যে হয়ে যেতুম, কে জানে ?

শিষ্য—মশায়, এসব না দেখ্লে কি আর ঠিক্ ঠিক্ বিশ্বাস হয়—না শাস্ত্র-বাক্যে তেমন শ্রদ্ধা হয় ? আমাকে কৃপা করে একটু প্রত্যক্ষ করিয়ে দিন্। দিন দিন যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্ছে।

স্বামীজি—প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন কি না ? তাই সব জান্তে দিচ্ছে না। ধ্যান করবার পূর্ব্বে যখন নাড়ীশুদ্ধি করবি, তখন মনে মনে

কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত কর্‌বি, আর বল্‌বি "জাগমা" "জাগমা"। ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস কত্তে হয়। Emotional sideটে (ভাব প্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের বড় ভয়। যারা বড় emotional, (ভাবপ্রবণ) তাদের কুণ্ডলিনী ফড়্ ফড়্ করে উপরে উঠে বটে, কিন্তু উঠ্‌তেও যতক্ষণ, নাব্‌তেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃ-পাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ওসব কীর্ত্তন ফির্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে—কিন্তু স্থায়ী হয় না—আবার নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার এমেরিকায় বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে মাগী মিন্‌সেগুলোর মধ্যে অনেকের ভাব হ'তো—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেতো। আমি অনুসন্ধানে পরে জান্‌তুম্, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কামপ্রবৃত্তির আধিক্য হ'ত। তখন মনে হতো, স্থির ধ্যান ধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়। তাদের দোষ কি বল্? যারা জিজ্ঞাসু হবে, তাদের এগুলি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিয়ে দিবি—এতে জীবের কল্যাণ হবে।

শিষ্য—মশায়, এ সকল গুহ্য কথা ত কোন শাস্ত্রে পড়িনি। সব নূতন শুন্‌লুম।

স্বামীজি—সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে—এগুলি গুরুশিষ্য-পরম্পরায়—গুপ্তভাবে চলে আস্‌ছে।

শিষ্য—মশায় এত সাধনরহস্য যে আছে, তা মঠের ত কেউ বলেনি।

স্বামীজি—তা বল্‌বে কেন? তুই আমার শিষ্য, তাই বল্‌লুম। ওদের শিষ্যদের ওরা সব বলে দেয়। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—হাঁ মশায়, আমিও ঢাকায় থাক্‌বার কালে কীর্ত্তনে খুব নাচ্‌তুম। তার পর আমারও—যা বল্লেন, ওরূপ হতো। এখন তার রহস্য বুঝ্‌তে পারলুম।

স্বামীজি—খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা কর্‌বি। সাম্‌নে সুগন্ধি ফুল রাখ্‌বি, ধূনা জাল্‌বি। যাতে মন্ পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই কর্‌বি। গুরু ইষ্টের নাম কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বি—জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হোক্! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অধঃ উর্দ্ধ সবদিকে এই শুভ সংকল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বস্‌বি। এইরূপ প্রথম্ প্রথম্ কত্তে হয়।

শিষ্য—তার পর?

স্বামীজি—তার পর স্থির হয়ে বসে (যে কোন মুখে বস্‌লেই হলো) মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরূপ ধ্যান কর্‌বি। একদিনও বাদ দিবিনি। কার্য্যের ঝঞ্ঝাট থাকে ত অন্ততঃ ১৫ মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাক্‌লে কি হয় রে বাপ্?

বলিতে বলিতে স্বামীজি উপরে যাইতেছেন আর বল্‌ছেন—অতশত জেনে আর কি হবে। তুই ত পণ্ডিত, তোকে আর কি বল্‌ব? তোর প্রাগ্‌জন্মসংস্কারেই তোকে এবার পারে পৌঁছে দিবে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি :

শিষ্য স্থির হয়ে শুন্‌ছে আর ভাবছে, তবে কি স্বামীজি আমার জন্ম-জন্মান্তরের খবর রাখেন? নতুবা একথা কি করে বল্‌ছেন?

স্বামীজি বল্‌ছেন—দেখ্, কঠোর সাধনা করে করে এ দেহ পাত করে ফেলেছি। এই হাড় মাসের খাঁচায় আর যেন কিছু নাই। তোরা এখন কিছু কাযে লেগে যা, আমি একটু জিরুই। যখন হেথায় এসে পড়েছিস্, তখন আমার কার্য্য কিছু করে যা, এই সব ভাব ছড়িয়ে দে। জীবের, জগতের কল্যাণ হবে। মুক্তি ভুক্তি ত তোদের করতলে, এখন ওসব রেখে দিয়ে এই আর্ত্তনাদপূর্ণ সংসারের কিছু দুঃখু দূর কত্তে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা। বলি, আর কিছু না পারিস্ ত এই সব যে এত শাস্ত্র মান্ত্র পড়্‌লি, এর কথা জীবকে শুনাগে। এর চেয়ে আর দান নাই। জ্ঞানদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বলিতে বলিতে স্বামীজি শৌচগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, শিষ্যও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে।

ভক্তিরহস্য।

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

সপ্তম অধ্যায়।

গৌণী ও পরাভক্তি।

দু একটী ছাড়া প্রায় সকল ধর্ম্মেই ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্ম্মই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকে আর সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে

সঙ্গে ভক্তি উপাসনাদি ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যে ভাবে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারাও ঠিক সেই ভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের পূজা করিয়া থাকে। এই ভক্তি-উপাসনার ভাব—যাহাতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর পুরুষবিশেষকে ভালবাসিতে হয় এবং যিনি আবার আমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন—সার্ব্বজনীন। বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের সর্ব্বনিম্ন স্তর বা সোপান বাহ্য অনুষ্ঠানাত্মক—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্মধারণা একরূপ অসম্ভব—সুতরাং তখন সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থূল আকারে পরিণত করা হয়। ঐ অবস্থায় নানাবিধ অনুষ্ঠান ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি আসিয়া থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক আকৃতিবিশেষের সহায়তায় সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান—এ সবগুলিই ঐ পর্য্যায়ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বস্তু মানুষকে সূক্ষ্মের স্থূল আকার দিবার সহায়তা করে, তাহাই লইয়া উপাসনা করা হয়।

গৌণীভক্তি—স্থূলসহায়ে সূক্ষ্মধারণার চেষ্টা।

সময়ে সময়ে সকল ধর্ম্মেই সংস্কারকগণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই, কারণ,মানুষ যতদিন বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্থূল বস্তু চাহিবে, যাহা তাহাদের ভাবরাশির আধারস্বরূপ হইতে পারে, এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরস্থ ভাবময়ী মূর্ত্তিগুলির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। মুসলমান ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টেরা সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রবল চেষ্টাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রবেশলাভ করিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে উহাদের প্রবেশ নিবারণ অসম্ভব ব্যাপার। অনেকদিন এইরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সাধারণে একটী প্রতীকের পরি-

সংস্কারকগণের মূর্ত্তিপূজা একেবারে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়াছে ও হইবে।

বর্ত্তে অপর একটী প্রতীক গ্রহণ করে মাত্র। মুসলমানেরা মুসলমানেতর অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, প্রতিমাদিকে পাপজনক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কাবাস্থ তাঁহাদের নিজেদের মন্দিরের সম্বন্ধে একথা তাঁহাদের মনে হয় না। প্রত্যেক ধার্ম্মিক মুসলমানকে নেমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি কাবার মন্দিরে রহিয়াছেন, আর তথায় তীর্থ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ঐ মন্দিরের দেয়ালস্থিত কৃষ্ণপ্রস্তর-বিশেষকে চুম্বন করিতে হয়। উঁহাদের বিশ্বাস—লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রিকৃত ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরে মুদ্রিত চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ বিচার-দিনে সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত হইবে। তার পর আবার জিমজিম কূপ রহি-য়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কূপ হইতে যে কোন ব্যক্তি অল্প একটু জল উত্তোলন করিবেন, তাঁহারই পাপ ক্ষমা হইবে এবং তিনি পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া অমর হইয়া থাকিবেন।

অন্যান্য ধর্ম্মে আবার গৃহরূপ প্রতীকের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা চার্চ্চ অধিকতর পবিত্র। এই চার্চ্চ একটী প্রতীকমাত্র। অথবা শাস্ত্রগ্রন্থ। খ্রীষ্টিয়ানগণের ধারণায় অন্যান্য প্রতীকাপেক্ষা শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক। ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্ত্তি পূজা করেন, প্রোটেষ্ট্যাণ্টেরা তদ্রূপ ক্রুশকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা আর কেনই বা আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব? মানুষ প্রতীকোপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার ত কোন যুক্তি নাই। উহাদের অন্তরালস্থ, উহাদের উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিস্বরূপে লোকে ঐগুলির ব্যবহার করিয়া থাকে। সমগ্র জগৎটীই একটী প্রতীকস্বরূপ—উহার মধ্য দিয়া—উহার সহায়তায়—উহার বহির্দ্দেশে, উহার অন্তরালে অব-স্থিত, উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা আমরা করিতেছি। মানুষের প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এইরূপে জগতের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যদিও আমরা জড়জগৎকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারি না, তথাপি ইহাও সত্য যে, আমরা জড়জগৎ ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে—জড়জগৎ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে লক্ষ্যীকৃত করিতেছে তাহাকে—লাভ করিবার জন্যই সদা

বাহ্য অনুষ্ঠান, প্রতীকোপাসনাদি প্রথমাবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় হইলেও উহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে।

সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য জড় নহে, চৈতন্য। ঘণ্টা, প্রদীপ, মূর্ত্তি, শাস্ত্রাদি, চার্চ্চ, মন্দির, অনুষ্ঠানাদি এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতীক-সমূহ খুব ভাল বটে, ধর্ম্মরূপ ক্রমবর্দ্ধমান লতিকার বৃদ্ধির পক্ষে খুব সাহায্য-কারী বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, উহার অধিক উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ স্থলে আমরা দেখিতে পাই, উহার আর বৃদ্ধি হয় না। একটা চার্চ্চের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু ঐ চার্চ্চের ভিতর থাকিয়াই মরা ভাল নয়। এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত, ঐগুলি দ্বারা ধর্ম্মরূপ ক্ষুদ্র লতিকাটীর বৃদ্ধির সাহায্য হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল অনুষ্ঠানপ্রণালীর ভিতর থাকিয়াই মরিয়া যায়, তাহাতে বুঝায়, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার বিকাশ মোটেই হয় নাই।

অতএব যদি কেহ বলে, এই সকল প্রতীক, অনুষ্ঠানাদি চিরকালের জন্য, তবে সে লান্ত ; কিন্তু যদি কেহ বলে, ঐগুলি আত্মার অনুন্নত অবস্থায় উহার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। এখানে আমি আর এক কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে যেন আপনারা মানসিক উন্নতি বা বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তি একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়ত শিশুমাত্র অথবা তদ-পেক্ষাও অধম। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রভেদ - আমরা সকলেই পৌত্তলিক।

আপনাদের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। উহা ভাবিবার চেষ্টা করুন দেখি। সর্ব্বব্যাপী বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে ক'জন ইহার কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়ত সমুদ্র বা আকাশ বা মরুভূমি বা একটা সুবৃহৎ হরিদ্বর্ণ প্রান্তরের ভাব মনে আনিতে পারেন। এই সমুদয়গুলিই জড়পদার্থ আর যত দিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই সকল জড়বস্তুর সহায়তা আপনাদিগকে লই-তেই হইবে। ঐ জড় মূর্ত্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরে অথবা মনের বাহিরে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলেই পৌত্ত-লিক হইয়া জন্মিয়াছি আর পৌত্তলিকতা অন্যায় নহে, কারণ, উহা মানবের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত

পুরুষেরাই পারেন। অবশিষ্ট সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আমরা জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুত্তলের অর্চ্চনা করিতেছি। যাহার আপনাকে দেহ বলিয়া বোধ আছে, সে ত পৌত্তলিক হইয়াই জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মাস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ—আমরা কখনই জড় নহি। অতএব যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম ধারণায় অক্ষম, যে ব্যক্তি নিজেকে জড় না ভাবিয়া, দেহস্বরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, সে ব্যক্তি নিজ স্বরূপ চিন্তায় অসমর্থ, সে পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন লোকে পরস্পর পরস্পরকে পৌত্তলিক বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাস্যকে ঠিক মনে করে, কিন্তু অপরের উপাস্য তাহাদের মতে ঠিক নয়।

অতএব আমাদিগকে এই সকল শিশুজনোচিত ধারণা, অজ্ঞজনোচিত এই সকল বৃথা বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম্ম কতকগুলি বাজে কথার সমষ্টিমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম তাহাদের পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশ্বাসমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কয়েকটা বিশ্বাসসমষ্টিমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কার-সমষ্টি—সেগুলি তাহাদের জাতীয় কুসংস্কার বলিয়াই তাহারা সেইগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই সব ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে—সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড শরীরী—ধীরে ধীরে আলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—উহা যেন এক অদ্ভুত উদ্ভিদ্‌স্বরূপ—ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া ঈশ্বরনামক সেই অদ্ভুত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি সর্ব্বদাই জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার যো নাই।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম আর উহার প্রথম সোপান—অনুষ্ঠান।

নামোপাসনাই এই সমুদয় অনুষ্ঠানের হৃদয়স্বরূপ এবং অন্যান্য সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম ও জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উহাদের সকলের ভিতরই এই নামোপাসনা প্রচলিত। নাম অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

নামোপাসনা—উহার তাৎপর্য্য।

বাইবেলেই পড়া যায়, ভগবানের নাম এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, কিছুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। উহা সমুদয় নাম হইতে পবিত্রতম আর তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহা সত্য। এই জগৎ নামরূপ বই আর কি? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। যখনই আপনারা চিন্তা করেন, তখনই শব্দ অবলম্বনে চিন্তা করিতে হয়। একটী আর একটীকে লইয়া আসে। ভাব থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাহ্য প্রতীকস্বরূপ, তৎপশ্চাতে ভগবানের মহান্ নাম রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যষ্টি দেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে। যখনি আপনি আপনার বন্ধুবিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা আপনার মনে উদয় হয়, আর ঐ দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানবের চিত্তের মধ্যে রূপজ্ঞান ব্যতীত নামজ্ঞান আসিতে পারে না; এবং নামজ্ঞান ব্যতীত রূপজ্ঞান আসিতে পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহির পিট ও ভিতর পিট। এই কারণে সমগ্র জগতে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নামমাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্ম্মে অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধুর পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন? আলোকপরমাণুর স্পন্দন সর্ব্বত্র রহিয়াছে। পেচক উহা অন্ধকারে দেখিতে পায়। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, উহা অন্ধকারেও রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ অন্ধকারে দেখিতে পায় না। মানুষের পক্ষে ঐ আলোকপরমাণুর স্পন্দন কেবল প্রদীপ, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরই প্রকাশ। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য, মানুষেরই ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন, কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে

অবতার ও সাধুর পূজা—উহার স্বাভাবিকতা।

মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, আর যতদিন সে মানব থাকিবে, ততদিন করিবে। সে উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, উহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারে, ভগবান্‌কে মানুষ বলিয়া চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটী সোপান দেখিতে পাই ;—প্রতীক বা মূর্ত্তি, নাম ও অবতারোপাসনা। সকল ধর্ম্মেই

বিভিন্ন ধর্ম্মে বিরোধ—উদারভাব আসিবার অন্যতম উপায় - বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা।

এইগুলি আছে, কিন্তু দেখিতে পাইবে, লোকে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতে চায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমি যে নাম সাধনা করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম, আমি যে রূপের উপাসক, তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ, আমি যে সব অবতার মানি, তাঁহারাই ঠিক ঠিক অবতার, তুমি যে সব অবতারের কথা বল, সে গুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্ত্তমান কালের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সদয়-হৃদয় হইয়াছেন—তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্ম্মসমূহে যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, সেগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মেরই পূর্ব্বাভাষমাত্র। অবশ্য তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। প্রাচীন কালে ভগবান্ যে এই সব বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ শক্তির পরীক্ষাস্বরূপমাত্র। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের সৃজন করিয়া তিনি নিজ শক্তির পরীক্ষা করিতেছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্ম্মে উহাদের চরম উন্নতি দাড়াইল। অবশ্য, এ ভাব অন্ততঃ পূর্ব্বেকার গোঁড়ামীর চেয়ে অনেকটা ভাল স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা ইহাও স্বীকার করিত না, তাহাদের নিজ ধর্ম্ম ছাড়া তাহারা আর কিছুর বিন্দুমাত্র সত্যতাও মানিত না। এ ভাব ধর্ম্ম, জাতি বা শ্রেণী-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। লোকে সর্ব্বদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে আর এই খানেই বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনায় আমাদের সাহায্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে ভাবগুলিকে আমাদের নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্ব্বে অপরের ভিতর বর্ত্তমান ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমরা যে ভাবে উহা ব্যক্ত করিয়া থাকি, তদপেক্ষা সুপরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত ছিল।

মানুষকে ভক্তির এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু যদি সে প্রকৃতপক্ষে অপকট হয়, যদি সে যথার্থ সত্যে পৌঁছিতে চায়, তবে সে এমন এক ভূমিতে ক্রমশঃ উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম্মমন্দির, শাস্ত্রাদি অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্ম্মের শিশুশিক্ষামাত্র, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সতেজ হইয়া সে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে; আর যদি কাহারও ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে এই প্রথম সোপান-গুলি অবলম্বন করিতেই হইবে। যখনই ভগবানের জন্য পিপাসা হয়, যখনই লোকে ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে প্রার্থনা করে, তখনই তাহার যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হয়। কে তাঁহাকে চায়? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম্ম মতমতান্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম হচ্ছে হওয়া—ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাই, দুনিয়ার সকলেই জীবাত্মা পরমাত্মা এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা কয়, কিন্তু তাহাদের এক এক জনকে ধরিয়া যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছ, তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ, কয়জন লোক বলিতে পারে যে তাহারা তাহা করি-য়াছে? এক সময়ে ভারতের কোন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আসিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা, অপর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, তর্কের আর বিরাম কিছুতেই হয় না। সেই স্থান দিয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাইতেছিলেন, তাহারা তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসার্থ আহ্বান করিল। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শিবকে দেখিয়াছেন? আপনার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে? যদি তাহা না থাকে, তবে আপনি কিরূপে জানিলেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা? তার পর তিনি বৈষ্ণবদিগকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন—আপনারা কি বিষ্ণুকে দেখিয়া-ছেন? সকলকে ঐ প্রশ্ন করিলে জানিতে পারা গেল, ভগবৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই জানে না আর তাই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল। কারণ যদি তাহারা সত্য সত্য ভগবান্‌কে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী জলে ডুবাইলে তাহাতে ভক্ ভক্ শব্দ করিতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতি-স্বরূপ—ইহার অভাবেই লোকে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে।

ভিতর এই যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যাইতেছে, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উহারা ধর্ম্মের 'ধ'ও জানে না। ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে কেবল কতকগুলি বাজে কথামাত্র—বইএ লিখিবার জন্য। সকলেই একএকখানা বড় বই লিখিতে ব্যস্ত—তাহাদের ইচ্ছা—উহার কলেবর যতদূর সম্ভব বড় হউক; তাহারা যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে থাকে—অথচ কাহারও নিকট নিজ ঋণ স্বীকার করে না। তার পর তাহারা জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হয়—আর পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান সহস্র সহস্র বিরোধের ভিতর আর একটী বিরোধের সৃষ্টি করে।

যে ভগবানকে চায়, সেই তাঁহাকে পাইয়া থাকে।

জগতের অধিকাংশ লোকেই নাস্তিক। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিক অর্থাৎ জড়বাদী দলের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত, কারণ, ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্ম্মবাদী নাস্তিক হইতে শ্রেষ্ঠ, এই শেষোক্ত নাস্তিকেরা ধর্ম্মের কথা কয়, ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু ধর্ম্ম কখন চায় না, কখন ধর্ম্ম বুঝিবার, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিবার চেষ্টা করে না। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাক্যাবলি স্মরণ রাখিবেন—"চাও, তবেই তোমাকে দেওয়া হইবে; অনুসন্ধান কর—পাইবে; দ্বারে করাঘাত কর, খুলিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথাগুলি উপন্যাস, রূপক বা কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। উহারা—জগতের মধ্যে যে সকল ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের উচ্ছ্বাসস্বরূপ—ঐ কথাগুলি পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় নহে, উহারা প্রত্যক্ষানুভূতির ফলস্বরূপ—ঐগুলি এমন এক লোকের কথা যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, যিনি ভগবানের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত সহবাস করিয়াছিলেন—আপনি আমি এই বাড়ীটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যিনি তাহা অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বলভাবে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্‌কে চায় কে?—ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, দুনিয়াশুদ্ধ লোক ভগবান্‌কে চাহিয়াও পাইতেছে না? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানবের এমন কি অভাব আছে, যে অভাবের পূরণোপযোগী বস্তু বাহিরে নাই? মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন তাহার

জন্য বায়ু রহিয়াছে। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন—আহার্য্য বস্তু রহিয়াছে। এই সব বাসনার উৎপত্তি হয় কোথা হইতে? বাহ্য বস্তু আছে বলিয়া। আলোকের সত্তা থাকাতেই চক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, শব্দের সত্তা থাকাতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ, মানুষের মধ্যে যে কোন বাসনা আছে, তাহাই পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই যে পূর্ণত্ব লাভের, সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা—যদি পূর্ণস্বরূপ কোন পুরুষ উহা আমাদের ভিতর প্রবেশ না করাইয়া দিয়া থাকেন, তবে কোথা হইতে উহার উৎপত্তি হইল? অতএব ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যাঁহার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে, তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবেন। কিন্তু কথা এই যে, কাহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে? আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব জিনিষই চাহিয়া থাকি। আপনারা সমাজে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা দেখিতে পান, তাহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যায় না। আমাদের গিন্নির সমগ্র জগৎ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে—কিন্তু এখনকার ফ্যাসান—জাপানী কোন জিনিষ ঘরে রাখা—তাই তিনি একটা জাপানী জিনিষ কিনিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্ম্ম এইরূপ। তাহাদের ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রকার বস্তু রহিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না দিলে জীবনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা হইয়া যায়। কারণ, তাহা হইলে সমাজে নানা অকথা কুকথা বলে। সমাজ তাহাদের নিকট উহার আশা করিয়া থাকে—সেই জন্যই নরনারীগণ একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। সমগ্র জগতে আজকাল ধর্ম্মের এই অবস্থা।

গুরুশিষ্য-সংবাদ—ভগবানের জন্য প্রাণ যায় যায় হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এক সময়ে জনৈক শিষ্য তাহার গুরুর নিকট গিয়া বলিল—"প্রভো, আমি ধর্ম্মলাভ করিতে চাই।" গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা বলিলেন না—কেবল একটু হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিল—"আমাকে ধর্ম্ম লাভের উপায় বলিয়া দিতে হইবে।" গুরু অবশ্য কিসে কি হয়, শিষ্যাপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গ্রীষ্মের সময় তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। যুবক জলে ডুব দিবা মাত্র গুরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে চাপিয়া জলের নীচে ধরিয়া রাখিলেন। যুবক জল হইতে

উঠিবার জন্য অনেক ধস্তাধস্তি করিবার পর গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্ব্বাপেক্ষা কিসের অধিক অভাব বোধ হইয়াছিল ?" শিষ্য উত্তর করিল- "হাওয়ার অভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল।" তখন গুরু উত্তর দিলেন."ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরূপ অভাব বোধ হইয়াছে ? যদি তা হইয়া থাকে, তবে এক মুহূর্ত্তেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।" যতদিন না ধর্ম্মের জন্য আপনাদের ঐরূপ তীব্র পিপাসা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই বই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, ততদিন কিছুই হইবে না। যত দিন না হৃদয়ে এই ধর্ম্মপিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক হইতে আপনি কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহেন। নাস্তিকের বরং ভাবের ঘরে চুরি নাই, আপনার আছে।

'চোর ও সোনার তাল' —ঈশ্বরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

জনৈক মহাপুরুষ বলিতেন, 'মনে কর, এ ঘরে একটা চোর রহিয়াছে— সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে যে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একতাল সোনা আছে, আর ঐ দুইটী ঘরের মধ্যে ব্যবধান যে দেওয়াল আছে, তাহা খুব পাতলা ও কম মজবুত। এরূপ অবস্থায় ঐ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে মনে কর? তাহার ঘুম হইবে না, সে যাইতে পারিবে না, বা আর কিছু করিতে পারিবে না। কিরূপে সেই সোনার তাল সংগ্রহ করিবে, তাহার মন সেই দিকে পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে, কিরূপে ঐ দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া সোনার তালটা লইব। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি লোকে যথার্থ বিশ্বাস করিত যে, আনন্দ ও মহিমার খনিস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণ ভাবে সাংসারিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইত ?' যখনই মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভগবান্ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু যখন মানুষ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তদপেক্ষা উচ্চতর ভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে, যখনই সে নিশ্চিত জানিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গুলিই মানবের সর্ব্বস্ব নহে, যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী, নিত্য আনন্দের তুলনায় এই সসীম জড়দেহ কিছুই নহে, তখন

সে যতক্ষণ না নিজে সেই আনন্দ লাভ করিতেছে, ততক্ষণ পাগলের মত উহারই অনুসন্ধান করে, আর এই উন্মত্ততা, এই পিপাসা, এই ঝোঁককেই ধর্ম্মজীবনে 'জাগরণ' বলে, আর যখন মানুষের উহা আসিয়া থাকে, তখনই তাহার ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ইহা হইতে অনেক দিন লাগে। এই সমুদয় অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কলাপ, প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, তীর্থপর্য্যটন, শাস্ত্রাদি পাঠ, কাঁসর ঘণ্টা, প্রদীপ, পুরোহিত—এ সকল ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইবার সহায়ক মাত্র। ঐগুলি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। আর যখনই আত্মা শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহা স্বভাবতঃই উহার মূলকারণস্বরূপ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর, স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। যেমন শত শত যুগের ধূলি আচ্ছাদিত লৌহখণ্ড, চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি উপায়ের দ্বারা ঐ ধূলি অপসারিত করা যায়, তবে আবার উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে; এইরূপ জীবাত্মাও শত শত যুগের অপবিত্রতা, মলিনতা ও পাপরূপ ধূলিজালে আবৃত রহিয়াছে। অনেক জন্ম ধরিয়া এই সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি করিয়া অপরের কল্যাণসাধন করিয়া, অপরকে ভাল বাসিয়া যখন সে বিশেষরূপ পবিত্র হয়, তখন তাহার ভগবানের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সে তখন জাগ্রত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে।

> অনেক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবার পর ভগবানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান প্রতীকোপাসনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের আরম্ভমাত্র বলা যাইতে পারে, উহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমরা প্রেমের কথা সর্ব্বত্র শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবান্‌কে ভাল বাস,—কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা লোকে জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন ওকথা মুখে আনিত না। সকলেই বলিয়া থাকে, তাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অতি শীঘ্রই সে বুঝিতে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। সকল রমণীই বলিয়া থাকে, তাহারা প্রেমসম্পন্না, কিন্তু তাহারাও শীঘ্র দেখিতে পায় যে, তাহারা ভালবাসিতে অক্ষম। এই সংসার ভালবাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহা আপনি কিরূপে জানিবেন? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে,

উহাতে কেনাবেচা নাই। একজন ব্যক্তি যখন অপরকে তাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য ভালবাসে, জানিবেন, সে ভালবাসা নহে, উহা দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনাবেচার কথা, সেখানে প্রেম নাই। অতএব যখন কোন ব্যক্তি ভগবানের নিকট, 'ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, জানিবেন—সে প্রেম নহে। উহা কেমন করিয়া প্রেম হইতে পারে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তব স্তুতি উপহার দিলাম—তুমি তাহার পরিবর্ত্তে আমায় কিছু দাও। এ ত কেবল দোকানদারি মাত্র।

প্রকৃত প্রেম বড় কঠিন। উহার প্রথম লক্ষণ—উহাতে কেনা বেচার ভাব থাকিবে না।

একজন সম্রাট্ একবার বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন—তথায় তাঁহার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি এত সুখী হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে কিছু লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, 'না,আমি আমার অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। এই সব বৃক্ষ আমাকে খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল প্রদান করে, এই রমণীয়া পবিত্রসলিলা স্রোতস্বিনীগণ আমার যত প্রয়োজন জল প্রদান করে। শয়ন করিবার জন্য এই সব গুহা রহিয়াছে। অতএব তুমি রাজাই হও আর সম্রাট্ই হও, তোমার প্রদত্ত উপহার লইয়া আমার কি হইবে?' সম্রাট্ বলিলেন, 'কেবল আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার রাজধানীতে আসুন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু সম্রাটের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে সম্রাটের প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল—তথায় চতুর্দ্দিকে সোনা হীরা মণি মাণিক্য জহরত এবং আরো অনেক অদ্ভুত বস্তুজাত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই ঐশ্বর্য্য বৈভবের চিহ্ন। এই স্থানে সেই অরণ্যবাসী দরিদ্র সাধুকে লইয়া যাওয়া হইল। সম্রাট্ বলিলেন, 'আপনি ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করুন—আমি আমার প্রার্থনাবাক্য আবৃত্তি করিয়া লইতেছি।' এই বলিয়া তিনি গৃহের এক কোণে গিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভো, আমায় আরো অধিক ঐশ্বর্য্য, আরো অধিক সন্তান সন্ততি, আরো অধিক রাজ্য প্রদান করুন।' ইতিমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে চলিয়া যাইতে

সাধু-সম্রাট্-সংবাদ—প্রেম চিরকালই দাতা গ্রহীতা নহে।

দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, কোথা যাইতেছেন? আপনি আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পার? তুমি নিজেই ক্রমাগত ভিক্ষা করিতেছ!' পূর্ব্বোক্ত সম্রাটের প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নহে। যদি ভগবানের নিকট ইহা উহা প্রার্থনা করা চলে, তবে প্রেমে ও দোকানদারিতে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রেমের প্রথম লক্ষণই এই যে, উহাতে কোনরূপ কেনাবেচা নাই—প্রেম সর্ব্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা কোন কালেই নহে। ভগবানের সন্তান বলেন, 'যদি ভগবান্ চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না, এই জগতের কোন জিনিষই আমি চাহি না। তাঁহাকে ভাল-বাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহি না। কে জানিতে চায়—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না—কারণ, আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাহি না এবং তাঁহার কোনরূপ শক্তির বিকাশও দেখিতে চাহি না। তিনি প্রেমের ভগবান্—ইহা জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাহি না।

ক্রমশঃ।

বহুরূপী।

কে তুমি কোথায় তব স্থান,
মন তুমি না জানি কেমন!
কাম আদি রিপু যত, তোমার মূরতি তত,
হেরি তুমি বহুরূপী মন;
যে রিপু যখন বলবান,
তোমার আকার সেই রিপুর সমান।

কভু তুমি কঠিন পাষাণ,
কখন' বা অতীব কোমল,
কাতর পরের তরে, আপনার কর পরে,

দয়ামধুরসে ঢল ঢল ;
কভু যেন বজ্রেতে নির্ম্মাণ,
নীরস কখন' নিজ ভাবে ম্রিয়মাণ।

বিশ্বপতি চরণে উড্ডান,
ঘৃণ্য স্থানে কভু বা ভ্রমণ ;
দেহী ভাবি আপনায়, অতি যত্ন কর কায়,
চাহ কভু দেহ বিসর্জ্জন ;
শতেক বর্ত্তন প্রতিদিন,
কখন' নবীন তুমি, কখন প্রবীণ।

তত্ত্ববিদ্ কভু জ্ঞানিবর,
জড়সম কভু অচেতন,
কভু বদ্ধ ক্ষুদ্র স্থানে, কভু বা বিমান-যানে,
কর মন বিশ্ব দরশন ;
অহঙ্কার-বিমূঢ় বর্ব্বর,
কভু শক্তিহীন ক্ষীণ দীনতা-আকর।

চাহ মন হইতে শীতল,
তুষার অনল হৃদে জ্বালি,
কর আত্ম-প্রতারণা, সুখ-আশে বিড়ম্বনা,
যত্নে আন শান্তি দিয়ে ডালি,
সাধ করি গেল হলাহল,
বল পুনঃ জ্বলে মরি বিষম গরল।

চাহ যদি এড়াতে যন্ত্রণা,
শান্তি যদি কর অন্বেষণ,
ক্ষিপ্তপ্রায় স্বেচ্ছাধীন, ভ্রম কেন নিশিদিন,
নিজ হিত হও বিস্মরণ ;
সহেছ তো অনেক বেদনা,
না জান নহে তো হেন কোথায় সান্ত্বনা !

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

প্রতীচ্য কারণতত্ত্ব ও পরমাণুবাদের সমালোচনা।

(১)

কার্য্যকারণতত্ত্বের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আমরা যতদূর করিয়াছি, তাহাতে ইহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, কার্য্য মাত্রেরই নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে কারণের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিলেও, নৈয়ায়িক পণ্ডিত মিল্ (J S. Mill) "কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিরোধাত্মক" যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তদ্বিরোধ ঘটিবার যে কোনই আশঙ্কা নাই, ইহাও আমরা বর্ত্তমান পত্রিকার পূর্ব্বের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা আরও দেখাইয়াছি যে, চিন্তাশীল স্পেন্সার (Spencer) ব্যাখ্যাত এক অদ্বিতীয় আদ্যন্তশূন্য জড় শক্তিকে জগতের নিমিত্তোপাদান কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

অন্য ভূমি হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। স্পেন্সারাদি বলেন, তথাকথিত অচেতন সৎ পদার্থের স্বগত আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-ধর্ম্ম বিশ্ববিক্ষোভের কারণ। কিন্তু ঈষৎ চিন্তাতেই মনে হয়—এবম্বিধ মত ভ্রান্তিমূলক। কারণ,উক্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় ইতরেতরাশ্রয়ী। যাহা ইতরেতরাশ্রয়ী - যাহা অন্যসাপেক্ষ—তাহাকে পরম কারণরূপে অবধারণ করা অসম্ভব। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ ধর্ম্মদ্বয় যখন ইতরেতরাশ্রয়ী এবং আপেক্ষিক, তখন স্বীকার করিতে হইবে,ইহাদের মূলে কোনও স্বতন্ত্র তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। কারণ, যাহা ইতরেতরাশ্রয়ী যাহা পরতন্ত্র বা অধীন তাহা স্বতন্ত্র বা স্বাধীনের আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। ক্রিয়াকালে যাহা অপরের অপেক্ষা রাখে তাহাকে কোন যুক্তি বলে স্বাধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? ক্রিয়াব্যাপারে যাহা স্বতন্ত্র বলিয়া অবধারিত হয় তাহাই কারকপ্রধান এবং তাহাই প্রকৃত 'কর্ত্তা' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। 'কর্তৃকারক' করণাদি সাধনের প্রবর্ত্তয়িতা বা নিয়ামক। কর্ত্তার প্রেরণা ব্যতিরেকে উহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তাকে যে কারকপ্রধানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে

পারে না। জ্ঞান, ইচ্ছা ও চেষ্টা বা প্রযত্নের যিনি আশ্রয় বা আধার, যাঁহার প্রেরণায় করণাদি সাধনসমূহ স্বার্থব্যাপারে কর্ম্মঠ হয়, সেই চেতন পুরুষই কর্ত্তৃকারক; এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ। কেননা, কর্ম্মমাত্রই ত্যাগ ও গ্রহণাত্মক, এবং ত্যাগ ও গ্রহণ আবার বিচার জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্ন সহায়েই হইয়া থাকে। আর ঐ ব্যাপার কেবল চেতনেরই সম্ভবে—অচেতনের নহে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, চেতন পুরুষই সর্ব্বব্যাপারের মুখ্য কর্ত্তা। কিন্তু হে জড়বাদিন্, তোমাদের শাস্ত্রে মুখ্য কর্ত্তা চেতন পুরুষের স্বীকার নাই। সুতরাং জ্ঞানাদিশক্তি-বিহীন ইতরেতরাশ্রয়ী ধর্ম্ম বা গুণ-দ্বয়কে অবিশেষভূত সাম্যেস্থিত পদার্থনিচয়ের কারণরূপে স্বীকার করা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না।

যদি বল, আদ্যন্তরহিত এক অপরিচ্ছিন্ন শক্তিই বিশ্ববিক্ষোভের পরম কারণ, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের উক্ত শক্তি চিৎ কি অচিৎ? কেননা পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই বা প্রত্যক্ষীভূত করিয়া থাকি, তৎসমুদায়কেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য (Subject object) এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দুইটী বিভাগ কি দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, না একই পদার্থের দুইটী বিভিন্ন রূপ মাত্র। ঐ দুই পদার্থের স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে দ্বৈতাপত্তি ঘটে। আবার উহারা একই পদার্থের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিলে, প্রশ্ন উঠিবে—সেই এক মূল পদার্থ জড়, না চিৎ (matter or spirit)? যদি উহাকে "চিৎ" বলা যায় তাহা হইলে জড়ের অভিব্যক্তি রহস্যাবরিতই থাকে। এবং যদি উহাকে জড় বল, তাহা হইলে চিদভিব্যক্তি ব্যাখ্যাই বা কিরূপে হইবে? তৃতীয় পক্ষাবলম্বন করিয়া উক্ত পদার্থকে চিদচিদাত্মক বলিলেও নিষ্কৃতি নাই—কারণ তাহা হইলে উহাতে স্বগত ভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে এবং স্থির করিতে হয়—চিৎ ও অচিৎ এতদুভয়ের কে কাহার প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক।

এইরূপ ধন্দে পড়িয়া কোনওরূপ সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়াই স্পেন্সার সর্ব্বকার্য্যের কারণরূপ অদ্বিতীয় পদার্থ বা শক্তিটীকে জড় শক্তি বলিয়াছেন এবং তৎসহ তাহার পরিণামী ও কূটস্থ দ্বিবিধ রূপের কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু স্পেন্সারীয় সিদ্ধান্ত আপাততঃ শ্রুতিমধুর হইলেও শূন্যগর্ভ। কারণ, জিজ্ঞাসা করি, পরিণামী ও কূটস্থ ভেদে, পরস্পর-বিরুদ্ধ রূপদ্বয়ের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ ও একীকরণ কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে?

যাহা সংহত—বিবিধ নাম ও রূপসংমিশ্রণে যাহা অবস্থিত—তাহা ও পরপ্রয়োজন-সাধক—তাহা কখনও নিত্য নিরঞ্জন পরম কারণ হইতে পারে না।

আর এক কথা। সর্ব্বকার্য্যের কারণরূপ অদ্বিতীয় শক্তিকে জড় বলিলে জগৎ রচনা সিদ্ধ হয় না। কেননা, তদুদ্দেশ্যে তাহার প্রবৃত্তিই নাই—এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। উপাদানভূত বিন্যাসবিশেষের নামই 'রচনা' এবং তদুপযোগী ভাববিশেষের নামই 'প্রবৃত্তি'। বিকাশোদ্দেশ্যে অবিশেষভূত (Homogeneous) অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহাই মানিতে হয় যে, সাম্যাবস্থায় স্থিত শক্তিপুঞ্জের ভিতর বৈষম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত বা উহাও অবিশেষভূতের একটী ভাববিশেষ; এবং ঐ মূলীভূত অচেতন পদার্থের সাম্যে বা অবিশেষভাবে প্রলয় উপস্থিত হয় ও বৈষম্যরূপ অন্য ভাববিশেষে বিকাশ বা সৃষ্টির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু অচেতনের ইচ্ছাশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যরূপ ভাববিশেষের উদয় হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, ঐরূপ দৃষ্টান্তের অভাব। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, অনুমানোৎপাদক দৃষ্টান্তের অভাব নিবন্ধন সর্ব্বথা অনপেক্ষ অচেতনের প্রবৃত্তিই দুর্ঘট এবং যেহেতু অচেতনের কার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু অচেতনের স্বতন্ত্র জগৎকারণত্বের অনুমানও দুর্ঘট।

জড়বাদী হয়ত বলিতে পারেন, জড় পদার্থের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত একান্ত দুর্ঘট নহে। জলীয় পদার্থের বাষ্পরূপে উড্ডীয়মানতা, তরল পদার্থের নিম্নাভিমুখে গমন, অয়স্কান্তমণির লৌহাকর্ষণ প্রভৃতি জড় পদার্থের প্রবৃত্তি ত আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সুতরাং কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া জড় যে স্বয়ম্প্রবৃত্ত ও বিনিবৃত্ত হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, জড়বাদী তোমাদের ঐ যুক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, জলীয় পদার্থের বাষ্পরূপে উড্ডীয়মানতা বাহ্য উষ্ণতার উপর নির্ভর করে; তরল পদার্থের নিম্নাভিমুখে গমন ভূমির নিম্নতার অপেক্ষা রাখে। অয়স্কান্তমণিও কারণান্তরের সহায়ে লৌহের সান্নিধ্যে ঋজু রেখায় ও পরিমার্জ্জিত হইয়া স্থাপিত হইলেই সন্নিহিত লৌহকে আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে যে, ইহাদের কেহই নিরপেক্ষ নহে—সকলেই কোনও না কোন কারণান্তরের অপেক্ষা রাখে। নতুবা জলীয় পদার্থের বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মানতায় তরল পদার্থের নিম্নাভিমুখে গমনে,

চুম্বক পাষাণের আকর্ষণে, তথাকথিত শুষ্ক জড়ে কাল দিক্ ও অবস্থাজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বলিতে হয় যে, কোন্ সংস্কারপ্রভাবে জলীয় পদার্থ অবগত হইয়া থাকে যে, উষ্ণতানিবন্ধন তাহাকে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতে হইবে। সংস্কারবশবর্ত্তী হইয়াই তরল পদার্থ ভূমির নিম্ন দিকে অভিগমন করে এবং ঐরূপেই চুম্বক পাষাণ তাহার সরল পথে অবস্থিত লৌহকে আত্মীয় জ্ঞানে আপনার নিকটে আহ্বান করে। বলিতে হয় যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তত্রয়ই, জড়ে নিহিত কাল, দিক্ ও অবস্থা জ্ঞানের পরিচায়ক। নচেৎ বলিতে পারি, এবম্বিধ ব্যাপার সংঘটনের ব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারে? যদি বল, "স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার?" তাহা হইলে ত কার্য্যের কারণতত্ত্ব আলোচনার একান্ত অবসান হইয়া পড়ে—স্বভাববাদ স্বীকার করা—আর বিজ্ঞানের অপবাদ করা সমান হইয়া পড়ে। দোষবাহুল্য-নিবন্ধন স্বভাববাদ বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে না। স্বভাববাদ স্বীকারে কি কি আপত্তি হইতে পারে, আমরা যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর পর্য্যালোচনা করিলাম, তাহা অভিব্যক্তিবাদের শক্তিরূপের (Dynamical) সমালোচনা মাত্র। অভিব্যক্তিবাদের অপর ত্রিবিধ রূপ আছে যথা,—(১) পরমাণু ভাব, (২) বিজ্ঞানভাব (Sensation-al) (৩) স্বভাব (Natural)। উপরে আমরা স্পেন্সারীয় শক্তিভাবের খণ্ডন করিয়াছি। অধুনা পরমাণুভাবের আলোচনা করিব।

বিশ্বাভিব্যক্তিতে স্পেন্সারীয় পরমাণুভাব এইরূপ।—প্রলয়ান্তে সাম্যে অবস্থিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরমাণুসকল কিয়ৎকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তদবস্থায় ইহারা কোনওরূপ বিনাশজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কেবল বিনিবৃত্তাবস্থায় সুপ্তভাবে অবস্থান করে মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, অসংখ্য পরমাণুসকল তৎকালে নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। কিন্তু অভিব্যক্তি-কালে তাহারা সচল ও সংযুক্ত হইয়া ক্রমে দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন করিতে করিতে এই বিরাট্ বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই দৃগ্‌ভূমি হইতেই পরমাণুকে অবিভাজ্য ও নিত্যরূপ ঘোষণা করা হইয়া থাকে।

পরমাণুবাদের অভ্যুদয় এইরূপ—পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যায় যে, সকল বস্তুই সাবয়ব বা নানা দ্রব্য সংযোগে সমুৎপন্ন। সামান্য হইতে বিশেষে আরোহণক্রমে ইহাও বিদিত হওয়া যায় যে, জগতে যাহা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়—তৎসমুদায়ই স্বানুগত সংযোগসহকৃত মূলীভূত নানা দ্রব্য

হইতে সঞ্জাত। উদাহরণক্রমে বস্ত্রকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দেখ না, বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তাহার অবয়ব; সূত্র অবয়বী, অংশু তাহার অবয়ব। অংশু অবয়বী, তদংশ তাহার অবয়ব। এবম্বিধ বিশ্লেষণ যেখানে পরিসমাপ্ত হইবে,—যখন বিশ্লেষণ-বিভাগ আর চলিবে না, বা চলিতে পারে না—অথবা যাহার বিভাগ বা অংশ নাই—সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রত্বের যে চূড়ান্ত স্থান, তাহা-রই নাম 'পরমাণু' (Atom)। বিচিত্র রচনাময় এই জগৎ সাবয়ব এবং তন্নি-বন্ধন ইহার আদ্যন্ত বা উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে। বিনা কারণে কার্য্য সংঘটন হয় না। সুতরাং, বিশ্ববিশ্লেষণক্রমে বুঝা যায়—অসংখ্যপরমাণু রাশিই জগদভিব্যক্তির কারণ।

পরমাণু নিরংশ, নিরবয়ব ও নিত্য। নিরংশ নিরবয়ব কেন?—না সাংশ সাবয়বই বিশ্লেষণযোগ্য। পরমাণুর আর বিশ্লেষণ হয় না, সুতরাং ইহা নিরংশ নিরবয়ব। নিত্য কেন?—না অবিনাশী; বিশ্লেষণে দ্রব্যের স্বরূপত্বের হানি হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরমাণু বিশ্লেষণযোগ্য নয়, সুতরাং অবিনাশী ও নিত্য। পরমাণুবাদের ইহাই সার মর্ম্ম। এক্ষণে বিচারে দেখা যাউক এতন্মতবাদ কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

পরমাণুবাদী তোমরা বলিয়া থাক,—প্রলয়ান্তে নিশ্চল পরমাণুরাশিতে কর্ম্ম বা গতি আরম্ভ হইলে, তাহারা সক্রিয়, সচল, ও পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে বিশ্ববিনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—গতি বা কর্ম্মোৎপত্তির কারণ কি? তোমরা হয়ত বলিবে দ্রব্য স্বয়ংই গতির কারণ, ইহা অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা গতির উৎপাদন করে। শক্তি কোন্ পদার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা উত্তর করিয়া থাক যে, যদ্দ্বারা কর্ম্মনিষ্পাদনে সক্ষম হয়, তাহাই শক্তি। কিন্তু তোমাদের এ কথা সমীচীন বলিয়া অনুমান হয় না। কর্ম্ম বা শক্তি আপেক্ষিক স্থিতির পরিবর্ত্তন মাত্র। সুতরাং গতি বা কর্ম্মকে সাপেক্ষ বলিতে হইবে।

নিশ্চেষ্টতাই জড়ের ধর্ম্ম। কারণান্তর কর্ত্তৃক প্রণোদিত না হইলে ইহা সচল হইতে পারে না। আবার একবার চালিতে হইলে, যদি ইহার গতি প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবে ইহা স্বয়ং স্থির হইতে পারে না। মহামতি পণ্ডিত নিউটন প্রতিপন্ন করিয়াছেন—অপরের বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে "যে জড়কণা একবার স্থির হইয়াছে তাহা স্থির হইয়াই থাকিবে; আর যাহা চলিতেছে—তাহা সরল রেখায় চিরদিনই সচল থাকিবে।" পণ্ডিত নিউটনের

ইহাই গতিবিষয়ক প্রথম নিয়ম। জড় যে কর্ম্মে স্বয়ম্প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এই নিয়মই তাহার প্রমাণ। অতএব বুঝিতে হইবে, স্থির ভাবে অবস্থিত পরমাণুরাশিতে কর্ম্মারম্ভ হইতে হইলে অথবা কর্ম্মশীল পরমাণুরাশির স্থির ভাব অবলম্বন করিতে হইলে কোন বাহ্য শক্তির প্রয়োজন। নচেৎ জড়ের জড়ত্ব থাকে না। কর্ম্ম বা গতিরূপ কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাধ্যাকর্ষণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণ ভূতনিবিষ্ট স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও ইহা নিশ্চয়ই নিয়ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কোন ক্রিয়াকারী শক্তিবিশেষ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ইউলার (Eulear) বলিয়াছেন—মাধ্যাকর্ষণ কোন চেতন পুরুষের অথবা অতীন্দ্রিয় কোন সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্য। অধ্যাপক চ্যালিস্ (Prof. Chellis) অনুমান করেন, দ্রব্যনিচয়ের অভিঘাত বা আপীড়ন হইতে মাধ্যাকর্ষণ জন্মলাভ করিয়াছে। পণ্ডিত নিউটন তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে এ মতের পোষকতা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট (Stewart) মাধ্যাকর্ষণের অভিনব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে এতন্মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে, পরমাণুপুঞ্জের আদ্যাভিঘাত বা আপীড়ন কিরূপে সংঘটিত হইল ?

তোমরা বলিয়া থাক যে, পরিদৃশ্যমান জগৎকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যে, চূর্ণীকৃত রেণুকাপুঞ্জের আর বিভাগ হয় না; সেই অবস্থার নাম প্রলয়। প্রলয়কালে চরম অবয়বী অনন্তপরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব থাকে না। পরে যখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, তখন এই সকল পরমাণুরাশিতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ক্রিয়া আপীড়ন বা অভিঘাত হইতে পরস্পরের সংযোগ হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে বিশ্বরচনা হইয়া থাকে।

তোমাদের এবম্বিধ উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিভাগাবস্থায় একান্তনিষ্ক্রিয় নিশ্চলভাবে বিদ্যমান পরমাণুনিচয়ের পরস্পর আদ্য সংযোগের ক্রিয়া, আপীড়ন বা অভিঘাত-সাপেক্ষতা তোমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তোমরা ক্রিয়মান বস্তুনিচয়কেই পরস্পর সংযুক্ত হইতে দেখিয়াছ, নিশ্চল নিষ্ক্রিয়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগ কখনও প্রত্যক্ষীভূত কর নাই। ক্রিয়া দ্বারাই সংযোগ হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়া বা

অভিঘাতকে সংযোগের নিমিত্ত কারণরূপে স্বীকার করিতে হইবে; এবং এই নিয়ম স্বীকার করিলে, ইহাও আবার স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে যে, ক্রিয়া, আপীড়ন বা অভিঘাত জন্য-পদার্থ, সুতরাং তাহাও অপর নিমিত্ত কারণ-সাপেক্ষ। নিমিত্ত কারণকে অস্বীকার করিলে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয়—এবম্বিধ অবৈজ্ঞানিক কথার অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, যখন কার্য্যকারণের ভিতর ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, তখন এতন্নিয়মানুরোধে পরমাণুতে আদ্য ক্রিয়ার অভাব স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, তোমাদের মতে প্রলযান্তে পরমাণুপুঞ্জে আদ্য ক্রিয়া কারণান্তর-নিরপেক্ষ। যদি নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন স্বীকার কর, তাহা হইলে বলিতে পার তাহা কোন পদার্থ? প্রযত্ন, না অভিঘাত? আমাদের মতে এতদ্দ্বয়ের অন্যতম অসম্ভব; এবং যেহেতু অসম্ভব, সেই হেতু পরমাণুরাশির পরস্পর সংযোগও অসিদ্ধ। প্রযত্ন মানসিক ব্যাপার মাত্র। মন শরীরের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং শরীর না থাকায় মনের কল্পনা করিতে পার না। শরীরস্থ মনের অভাব হেতু পরমাণুরাশিতে প্রযত্ন সংঘটিত হইতে পারে না। অভিঘাত আবার প্রযত্নসাপেক্ষ। অতএব প্রযত্নের অভাবনিবন্ধন অভিঘাতও অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রযত্ন অভিঘাতাদি ক্রিয়োৎপত্তির কারণ স্বীকার করি—কিন্তু তাহা সৃষ্টির পরেই সম্ভব, অগ্রে নহে। আদ্য অভিঘাতের প্রতি সে সকলের কারণতা অসম্ভব; হেতু এই যে, সে সময় ঐ সকল থাকে না। অতএব আদ্য ক্রিয়া সংঘটনের অসম্ভাবনা-নিবন্ধন পরমাণু হইতে বিশ্বাভিব্যক্তি হইতেই পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এ বিষয়ে আরও আপত্তি আছে আমরা দেখাইয়াছি, প্রলয়কালে পরমাণু নিষ্ক্রিয় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহাতে ক্রিয়ারম্ভ হয়, এই নিয়মের নিয়ামক তোমা-দের মতে নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, তোমাদের মতে সৃষ্টিকালে পরমাণুতে যে আদ্য ক্রিয়া বা অভিঘাত হইবে, নিশ্চল পরমাণু যে চলিতে থাকিবে, তৎপ্রতি কোন নিমিত্ত কারণ নাই। কিন্তু নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হয় না; ক্রিয়া না হইলে, পরমাণু সকল সচল না হইলে, সংযোগ হইবে না; সংযোগ না হইলে দ্ব্যণুকাদি সংঘটিত হইবে না। সুতরাং সৃষ্টি অসম্ভব।

অন্য আপত্তি এই যে, তোমরা প্রচার করিয়া থাক যে, এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি করে। এক্ষণে আমাদের

জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রোক্ত সংযোগ সর্ব্বাত্মিক, কি আংশিক? অর্থাৎ একেবারে মিলিত হইয়া ঐক্য প্রাপ্ত হয়, না পাশাপাশি যুক্ত হইয়া থাকে? সর্ব্বাংশে মিলিত হইয়া ঐক্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে, যে পরমাণু সেই পরমাণুই থাকিবে—হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই সংঘটিত হইবে না। আংশিক মিলনকেই সংযোগ বলে, সর্ব্বাংশিক মিলনকে ঐক্যপ্রাপ্তি বলে। সুতরাং সর্ব্বাংশিক মিলনকে তোমরা সংযোগ বলিতে পার না।

যদি বল, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ আংশিক, তাহা হইলেও নিষ্কৃতি নাই। কেননা, আংশিক সংযোগ স্বীকারে পরমাণুর অংশ অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, পরমাণু নিরংশ। যদি বল, বাস্তব অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে, তাহা হইলে আমরা বলিব, যাহা কল্পিত তাহা বস্তু নহে। এই ন্যায়ানুসারে সংযোগ অবস্তু বা মিথ্যা হইয়া পড়ে।

এইরূপ অপরাপর দোষবাহুল্যনিবন্ধন স্পেন্সারীয় অভিব্যক্তিবাদের পরমাণুভাবও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ক্রমশঃ

পাণ্ডবগণের ঐতিহাসিকতা। *

[শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।]

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসমূলক গ্রন্থ আছে কি না, এবং যেগুলি প্রাচীন ইতিহাস নামে প্রচলিত, সে গুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ কি না, এ বিষয়ে বহুকাল হইতে তর্ক চলিয়া আসিতেছে। এপর্য্যন্ত এ তর্কের সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা আমাদের কর্ত্তব্য কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আমাদিগের প্রাচীন ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহে যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে তাঁহাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতগণ যতই উদার-

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে ইং ১৯০৯ সালে পঠিত।

হৃদয় ও অধ্যবসায়শীল হউন না কেন তাঁহাদের সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও কোন কারণ নাই। তবে তাঁহারা ভারতীয় বিষয়ে যে এত উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাহার কারণ, প্রাচীনতত্ত্ব জানিবার জন্য মানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল, জ্ঞানপিপাসার কতকটা নিবৃত্তি ও নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু বৈদেশিক পণ্ডিতগণের সহিত আমরা সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারি না। যে গ্রন্থের বর্ণিত কাহিনী হিন্দুসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতাকে বহু শতাব্দী ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা ভারতবাসীর সমক্ষে চিরন্তন আদর্শের প্রতিকৃতি উজ্জ্বলরূপে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা ধর্ম্মের উচ্চতম তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, সেই মহাভারত গ্রন্থ ঐতিহাসিক-ঘটনা-মূলক কি না, এ বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সন্দেহ করেন। যে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার সহিত ভারতবাসীর অধিকাংশ আশা ও আশঙ্কা জড়িত রহিয়াছে, সেই গ্রন্থবিচারে যেরূপ সম্ভ্রম ও সতর্কতা প্রদর্শন করা আবশ্যক, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা অবলম্বন করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, করুন বা নাই করুন, ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে অতীব মর্ম্মপীড়ক। তাঁহারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রায় অস্বীকারই করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহার আলোচনা দুই দিক্ দিয়া করা যাইতে পারে। একটী এই যে আলোচ্য গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যে সকল বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করা এবং আর একটী এই যে, ঐ গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যদি কিছু যথার্থ (Positive) নিদর্শন থাকে, তাহা দেখানো। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই দুই দিক্ দিয়া আলোচনা করা এক প্রকার অসম্ভব। বিরুদ্ধ প্রমাণ খণ্ডন করা যে প্রধানতঃ আবশ্যক, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

মহাভারত ঐতিহাসিক-ঘটনা-মূলক কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই দেখা আবশ্যক, মহাভারতের যাঁহারা নায়ক তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী দেখাইতে পারেন—তাঁহাদের কোনও ঐতিহাসিকতা নাই, তবে ঐখানেই মহাভারতের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,

মহাভারতের নায়ক পাণ্ডবগণ কবিকল্পনাপ্রসূত, তাঁহাদের কোন ঐতিহাসিকতা নাই। যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সকল যুক্তি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইব। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, যে সকল গ্রন্থের প্রমাণ সর্ব্ববাদিসম্মত, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে পাণ্ডবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যে বৈদিক গ্রন্থগুলিই প্রধান *। Weber সাহেব তাঁহার রচিত Indian Literature নামক গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শতপথব্রাহ্মণে এমন কতকগুলি বচন আছে, যাহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে, পাণ্ডবগণের অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না। আমরা শতপথ ব্রাহ্মণের সেই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তি অসঙ্গত। প্রথমে, মহাভারতবর্ণিত উপাখ্যান সম্বন্ধে Prof. Lassen, Weber প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কতটুকুর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন এবং কতটুকুর করেন না, তাহা জানিয়া রাখিলে আমাদের এ বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে। তাঁহারা এই টুকু মাত্র স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে কুরু এবং পাঞ্চাল বলিয়া দুইটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। সেই কুরু এবং পাঞ্চালগণের মধ্যে একটী লোকধ্বংসী মহা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া কোন লোক ছিল না এবং কাজে কাজেই তাঁহাদের সহিত ঐ যুদ্ধের কোন সম্বন্ধও ছিল না। কুরু ও পাঞ্চাল বলিয়া যে ভারতে দুইটী প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না; তাহার কারণ এই যে, বেদের ব্রাহ্মণাংশে অনেক স্থলে উহাদের নাম উল্লেখ আছে। পাণ্ডবগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং কুরুক্ষেত্র-সমর ঐতিহাসিক ঘটনা—ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার বিশ্বাস। কিম্বদন্তী (tradition) যে ইতিহাসের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, ইহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এত বড় একটা চিরপ্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী ইতিহাসমূলক নহে, এরূপ বলিবার কি কারণ আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি

* এ স্থলে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর Weber সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই এবং তাহাই ইউরোপীয় ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদগণ এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার মতই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতযুদ্ধের ঐতিহাসিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে গোলে পড়িয়াছেন। Weber সাহেব শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এক স্থলে বলিতেছেন—"Now at the time of the Brahmanas we find the Kurus and Panchalas still in full prosperity and also united in the closest bonds of friendship as one people. Consequently, this internecine strife cannot have taken place." * অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণের সময়ে কুরু এবং পাঞ্চালগণ খুব সমৃদ্ধ ও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং সে সময়ে অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে তখনও কোন যুদ্ধ হয় নাই। আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন—"The supposed great internecine conflict between the Kurus and Panchalas about the dominion of the Pandavas, must have been long past at the time of the Brahmana. How is this *contradiction* to be explained ?"* অর্থাৎ অনুমিত মহাযুদ্ধটী ব্রাহ্মণরচনার বহুকাল পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিনি মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন। আমরা দেখাইব, তাঁহার এ সন্দেহের কোনই ভিত্তি নাই। তিনি বিচার করিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"That something great and marvellous had happened in the family of the Parikshitas and that their end still excited astonishment at the time of the Brahmana, has already been stated. But what it was we know not. After what we have stated above, it can hardly have been the overthrow of the Kurus and Panchalas ; but at any rate it must have been deeds of guilt ; and indeed I am inclined to regard this as yet unknown "something" as the basis of the legend of the Mahabharata. To me it appears absolutely necessary to assume, with Lassen, that the Pandavas did not originally belong to the legend, but were only associated with it at a later time." ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, পারীক্ষিত বংশে কি একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা যে কুরুপাঞ্চালগণের ধ্বংসকাহিনী ইহা সম্ভব নহে, তবে তাহা একটা পাপপ্রণোদিত ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং অজ্ঞাত কোন ঘটনা হইতেই মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে আর

* "Indian Literature," pp. 135-6.

পাণ্ডবগণের নাম পরে ঐ গল্পের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর. শতপথ ব্রাহ্মণের যে বচনগুলি লইয়া তাঁহারা এত গোলযোগে পড়িয়াছেন, সেই বচনগুলির অলোচনা করিব এবং আশা করি, দেখাইতে পারিব, Weber সাহেব যাহাকে পারীক্ষিত বংশের এক অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছেন এবং যাহা তাঁহাদের নিকট এখন পর্য্যন্ত একটা অজ্ঞাত বিষয় (as yet unknown "something"), সে ঘটনাটী প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তাহার সহিত ভারতযুদ্ধের কতদূর সম্পর্ক এবং এই পারীক্ষিতগণই বা কাহারা। শতপথব্রাহ্মণ ১৩শ কাণ্ড ৫ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে কয়েকটী বচন আছে। Prof. Max muller তাঁহার প্রকাশিত S. B. E. Seriesএ ঐ বচনগুলি যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই :—

1. Now Indrota Daivapa Shaunaka once performed this sacrifice for Janamejaya Parikshita, and by performing it extinguished all evil-doing, all Brahman slaughter ; and verily, he who performs Ashwamedha extinguishes (the guilt incurred by) all evil-doing, all Brahman slaughter.

2. It is of this, indeed that the Gatha (strophe) sings, —'In Asandivat, Janamejaya bound for the gods a black-spotted, grain-eating horse, adorned with a golden ornament and with yellow garlands.

3 [Then are] those same first two days and a Jyosis Atiratra . therewith they sacrificed for Bhimasena ;- those same first two days, and a Go Atiratra : therewith (they sacrificed) for Ugrasena ; those same first two days and an Ayus Atiratra · therewith (they sacrificed) for Srutasena. These are the Parikshitiyas, and, it is of this that Gatha sings, —"The righteous Parikshitas performing horse sacrifices, by their righteous work one after other."

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক স্থানে ঠিক ইহার অনুরূপ কয়েকটী বচন আছে, আমরা এস্থানে উদ্ধৃত তাহারও S. B E. Series এ কৃত অনুবাদ দিতেছি :—

1. "Then Bhujyu Lahyayani asked......where then were the Parikshitas, I ask thee, yajnavalkya, where were the Parikshitas ?"

2. Yajnavalkya said : "He said to thee, I suppose, that they went where those go who have performed a horse-sacrifice."

উপরি উক্ত বচনগুলি হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি যে, জনমেজয় পারীক্ষিত নামে এক ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হন এবং ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক নামক এক ব্যক্তি আসন্দীবৎ নামক স্থানে তাঁহার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাহাতে তিনি পাপমুক্ত হন। আরও জানিতে পারি যে, ভীমসেন, উগ্রসেন এবং শ্রুতসেন নামধেয় পারীক্ষিতীয়গণ প্রত্যেকে এক একটী যজ্ঞ করিয়া পাতক হইতে মুক্ত হন। এই বচনগুলির উপর নির্ভর করিয়া Weber সাহেব বলিতেছেন "On the other hand, in the latest portion of the Brahmana, we find the prosperity, the sin, the expiation, and the fall of Janamejaya Parikshita and his brothers Bhimasena, Ugrasena and Srutasena, and the whole family of the Pârikshitas, apparently still fresh in the memory of the people and discussed as a subject of controversy." অর্থাৎ ঐ ব্রাহ্মণের শেষভাগ প্রণয়নকালে জনমেজয় পারীক্ষিত এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভীমসেন শ্রুতসেন এবং উগ্রসেন,—ইঁহাদের পাতক, প্রায়শ্চিত্ত এবং অধঃপতন জনসাধারণের স্মৃতিতে সুস্পষ্টরূপে জাগরূক ছিল এবং যে সকল বিষয়ে সে সময় খুব বাক্‌বিতণ্ডা চলিত। এই পাতক এবং অধঃপতন সম্বন্ধেই Weber সাহেব "একটা অজ্ঞাত আশ্চর্য্য বিষয়" (something great and marvellous) এবং অন্যত্র একটা "অজ্ঞাত কিছু" (unknown something) এই সকল প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ঐ অজ্ঞাত কিছু হইতেই মহাভারতের উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন যে, যখন ব্রাহ্মণ ও সূত্র সকলের মধ্যে পাণ্ডবগণের কোন উল্লেখ নাই, অথচ যাঁহারা তাঁহাদের পৌত্র ও প্রপৌত্র বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের নাম রহিয়াছে এবং একটা প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, একটা কোন ব্যাপার হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণের তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং তাঁহারা পরবর্ত্তী সময়ের কল্পনাপ্রসূত। ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের জন্য আমরা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ভাবার্থসূচক বাক্যগুলিও এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম; যথা, "To me it appears *absolutely* necessary to assume, with Lassen, that the Pandavas did not originally belong to the legend, but were

only associated with it at a later time, for not only is there no trace of them anywhere in the Brahmanas and Sutras, but the name of their chief hero Arjuna (Phalguna) is still employed here, in the Satapotha Brahmana (and in the Samhita), as a name of Indra, indeed he is probably to be looked upon as originally identical with Indra, and therefore distitute of any real existence." ইহা অবশ্যই অত্যন্ত সন্দেহ-জনক কথা হয় যদি দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়কালের পরবর্ত্তী কালের ঘটনা ও ব্যক্তিগণের উল্লেখ রহিয়াছে, অথচ পাণ্ডবগণ ও ভারতযুদ্ধের কথা কিছুই নাই। এরূপ স্থলে পাণ্ডবগণ ও ভারতযুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে একটা ঘোর অবিশ্বাস আসে, সন্দেহ নাই। তবে কথা হইতেছে এই যে, উপরি উক্ত ঘটনা ও ব্যক্তিগণ পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়কালের পরবর্ত্তী কালের কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের। যদি দেখান যায় যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ব্যক্তি, তাহা হইলে আর এ কথা খাটে না। বস্তুতঃ আমরা স্বতন্ত্র (independent) প্রমাণ পাইয়াছি যে, উপরি উক্ত জনমেজয় পারীক্ষিত অর্জ্জুনের প্রপৌত্র নহেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের একই নামধেয় অন্য এক ব্যক্তি এবং ঐ প্রমাণে ইহাও দেখা যায় যে তাঁহার কৃত ব্রহ্মহত্যার সহিত কোন যুদ্ধের সংস্রব নাই, উহা প্রকৃতই ব্রহ্মহত্যা। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে, যে বিষয় সম্বন্ধে আমরা বৈদিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাইতেছি, সে বিষয়ে আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অল্প প্রামাণিক পৌরাণিক গ্রন্থের সাহায্য লইব কেন? পৌরাণিক গ্রন্থগুলি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অল্প প্রামাণিক, অবশ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা দেখিতে পাই যে, কোন পৌরাণিক গ্রন্থে এমন কোন কথা আছে, যাহা বৈদিক গ্রন্থের কোন উক্তিকে সমর্থন করিতেছে, কিম্বা যদি দেখিতে পাই কোন বৈদিক গ্রন্থের উক্তি জটিল ও অস্পষ্ট এবং পৌরাণিক গ্রন্থ সেই জটিল ও অস্পষ্ট উক্তিকে বিশদ এবং সুস্পষ্ট করিতেছে, তবে পৌরাণিক গ্রন্থের প্রমাণ অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রী৺ঘণ্টেশ্বর।

যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

নিবেদন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত সমাজ স্থান খানাকুল কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের মধ্যে একটী তীর্থ স্থান। শ্রীপাঠ কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা অভিরাম-রূপী শ্রীদামের লীলাভূমি গুপ্ত বৃন্দাবন বলিয়া পরিচিত। ঘণ্টেশ্বর ও অন্যান্য দেবদেবী বিরাজমান থাকায় খানাকুল গ্রামখানি দ্বিতীয় কাশীধামরূপে প্রতীয়মান। এই শিবলিঙ্গ কাহারও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নহেন, ইনি অনাদি স্বয়ম্ভু। কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে ইঁহার মহিমা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শ্রীশিব-পার্ব্বতী সংবাদে শিব-শত-নাম স্তোত্রে উক্ত আছে—

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥২৪
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর-নদীতটে।
ভাগীরথী-নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥ ২৫

প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘণ্টেশ্বর দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ স্বপ্নাবেশে মাঘ মাসের অকাল বন্যাতে ভাসমান বেউড় বাঁশের ঝাড়ে সংলগ্ন কালভৈরব মূর্ত্তি ঘণ্টেশ্বর দেবের মূর্ত্তির পার্শ্বে স্থাপিত করিতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েন। স্বামী অনুপ নারায়ণ, শ্রীমৎ ঈশান চন্দ্র দেব, সুদাম ব্রহ্মচারী ও বাওয়াজি প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ এই স্থানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। এই বাওয়াজির আদেশে উবিদ্‌পুর গ্রামের মটুক কারক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধনির্ম্মিত অবস্থায় রাখিয়া দেয় পরে ঘণ্টেশ্বর দেব কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কানাইলাল দে মন্দির সমাধা করাইয়া দেন এবং ভক্তিভাজন স্বনামধন্য দশরথ বটব্যাল মহাশয় ৺ সেবার ভার গ্রহণ করেন। এই মন্দিরের পার্শ্বেই দুইটী শ্মশান আছে। একটী সাধারণের জন্য, অপরটী ব্রহ্মশ্মশান, উহাতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের শবই দাহ করা হয়। শত শত লোক ৺ ঘণ্টেশ্বর দেবের কৃপায় দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই দেবের মন্দির কাণা নদীর তীরে অবস্থিত। কাণা নদীরই পূর্ব্বনাম রত্নাকর। মন্দিরটীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। নদীর প্রবল স্রোতে মন্দিরটীর তলদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। দুইজন প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি, সি, ই ও স্বর্গীয় হরিপদ ঘোষাল বি, সি, ই মহাশয়দ্বয় খানাকুলে যাইয়া ৺ মন্দিরের অবস্থাদি পরিদর্শন করিয়া ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে সাল কাঠের piling (Spur) করিয়া দিলে মন্দির সংরক্ষিত হইতে পারে বলিয়াছেন। হুগলী জেলার সুযোগ্য এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি, সি, ই মহাশয়ও পরিদর্শন করিয়া Spur work করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও ৭০০৲।৮০০৲ টাকা প্রতি-

শ্রুত হইয়াছে, অবশিষ্ট ১৩০০ টাকা এখনও সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। আশা করি, সাধারণের সহানুভূতিতে এই অর্থ শীঘ্রই সংগৃহীত হইবে। ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের শাখা বঙ্গ-ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে এই মন্দির রক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং বঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডল স্বয়ং বর্ত্তমানে অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও ৫০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ইহার সম্পাদক, সভাপতি ও সভ্যগণকে এই কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। এখনই রীতিমত চেষ্টা না করিলে অচিরে মন্দির ও দেবমূর্ত্তি নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইবে ও সেই সঙ্গে হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-সূর্য্য আংশিকরূপে অস্তমিত হইবে। অতএব হিন্দুভ্রাতাগণ সাধ্যানুসারে জাতি ও ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করুন, চাঁদা আদায় করিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং রসিদ বহি ছাপান হইয়াছে। চাঁদা দাতা-গণ রসিদ বহির যথাস্থানে স্বাক্ষর করিয়া দানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া দিবেন। অথবা যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানার যে কোন একটীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিতে পারেন।

সভাপতি শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বসু এম্ এ, বি এল্। ১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষ বি এল্। উকিল হাইকোর্ট, ৫৯ নং সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীকিশোরী মোহন গুপ্ত এম্ এ। খানাকুল।

[শ্রীশ্রীঘণ্টেশ্বর মন্দির মেরামতের জন্য আবেদন উপরে প্রকাশিত হইল। আশা করি, সাধারণে মন্দিরের স্থায়িত্বকল্পে সাহায্য করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন।—উঃ সং]

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের ১৯০৯ সনের রিপোর্ট আমাদের নিকট সমালোচনার্থ আসিয়াছে। উহা দৃষ্টে জানা যায় যে, ঐ বৎসর ১৪৭ টী রোগী আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে এবং ৭১৩৪ জন আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪ জন দুঃস্থ ভদ্রমহিলাকে সমস্ত বৎসর প্রত্যেককে মাসিক ২॥০ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে এবং ঐ প্রকারের আর একটী ভদ্র মহিলাকে ডিসেম্বর মাস হইতে সাহায্য করা হইতেছে। ঐ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ আয়—১৩০২৸৵৫; ব্যয়—১১০২৲, হস্তে বাকি ২০০৸৵৫।

সম্প্রতি আমাদের ভাগ্যে এই আশ্রমসন্দর্শন ঘটিয়াছিল। আমরা ইহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছি যে, ইহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের সমক্ষে চিত্রিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা হইতেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই আশ্রমের সেবাকার্য্য কিরূপ হইয়া থাকে। আমরা ৫ দিন মাত্র এখানে ছিলাম। প্রতিদিনই দেখিতে লাগিলাম যে, প্রাতে ৭টা হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা পর্য্যন্ত ঔষধার্থে রোগী আসিবার বিরাম নাই। দূর দূর গ্রাম হইতে পদব্রজে আসিতে অসক্ত দুঃস্থ ব্যক্তিগণ গরুর গাড়ী বা মহিষের সাহায্যে চিকিৎসার্থ আসিতেছে। আর আশ্রমের ব্রহ্মচারী দুইটী মহোৎসাহে তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। রোগীদের মধ্যে বেশীভাগ ফোড়া, ঘা ইত্যাদিতে ভুগিতেছে। তাহাদের সকলকে ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি নিত্য করিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আশ্রমে কয়েকটী রোগীকে রাখিয়াও ঔষধ ও পথ্যাদি দ্বারা সর্ব্ব-প্রকারে সেবা করা হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে একজনের উপর আমাদের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হয়। অগ্নিসংযোগে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় এ লোকটী একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের বোধ হইল যেন বাঁচিবার নয়, কিন্তু যখন

রোগীর জনৈক আত্মীয়ের নিকট শুনিলাম যে, যখন ইহাকে আশ্রমে ভর্ত্তি করা হয়, তখন ইহার অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল, এক্ষণে বরং কিয়ৎ পরিমাণে সামলাইয়াছে, তখন হৃদয়ে আশা হইল। সেবকগণও, দেখিলাম, রোগীকে বাঁচাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প! এই সমস্ত রোগীদের দেখিতে ও তাহাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে সেবকদের প্রায় ১টা ১।টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। তার পর তাঁহারা স্নানাহার করেন। পুনরায় বৈকালে রোগী আসে। তাহাদের এবং আশ্রমস্থ রোগীদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রায় সন্ধ্যা ৭।৮টা হয়। শুনিলাম, ঝুলন ইত্যাদি মেলাতে সেবকদের স্নানাহারেরও সময় থাকে না।

অষ্টকালীন পদাবলী—গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পবিত্র-জীবন-লীলা-স্মরণ-সহায়ক কয়েকটী সত্য ঘটনা, কতক কল্পনার যোগে ছন্দো-বন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা বেশ অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইতে পারে। আশা করি, ভক্তগণের নিকট ইহার আদর হইবে।

কুষ্টিয়া বিবেকানন্দসেবাশ্রম—আজ কাল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমাদির আদর্শে নানাস্থানে সাধারণে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে সেবাকার্য্য করিতে-ছেন। সম্প্রতি আমরা "কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের" রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসারে জীবন গঠন করা উদ্দেশ্যে ইহা সন ১৩১৩ সনে স্থাপিত। গত বৎসর পর্য্যন্ত মোট আয় ৬৬ মণ চাউল ও ২৩৮৲ টাকা; ব্যয় ৬৬ মণ চাউল ও ২২৭৲ টাকা। মজুত ১১৲ টাকা। আশা করি, সাধারণে এরূপ সদুদ্দেশ্যে সহানুভূতি দেখাইবেন।

বংবাজার রামকৃষ্ণ অনাথভাণ্ডারসমিতি—৫ম বর্ষ (১৯০৯) কার্য্য বিবরণী পাঠে জানা গেল উক্ত বর্ষে ১৯টী অনাথ সমিতিভুক্ত হইয়াছে এবং ৫টী নিরা-শ্রয় পরিবার ও ৩৫ জন দুঃস্থ বিধবাকে নিয়মিত রূপে মাসিক সাহায্য করা হইয়াছে। মোট আয় ৬১৩১৯ পাই, ব্যয় ১৬৯৭৸৵০ আনা, মজুত ৪৪৩৩৸৵৯ পাই।

ইছাপুর অনাথসেবাভাণ্ডার—স্থাপিত বৈশাখ ১৩১৬। উক্তবর্ষে মোট আয় ৩৭২৸/১২৷; ব্যয় ২৮০৸১০; মজুত ৯২/২৷। উদ্যম বেশ প্রশংসনীয়।

রাজকুমারীকুষ্ঠাশ্রম, বৈদ্যনাথ, দেওঘর—১৯০৯ সনের কার্য্য-বিবরণী পাঠে দেখা গেল, উক্ত বর্ষে ৫০ জন কুষ্ঠরোগী আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সেবার জন্য একটী পৃথক্ ঘরের আবশ্যক হওয়াতে, আশ্রম সাধারণের সাহায্য আবেদন করিয়াছেন। আশা করি, সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত নিরাশ্রয় নারায়ণ-গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ৩২,৪৪১৶১৷ পাই; ব্যয় ২৫৭১/১। পাই; মজুত ২৯,৮৭০৵০ আনা। আমাদের মন্তব্য এই যে, এই টাকা দ্বারাই স্ত্রীলোকদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ অথবা আশ্রমে অধিক পুরুষ রোগীর স্থান দান হইতে পারে।

সমাজ—১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩১৭ সাল)—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম্ এ সম্পাদিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। ৪ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি, ৪০ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত "বৌদ্ধধর্ম্ম" একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে এই প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যতটা বাহির হইয়াছে, ততটা আমাদের বেশ লাগিয়াছে। "ব্রহ্মের লক্ষণ" উত্তম রচনা। "সাংখ্যদর্শন" বেশ হইতেছে। "শূদ্র-শক্তির ক্রমবিকাশে" পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত" হইতে ভাব গৃহীত। মহাপুরুষগণের ভাব গ্রহণ করা খুব ভাল, কিন্তু গ্রহীতার উচিত উহা স্বীকার করা; উহা না করা গ্রহীতার পক্ষেই অহিতকর। এই প্রবন্ধে গীতা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোকে ভ্রম থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় অনূদিত বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ বঙ্গভাষায় একটী অমূল্য রত্ন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী সারদানন্দ।

ঠাকুরের গুরুভাব ও মথুরানাথ।

(৪)

এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৬ দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহা ত আছেই, তাহার উপর আবার 'বাবা' এ কয়দিন মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মার নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আবদার অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য নৃত্যাদি চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব্ব আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মার আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মার আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য সাত্ত্বিক-ভাব-প্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে। দালান জম্ জম্ করিতেছে।—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটীর সর্ব্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি ঘর দ্বার ও মার প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপর্য্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্যভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনীস সকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্য সত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন! কাজেই তুষারমণ্ডিত-হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্য্যে সাধু তপস্বীর গৈরিক বসন যে শান্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণী কোলে স্তনপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাখা সৌন্দর্য্যের বিস্তার করে, সুন্দর

মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুর বাবুর মহা-ভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ। পূজা-সংক্রান্ত নানা কার্য্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না।

দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া 'বাবার' ও জগন্মাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাত্রিক হইবে। 'বাবা' এখন অন্দরে বিচিত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন! কথায় চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ, যেন তিনি জন্মে জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দাসী বা সখী। জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ মন, সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব, মার সেবার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবন ধারণ। ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি, চক্ষের চাহনি হাত পা নাড়া অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত হুবহু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়, পরিধানে মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন—কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ! ঠাকুরের রূপ তখন তখন বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত—এমন সুন্দর রং ছিল; ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত! ঠাকুরের আত্মীয়দের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্ট-কবচখানি তখন সর্ব্বদা ধারণ করিতেন, তাহার সোনার রঙে ও গায়ের রঙে যেন মেশামিশি হইয়া এক হইয়া যাইত। ঠাকুরের নিজমুখেও শুনিয়াছি—"তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে, লোকে চেয়ে থাক্‌ত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাক্‌ত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত! লোকে চেয়ে থাক্‌ত বলে একখানা মোটা চাদর সর্ব্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাক্‌তুম, আর মাকে বলতুম, 'মা তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে,' গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা'; তবে কতদিন পরে উপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময়ে প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর তিন চারি মাস কাল

জন্মভূমি কামারপুকুরে কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে মাতুলালয় শিওড় গ্রামেও যাইতেন। ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এই অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্ব্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিতেন। হৃদয়ের বাটীই শিওড় গ্রামে ছিল।

কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের দুটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত! প্রত্যূষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর পাট ঝাট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুয্যে-দের বাড়ীতে আসিয়া বসিতেন ; এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তায় এক আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভাল মন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইঁহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া, কখন কখন রঙ্গ করিয়া বলিতেন—'শ্রীবৃন্দাবনে নানা ভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হত, পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফির্‌তেন, তখন গোধূলি-মিলন, তার পর রাত্রে রাসে মিলন—এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, হঁ্যাগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?' তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রন্ধনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। অপরাহ্নে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্নেই আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইত। এই রূপে সমস্ত দিন রথ-দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পাল্কি, গাড়ী ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাই-বার জন্য পাল্কি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া,হস্তে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পাল্কিতে উঠিতে আসিলেন। দেখেন, রাস্তায় পাল্কির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হৃদু এত ভিড় কিসের রে?'

হৃদয়—'কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকেদের দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখ্‌তে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখ্‌তে এসেছে।'

ঠাকুর—আমাকে ত রোজ দেখে, আজ আবার কি নূতন দেখ্‌বে?

হৃদয়—এই চেলি প'রে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোট দুখানি লাল টুকটুকে হ'লে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি?

তাঁহার সুন্দর রূপেই ইহারা আকৃষ্ট শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন, হায় হায় এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না!

রূপে বিতৃষ্ণা ত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। বলিলেন—

'কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেই খানেই ত লোকে এই রকম ভিড় করবে?'—বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড় চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সে দিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না। হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ! আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল!—কি মাজা ঘসা, আর্শি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স পোমেডের ছড়াছড়ি, আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'হাড় মাসের খাঁচাটার'

উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার হুড়াহুড়ি! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্র ভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা—দুই কি এক কথা হে বাপু? যাক্, আমরা পূর্ব্ব কথাই বলি।

জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙ্গে না! মথুর বাবুর পত্নী ঠাকুরকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ভাবিলেন—করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে। আর 'বাবা'ও ত ভাবে বিহ্বল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার ত ঐরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর পড়িয়া যাইয়াও হুঁস হয় নাই—পরে সে ঘা কতদিনে কত কষ্টে সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিভ্রাট হয়—তখন উপায়? কর্ত্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনা সকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কাণের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, 'বাবা চল,মার যে আরতি হইবে, মাকে চামর করিবে না?'

ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্ত্তি ও ভাবে মন তাঁহার সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সকল বস্তু ব্যক্তি ও ভাবের সম্বন্ধ হইতে তাঁহার মন যতই কেন দূরে যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্ত্তির নাম বা ঐ মূর্ত্তির ভাবের অনুকূল কথা কয়েক বার ঠাকুরের কাণের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে,অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের, ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাঁহারা কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আরও সহজে একথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।

মথুর বাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্দ্ধ বাহ্যদশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা ঠাকুর-দালানে পৌঁছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামর-হস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুর বাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্র বস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।

আরতি সাঙ্গ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় মথুর বাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষদিগের নিকট আসিয়া বসিলেন, ও নানা ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া সকলের চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুর বাবু কার্য্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায় কথায় তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?' মথুর বাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন—'তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মত কাপড় চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।' এই বলিয়া মথুর বাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'তাইত বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চিনে কার সাধ্য? দেখনা, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্রে থেকেও তাঁকে আজ চিন্‌তে পারলুম না!'

*   *   *   *

সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা

সারিয়া লইতেছে, কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমা বিসর্জ্জন। মথুর বাবুর বাটীর সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব—যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিশুদ্ধ আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদ-ছায়া সর্ব্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ্য ঈশ্বরবিরহের সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব আমাদের হৃদয়ও বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে! মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই, আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে কর্ম্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেক বার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।

বাহিরে মথুর বাবুর কিন্তু অতকার কথা এখনও ধারণা হয় নাই। তিনি পূর্ব্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে আনিয়া এবং বাবার অলোক-সামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য কৃপাবলে তিনি যে আজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন।—বাহিরে কি হইবে না হইবে, তাহা তখন খোঁজে কে? খুঁজিবার আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপে দিন কাটিবে এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, এইবার মার বিসর্জ্জন হইবে, বাবুকে নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।

কথাটা মথুর বাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হুঁস হইল—আজ বিজয়া দশমী! আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ মাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—কেন? বাবা ও মার কৃপায় আমার ত কিছুর অভাব নাই। মনের আনন্দে যেটুকু অভাব ছিল, তাহা ত বাড়ীতে মার শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গিতে পারিব না। মার বিসর্জ্জন, মনে হলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতে-

ছেন, বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মার বিসর্জ্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি মাকে বিসর্জ্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জ্জন দেয় ত বিষম বিভ্রাট হইবে—খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইতে পারে।' এই বলিয়া মথুর বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক্!

তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতর যাঁহাদের সম্মান করিতেন, তাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। তাঁহারাও যাইলেন, বুঝাইলেন কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর করিতে পারিলেন না। বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, 'কেন? আমি মার নিত্যপূজা করিব। মার কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জ্জন দিব?' কাজেই তাঁহারা আর কি করেন বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভাল রকম জানা ছিল। সকলেই জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জ্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নির নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌছিল; তিনি ভয়ে ভয়ে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, 'বাবা' ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে? বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে?

ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ওঃ—এই তোমার ভয়। তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জ্জন দিলেই

বা তিনি যাবেন কোথায় ? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে। এ তিন দিন বাহিরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে ব'সে তোমার পূজা নেবেন।”

কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায় ছিল, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন ! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে— তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন ; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত, এবং কথাটা গুটাইত, তাহার ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া ! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও—‘কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস্ ? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক্ ঠিক্ সত্য বুঝতে পারবে বলে।’ এইরূপে স্পর্শমাত্রেই, অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখনিসৃত হইয়া হৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার অন্য কোন সময়ে চেষ্টা করিব। এখন মথুর বাবুর কথাই বলিয়া যাই।

ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া, ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে কোনরূপ দর্শনাদি হইয়া হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান—দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল

ছটায় শিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের ভাব দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা আপনি খসিয়া যায়।*

* * * * *

মথুরের ভক্তিবিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটীর সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ, যথা হৃদয় প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া ইত্যাদি সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া দেখিয়াছিলেন, ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক কিছুতেই ভুলেন না। বাহ্যিক ভাব-ভক্তির কপটাচরণও ইঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না! আর নরহত্যাদি দুষ্কর্ম্ম করিয়াও মন মুখ এক করিয়া যথার্থ সরলভাবে যদি কেহ ইঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ লক্ষ্য চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তিবলে তাহার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়!

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং তাঁহার ভাবসমাধিতে অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, 'বাবা ইচ্ছা-মাত্রেই ও সকল করিয়া দিতে পারেন। কারণ, শিব বল, কালী বল, ভগবান্ বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল, সবই ত উনি নিজে ?—তবে আর কি। কৃপা করিয়া কাহাকেও নিজের কোন মূর্ত্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি ?' বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের দর্শন লাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছে, তাহা-দেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত! সকলেরই মনে হইত উঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়; উনি ইচ্ছামাত্রেই ধর্ম্মজগতের সমস্ত

* ঠাকুরকে লইয়া মথুরের জীবনের উপরোক্ত ঘটনা দুইটি এক বৎসরের শারদীয় পূজার সময় ঘটিয়াছিল বা ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের জানা নাই; জানিবার এখন উপায়ও নাই বলিয়া বোধ হয়। তবে ঠাকুরের এবং অন্যান্য লোকের কথায় ঐ বিষয়ের যে চিত্র আমাদের মনে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া গেল।

সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পূতচরিত্রবলে একজনের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন ত অনেকের প্রাণে! উহা কেবল এক অবতার পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ নহে। আর এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, "আমার অদর্শনের পর অনেক ভণ্ড 'আমি অবতার, আমি দুর্ব্বল জীবের শরণ ও মুক্তিদাতা' বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না *।"

মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয়, তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।' ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন, সেই রূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, 'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই ত বেশ আছিস্, এদিক্ ওদিক্—দুদিক্ চলছে? ও সব হ'লে এদিক্ (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয় আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে—তখন কি করবি?

ও সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে না ছোড়-বান্দা—বাবাকে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ বুঝানয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখ্‌লে শুন্‌লে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল। ঠাকুর তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কি না? বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ান, পরাণ ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধা ভালবাসাটাকে ছোট বলে দেখত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝাতে লাগ্‌ল— 'তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে অমন কেন করছ? জান ত, তিনি ভগবান্, সর্ব্বত্র আছেন; তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নাই, এটা ত হতে পারে না। অমন করে হা হুতাশ না করে

* ঈশা।

একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি, দেখবে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্ব্বদা রয়েছেন,—ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল -‘উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ কি কথা বল্লে! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি মুনির মত জপ তপ করে তাকে পেয়েছি? আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি, গুঁজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি—সব করেছি, তাকে আবার ধ্যান করে ঐসব কর্‌তে যাব? যে মন দিযে ধ্যান জপ করব, সে মন আমাদের থাক্‌লে ত তা দিয়ে ঐ সব করব! সে মন যে অনেক দিন হল, কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং বুদ্ধি ক’রে জপ করব?’—উদ্ধব ত শুনে অবাক্! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু ব’লে প্রণাম ক’রে চলে এল! এতে দেখ্ না, ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত কি তাঁকে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক, দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।”

ইহাতেও যখন মথুর বুঝিলেন না তখন ঠাকুর বলিলেন, ‘তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় কর্‌বেন।’

তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন—“আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিযে দিচ্চে। আর বুক থর্ থর্ করে কাঁপচে। আমাকে দেখে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে পড়ে বল্লে, ‘বাবা, ঘাট্ হয়েছে! আজ তিন দিন ধ’রে এই রকম, বিষয় কর্ম্মের দিকে চেষ্টা কর্‌লেও কিছুতে মন যায় না! সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে। বল্লুম, কেন? তুই যে ভাব হ’ক, বলেছিলি। তখন সে বল্লে, ‘বলেছিলুম, আনন্দও খুব আছে; কিন্তু হলে কি হয়, এ দিকে যে সব যায়। বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ও সব কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।’ তখন আমি হাসি আর বলি, তোকে ত এ কথা আগেই বলেছি? সে বল্লে, ‘হাঁ বাবা; কিন্তু তখন কি অত শত জানি যে, ভূতের মত এসে ঘাড়ে চাপ্‌বে? আর তার গোঁ-য়ে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে? ইচ্ছা কর্‌লেও কিছু করতে পারব না!’ তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি!” বাস্তবিক ভাব সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে—উহাকে রক্ষা করিতে পারে

কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পেছ্‌টান থাকিতে উহা পায়া অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের পথিককে শাস্ত্র সে জন্যই গোড়া থেকে নিবাসনা হইতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশু'—একমাত্র ত্যাগ বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হক্ মান্ হক্ ইত্যাদি বাসনার রাশি গজ্ গজ্ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না। আচার্য্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন—

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূণঃ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রাহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্যবেগাৎ॥

বিবেকচূড়ামণি।

যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া, ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্ব্বক অতল জলে ডুবাইয়া দেয়।—বাস্তবিক, কতই না দৃষ্টান্ত এইরূপ, আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি! কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন; একদিন কয়েক জন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। ইঁহাদের পূর্ব্বে কখন আসিতে আমরা দেখি নাই। আসিবার কারণ, সঙ্গী যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে ঠাকুরের মতামত শ্রবণ করিবেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল।

যুবকটিকে দেখিলাম—বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে, আর ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্প, পুলক ও দুনয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল, না কৃশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সুশ্রী ও সুগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে—একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই; এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম—হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উত্তেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবান্ লাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমে গড়াগড়ি! আজ কয়েক দিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যে সকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই! গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে 'ভব-রোগ বৈদ্য' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভের পূর্ব্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈদ্য, এবং ধর্ম্মজগতে যে ভাবে মানবমনে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া, লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অনুকূল হইলে, উহা যাহাতে সাধকের মনে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুঝিলে, তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, একথা পূর্ব্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি—পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন—'তুই এখন কয়েক দিন কাহারও হাতে খাস্ নি, নিজে রেঁধে খাস্। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে পর্য্যন্ত খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই নষ্ট হয়ে যায়! পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নাই!'—গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন—'ও যে তোমার হরি বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাক্‌বে, ও থাকা চাই, তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হ'ক কিছু খেও'—জনৈক ভক্তের বাহ্যিক শৌচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অনুরাগের জন্য শরীর ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন—'লোকে যেখানে মল মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা প'রে ঈশ্বরকে ডেকো।' একজনের সংকীর্ত্তনে উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতে-ছেন—'শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন, ঠিক্ ঠিক্ ভাব হলে কখন এমন হয়? ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়, ও কি? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া) এ সব কেমন ভাব জান? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্চে; মনে হচ্চে, যেন কতই দুধ, এক কড়া; তার পর নামিয়ে দেখ, একটুও নাই, যেটুকু দুধ ছিল সব কড়ার

গায়েই লেগে গেছে! একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন—'যাঃ শালা, খেয়ে লে, পরে লে সব করে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম্ম কচ্চিস্ বলে করিস নি।'—ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব!

যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন—"এর খুব অবস্থা হয়েছে, মহাভাবের * পূর্ব্বাভাষ! কিন্তু এ অবস্থা এর থাক্‌বে না, রাখ্‌তে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাক্‌বে না! একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে!" যাহা হউক আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল—ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে—যুবকটীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে! সংকীর্ত্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, হায় হায়—দুর্ভাগ্যক্রমে ভাবাবসাদে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্ব্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং করিতে শিক্ষা দিতেন।

* * * * *

মথুরের যেমন 'বাবার' নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, 'বাবারও' আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন, অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। পরা বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ-নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের এ কথা আমরা পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব অতুল রাজবৈভব উপভোগ করিয়া বা কৌপিন-মাত্রৈক সম্বল ও ভিক্ষান্নে উদরপোষণ করিয়া, ইতর সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের

---

*বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারাণীর যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ঊনবিংশ প্রকার অষ্টসাত্ত্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা,—হাস্য, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি—বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই 'মহাভাব' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহা জীবের হওয়া অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।

অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও, কিছুতেই বিচলিত হন না, সর্ব্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন।* জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার পুরুষদিগের ঐরূপে সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে!

কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন জিনীসের আবশ্যক হইলে, অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল! সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া 'এটা কেন হল বল দেখি', 'ওটা তোমার মনে কি হয় বল দেখি' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা ছিল! তাহার পয়সার যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া অতিথ,কাঙাল, সাধু, সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত—এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।

---

* ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিতঃ
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥—বিবেকচূড়ামণি।

মুক্ত ব্যক্তি কখন মূঢ়ের ন্যায়, আবার কখন পণ্ডিতের ন্যায়, আবার কখন বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখন পাগলের ন্যায়, আবার কখন ধীর স্থির বুদ্ধিমানের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার কখন বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য্য প্রভৃতির জন্যও যাচ্ঞারহিত হইয়া অজগরের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহুমান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিত ভাবে থাকেন। এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।

মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৺মা কালী ও ৺ রাধাগোবিন্দের ভোগ-রাগাদির পর বড় থালে করিয়া এক থাল প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক থাল ফল মূল মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে, ও ঠাকুর নিজে ও তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগ-রাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত।

বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুরবাড়ীতে বেশ একটি ছোট খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানাপ্রকারের ফল মূল ভোগ নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অদ্য যোগানন্দ স্বামীজি প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্ব্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রকাশিত হইত। যথা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে অথবা ৺কালীপূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেন; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনেই হইত না! বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্ব্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানাপ্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ এক ঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিপূর্ণ তাঁহার

মুখমণ্ডল ও তাহার পূর্ব্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে, ইঁহার কোন অসুস্থতা আছে!

অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর ন্যায় মার নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন ও সে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য মানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব্ব দিব্য ভাব অনুভব করিতেছেন। মার পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় ৮৷৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারি ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাতাঞ্জি মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে, সেখান হইতে সকলকে যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হই-তেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না। রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। 'কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?'—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন! এই রূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না, তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাতাঞ্জির নিকট আসিয়া উপস্থিত! বলিলেন—"হ্যাগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নাই কেন? ভুল হল নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে, বড় অন্যায় কথা"—ইত্যাদি। খাতাঞ্জি মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'এখনও আপনার ওখানে পৌঁছায় নি? বড় অন্যায় কথা। আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।'

স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সৎকুলে বনেদি সাবর্ণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুরবাড়ীর খাজাঞ্জি, কর্ম্মচারী, পূজারি প্রভৃতিদের একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত

না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতু কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন ; এবং রাসমণির বাগানের এক প্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ী বলিলেও চলে। কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া আসার বেশ সুবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি ? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়! কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে ? অতএব 'প্রসাদী ফলমূলাদি কেন আসিল না' বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলেন—'তা নাই এল মশায়, ভারি ত জিনীস। আপনার ত ও সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই ত খান না—তখন নাই বা দিলে ?' ইত্যাদি। তার পর ঠাকুর যখন তাঁহার ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরেই নিজে খাতাঞ্জিকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগিন ভাবিতে লাগিলেন—'কি আশ্চর্য্য! ইনি আজ সামান্য ফল মূল মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখিনি, তাঁর আজ এ ভাব কেন ?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—'বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে ত ? তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নহিলে নিজে ওসব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন ? বংশানুগত অভ্যাস!'

যোগিন বা যোগানন্দ স্বামীজি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'কি জানিস্, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধু সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদী জিনীস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায় ; ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ীর বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয় ? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেশ্যা আছে ; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়, এই সব করে! রাসমণির যে জন্য দান,

তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে ব'লে এত করে ঝগড়া করি!' যোগিন্ স্বামীজি শুনিয়া অবাক্! ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!

এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মথুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মথুরের ভালবাসার ঘনিষ্ঠতায় শেষে 'বাবা'-অন্ত প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতু কৃপার ফলে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তার পর ঠাকুরের বালকবৎ অবস্থাও মথুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সংসারের সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কার না মন আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে—পাছে তাহার কোনও অনিষ্ট হয় বলিয়া কাহার নয়ন ও হস্ত না ভয়চকিত হইয়া তাহার অকারণ-মধুর চেষ্টাদি দেখিতে ও আগুলাইতে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে ত আব কৃত্রিমতা বা ভাণের লেশ মাত্র ছিল না! যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত! কাজেই তেজীয়ান্ বুদ্ধিমান্ মথুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতঃই যে একটা চেষ্টার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব মথুর একদিকে যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে আবার তেমনি বাবাকে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবের বাবাতে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, মথুর বোধ হয় এইরূপ একটা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে, এমন কি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও, তাঁহাকে, বাবাকে রক্ষা করিতে হইবে; আর মানব-চক্ষুঃ ও শক্তির অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম পারমার্থিক ব্যাপারে বাবাই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব এককালেই দেব ও মানব, সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ, মহাজটিল বিপরীত ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত বাবার প্রতি মথুরের ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর বাবা মথুরের উপাস্য হইলেও, বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরের ঘনমূর্ত্তি সেই বাবাকেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানাকথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত! বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের, ভালবাসায়, বেশ আসিয়া যোগাইত! মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দ্দেশে গমন করিয়া বাবা একদিন চিন্তায় মুখখানি স্তব্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, 'একি-

ব্যারাম হল বল দেখি? দেখ্‌লুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল! শরীরের ভিতরে এমন ত কারুর পোকা থাকে না। আমার একি হল?' ইতিপূর্ব্বেই যে বাবা হয়ত গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল অপূর্ব্ব সরল ভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই বাবাই এখন বালকের ন্যায় নিষ্কারণ ভাবিয়া অস্থির! মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, 'ও ত ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় ক'রে কুকাজ করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?' বাবা শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ; ভাগ্‌গিস্ তোমায় একথা বল্লুম, জিজ্ঞাসা করলুম!' বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় একদিন বাবা বলিলেন—'দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আস্‌বে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেম ভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়া মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয় নি—রেখেছে! তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখিছি, বল দেখি?'

মথুর বলিলেন, 'মাথার ভুল কেন হবে বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্য্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে। এখনও তারা সব দেরী করচে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি!'

বাবাও বুঝিয়া গেলেন, মা ও সব ঠিক দেখাইয়াছেন! বলিলেন—'কি জানি বাবু, কবে তারা সব আস্‌বে; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।'

রাণী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুর বাবু তাঁহাদের মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়াকে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয় লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাঁধে, এজন্য বুদ্ধিমতী রাণী স্বয়ং বর্ত্তমান

থাকিতে থাকিতে প্রত্যেকের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ঐরূপে বিষয় ভাগ হইবার পরে একদিন মথুর বাবুর পত্নী বা সেজগিন্নী অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া সুন্দর শুষনি শাক হইয়াছে দেখিযা তুলিয়া লইযা আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত! না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয় সেজগিন্নী লইয়া গেল, বড় অন্যায়। না বলিয়া ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয়, তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনীসে ওরূপ লোভ করা কেন বাবু?—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাণীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী পড়িয়াছে, তাঁহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নী যেন কতই অন্যায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—'তাইত বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।' এমন সময় সেজগিন্নীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন—'বাবা, একথাটিও কি তোমার ওকে বলে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় ব'লে, লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম, আর তুমি কি না তাই বলে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!' এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন! তখন ঠাকুর বলিলেন—'তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ্ জোগ্ হয়ে গেল, তখন ওরূপে না ব'লে নেওয়াটা ভাল নয়, তাই ব'লে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা পাড়া করুন।' রাণীর কন্যারা বাবার কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল উদার স্বভাব!

একপক্ষে বাবার এইরূপ বালকভাব! অপর দিকে আবার অন্য জমীদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া বাবাকে ধরিলেন, 'বাবা রক্ষা কর।' বাবা প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে এসে বলবি 'রক্ষা কর'! আমি কি করতে পারি রে শালা? যা, নিজে বুজ্‌গে যা; আমি কি জানি?" তার পর মথুরের নির্বন্ধে বলিলেন, 'যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।' বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল!

ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না বলা যাইতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী বাবার কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু—ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল আর যাহা কিছুই বল। কাজেই বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচলা ভক্তি বিশ্বাস করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর,—সুচতুর হিসাবী বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে,—একটু কৃপণও ছিলেন। কিন্তু বাবার বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয় দেখিয়া তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। ল্যাংটা বাবাকে যাত্রা শুনাইতে সাজ্ গোজ্ পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্য মথুর, তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাক্ করিয়া একেবারে এক শত বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। বাবা যাত্রা শুনিয়া যাইতে যাইতে যেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি হয়ত সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন! মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই! 'যেমন বাবার উঁচু মেজাজ, তেমনি তাহার মতই প্যালা দেওয়া হইয়াছে.' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া দিলেন! ভাবমুখে অবস্থিত বাবা—যিনি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন—তাঁহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয়ত ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন! পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয়ত গায়ের শাল ও পরণের বহুমূল্য কাপড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাবাম্বর ধারণ করিয়া নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন! মথুর তাঁহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বাবাকে বীজন করিতে লাগিলেন।

কৃপণ মথুরের বাবার সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! মথুর বাবাকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থ পর্য্যটনে যাইয়া বাবার কথায় ৺কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন, আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন! বাবাকে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় বাবা কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না! বলি-

লেন—'একটি কমণ্ডলু দাও!' বাবার ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।

ফিরিবার কালে ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দ্রারিদ্র্য দেখিয়া বাবার হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন—'তুমি ত মার দেওয়ান ; এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেট্‌টা ভ'রে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুর প্রথম একটু পেছপাও হইলেন। বলিলেন—'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হইয়া গিয়াছে, আর এও দেখছি অনেকগুলি লোক, সঙ্গে অত টাকাও নাই, এদের খাওয়াতে দাওয়াতে গেলে আবার টাকা আনাতে হবে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন—'তবে তোমরা সব ফিরে যাও, আমি এদের কাছেই থাকব ; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।' এই বলিয়া বাবা বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন! তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুরেরও তখন করুণা হইল। তখন কলিকাতা হইতে টাকা আনাইয়া বাবার কথামত সকল কার্য্য করিলেন। বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ফিরিলেন। শুনিয়াছি, মথুরের সহিত রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমীদারীভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে যাইয়া, গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।

গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে এক সময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, 'মা আমাকে শুক্‌নো সাধু করিস্ নি, রসে বশে রাখিস্', মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ, সেই প্রার্থনার ফলেই ৺জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে

কি এতকাল এ সম্বন্ধ এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখন থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, এরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকালে কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতু ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না! জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজ-মুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহা ভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হল মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!' ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন—'কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি। ভোগবাসনা ছিল!' এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

ক্রমশঃ।

ভক্তিরহস্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। কাহাকেও কি ভয় দেখাইয়া ভালবাসান যায়? হরিণ কি কখন সিংহকে ভালবাসে?—না—মূষিক বিড়ালকে ভালবাসে? না—দাস প্রভুকে ভালবাসে? ক্রীতদাস-গণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভাণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কি উহা ভালবাসা? ভয়ে ভালবাসা কবে কোথায় দেখিয়াছেন? যদি কোথাও দেখা যায়, তবে উহা ভাণমাত্র জানিতে হইবে। যতদিন লোকে ভগবান্‌কে মেঘ-পটলারূঢ়, এক হস্তে পুরস্কার ও অপর হস্তে দণ্ডধারী বলিয়া চিন্তা করে, তত দিন ভালবাসা আসিতে পারে না। ভালবাসা থাকিলে কখন ভয়ের ভাব আসিবে না। ভাবিয়া দেখুন—একজন তরুণী রমণী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—অমনি তিনি সাম্‌নে যে বাড়ী দেখিতে পাইলেন, তথায়ই গিয়া আশ্রয়

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রেমে ভয়ের লেশমাত্র নাই।

লইলেন। মনে করুন, পর দিনও তিনি ঐরূপে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সঙ্গে ছেলে রহিয়াছে। মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া ছেলেটাকে আক্রমণ করিল—তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি। তিনি যে তখন তাঁহার ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ বরদাতা বা দণ্ডদাতা- ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রকৃত প্রেমিক কখন সে চিন্তায় আকুল হয় না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন কার্য্যাবসানে গৃহে আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে? সে তাঁহাকে বিচারপতি কিম্বা পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না—সে তাঁহাকে তাহার স্বামী বলিয়া, তাহার প্রেমাস্পদ বলিয়া দেখিয়া থাকে। তাঁহার ছেলেরা তাঁহাকে কি ভাবে দেখে? তাহাদের স্নেহময় পিতা বলিয়া দেখে, পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপ ভগবানের সন্তানেরাও কখন তাঁহাকে পুরস্কার বা দণ্ডবিধাতা বলিয়া দেখেন না। বাহিরের লোকে, যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই, তাহারাই তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে। এ সব ভয়ের ভাব—ভগবান্ বরদাতা বা দণ্ডদাতা এ সব ভাব—ছাড়িয়া দিন্। অবশ্য যাহারা ঘোরতর-বর্ব্বর-প্রকৃতি, তাহাদের পক্ষে হয় ত ইহার কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে। অনেক লোকে, খুব বুদ্ধিমান্ লোকেও ধর্ম্মজগতে বর্ব্বরতুল্য—সুতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্ম্মসাক্ষাৎকারের আর বিলম্ব নাই, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ও সব ভাব ছেলেমানুষী মাত্র, আহাম্মকি মাত্র। এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ভয়ের ভাব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ—প্রেমই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর। প্রেম সর্ব্বদাই উচ্চতম আদর্শস্বরূপ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করিয়া যায়, যখন সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে বুঝিতে থাকে যে, প্রেমই সর্ব্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে অনেক সময় দেখিতে পাই যে, পরমা সুন্দরী রমণী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভাল বাসিতেছে;

আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরম সুন্দর পুরুষ অতি কুৎসিতা রমণীকে ভালবাসিতেছে। তাহারা কিসে আকৃষ্ট হইতেছে? বাহিরের লোকে সেই স্ত্রী বা পুরুষকে কুৎসিত বলিয়াই দেখিবে, কিন্তু প্রেমিক তাহা কখন দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। ইহা কিরূপে হয়? যে রমণী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে, সে যেন তাহার নিজ মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া ঐ কুৎসিৎ পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে, তাহা নহে, সে তাহার নিজ আদর্শের পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটী যেন উপলক্ষ মাত্র, আর সেই উপলক্ষের উপর সে তাহার নিজ আদর্শকে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার প্রেমেই একথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভাইভগিনীগুলির রূপ যে কিছু অসাধারণ রকমের তাহা নহে, কিন্তু আমাদের ভাইভগিনী বলিয়াই তাহা-দিগকে আমরা পরম সুন্দর ভাবিয়া থাকি।

এই সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, সকলেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই বহির্জ্জগৎ কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বহিঃপ্রক্ষিপ্ত মাত্র। একটা শামুকের খোলার ভিতর একটা বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর একটা উত্তেজনা উৎপাদন করিল। ঐ উত্তেজনায় উহার মধ্য হইতে রস নির্গত হইয়া সেই বালুকণাকে আবৃত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে পরম সুন্দর মুক্তার উৎপত্তি। আমরাও ঠিক এইরূপ করিতেছি। বহির্জ্জগৎ বালুকণার মত আমাদের চিন্তার উপলক্ষস্বরূপমাত্র—উহাদের উপর আমরা আমাদের নিজ ভাব প্রক্ষেপ করিয়া এই সব বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে একটা ঘোর নরকরূপে দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ ভাল লোকে ইহাকে পরম স্বর্গ বলিয়া দেখে। প্রেমিকেরা এই জগৎকে প্রেমপূর্ণ বলিয়া এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহাতে বিবাদ বিরোধ বই আর কিছু দেখিতে পায় না, আবার শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইহাতে শান্তি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না, আর যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না।

সুতরাং দেখা গেল, আমরা সর্ব্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শেরই উপাসনা করিয়া থাকি, আর যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আমরা আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করিতে পারি, তখন আমাদের তর্ক যুক্তি সন্দেহ সব দূর হইয়া যায়। তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না, এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? আদর্শ ত কখন নষ্ট হইতে পারে না, কারণ, উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিব, তখনই আমি ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারি, কিন্তু আমি যখন একটীতে সন্দেহ করিতে পারি না, তখন অপরটীতেও করিতে পারি না। বিজ্ঞান আমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত, আকাশের স্থানবিশেষ-নিবাসী, খেয়ালানুযায়ী জগতের শাসনকারী, কয়েকদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারুক না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর এক সময়েই সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ দয়াময় হইতে পারেন কি না, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্ মানুষের পুরস্কারদাতা কি না, এবং তিনি আমাদের প্রতি ক্ষমতাবান্ ঘোর অত্যাচারী পুরুষের অথবা দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এ বিষয় লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই সমুদয় পুরস্কার-শাস্তির, ভয়সন্দেহ এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট, আর এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নহে?

কিসে অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে মিলাইতেছে? কিসে বড় বড় গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, একজন পুরুষ অপরের প্রতি, নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি, ইতরজন্তু ইতরজন্তুগণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—যেন সমুদয় জগৎটাকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে? ইহাকেই প্রেম বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। চেতন অচেতন, ব্যষ্টি সমষ্টি সকলেই এই জগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র সমুদয় বস্তুর পরিচালিকা শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণায়ই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বুদ্ধ, এমন কি, তির্য্যগ্জাতির জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার

প্রেমই সকলের মূলে।

প্রেরণায়ই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হয়। এই প্রেমের প্রেরণায়ই লোকে তাহাদের দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্য্য, সেই একই প্রেমেরই প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে। এই সব স্থলেও মূলে ঐ প্রেম—কিন্তু তাহার প্রকাশ বিভিন্ন। ইহাই জগতে সকলেরই একমাত্র পরিচালিকা শক্তি। চোরের টাকার উপর প্রেম—প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা প্রকৃত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ সমুদয় পাপ ও সমুদয় পুণ্য কর্ম্মের পশ্চাতেই সেই অনন্ত প্রেম রহিয়াছে। মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কেহ একটা ঘরে বসিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া নিউইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, আবার ঠিক সেই সময়েই সেই গৃহে আর একজন বসিয়া একজন বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুই জনে লিখিতেছে, কিন্তু যে যে ভাবে উহার ব্যবহার করিতেছে, সে তাহার জন্য দায়ী হইবে—আলোর কোন দোষ গুণ নাই। এই প্রেম সর্ব্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইনিই সমগ্র জগতের পরিচালিকা শক্তি—ইহার অভাবে জগৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

ক্ষুদ্র স্বার্থপর প্রেমই বিস্তৃত হইতে হইতে অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়।

'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে; কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে। কেহই সেই সেই বস্তুর জন্য সেই সেই বস্তুকে ভাল বাসে না, আত্মার জন্যই সেই সেই বস্তুকে ভাল বাসিয়া থাকে'। এমন কি, এই স্বার্থপরতা, যাহাকে লোকে এত নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাও সেই প্রেমেরই এক প্রকার রূপমাত্র। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, ইহাতে মিশিবেন না, কেবল এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলি, এই বিচিত্র নাটক—এক দৃশ্য অভিনীত হইল, আর এক দৃশ্য আসিতেছে—দেখিয়া যান, আর এই অদ্ভুত ঐক্যতান শ্রবণ করুন—সবই সেই একই প্রেমের বিভিন্ন রূপমাত্র। ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায়, ঐ 'স্ব' এর, ঐ 'অহং' এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং, একটা লোক বিবাহিত হইলে দুইটী হইল, ছেলেপুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার 'অহং' এর বিস্তৃতি হইতে থাকে, অব-

শেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্ব্বজনীন প্রেম—অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

এইরূপে আমরা পরাভক্তিতে উপনীত হই—ঐ অবস্থায় অনুষ্ঠান প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ের হইবেন? সমুদয় চার্চ্চ মন্দিরাদি ত তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় চার্চ্চ কোথায়, যাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি আপনাকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি যে অসীম প্রেমের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর কিছু সীমা আছে? যে সকল ধর্ম্ম এই প্রেমের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে ইহাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি, এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি, এই বিভিন্ন আসক্তি ও আকর্ষণময় জগতে সমুদয়ই সেই অনন্ত প্রেমেরই এক এক রূপ মাত্র—বিভিন্নজাতীয় সাধু মহাপুরুষ যাহা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তথাপি আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা উহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন—শেষে অতিশয় ইন্দ্রিয়পরতাসূচক শব্দগুলি পর্য্যন্ত তাঁহারা ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি * এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও নিম্নলিখিতভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা ও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। "হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়, আর সে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।" ইহাই প্রেমের উন্মত্ততা—এই অবস্থায় সব বাসনা লোপ হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন,—মুক্তি কে চায়? কে উদ্ধার হইতে চায়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্ব্বাণ পদের অভিলাষ করে?

আমি টাকাকড়ি চাই না—আমি আরোগ্য প্রার্থনাও করি না, আমি রূপযৌবনও চাহি না', আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিও কামনা করি না—

* বাইবেল ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে সলোমনের গীতি (Song of Slomon) দেখুন।

এই সংসারের সমুদয় অশুভের ভিতর আমার বার বার জন্ম হউক— আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু আমার যেন তোমাতে অহৈতুকী প্রেম থাকে। ইহাই প্রেমের উন্মত্ততা— পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতাবলিতে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের প্রেমই সর্ব্বোচ্চ, স্পষ্টাভিব্যক্ত, প্রবলতম ও মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের এই মত্ত ভালবাসা সাধু মহাপুরুষগণের উন্মত্ত প্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেম-মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান—তাঁহাদিগকে 'ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত পুরুষ' বলে। সকল ধর্ম্মের সাধু মহাপুরুষগণ যে প্রেমমদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, করিয়া যাহাতে নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চাহেন না— প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার আর এই পুরস্কার মানবের কি পরম লোভনীয়! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূর হয়, একমাত্র পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়। মানুষ তখন ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যায় আর সে যে মানুষ, তাহা ভুলিয়া যায়।

অদ্বৈতই প্রেমের চরমাবস্থা।

উপসংহারে বক্তব্য, আমরা দেখিতে পাই, এই সমুদয় বিভিন্ন সাধন-প্রণালী পরিণামে সম্পূর্ণ একত্বরূপ এক লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়। আমরা চিরকালই দ্বৈতবাদি ভাবে সাধন আরম্ভ করিয়া থাকি। তখন এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রেম উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্‌ও যেন মানুষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মানুষ পিতা, মাতা, সখা, নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ লইয়া ভগবানের উপর আরোপ করে আর যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়, তখন দেখা যায়, তোমার উপাসনা করিলেই আমার উপাসনা আর আমার উপাসনা করিলেই তোমার উপাসনা হইল। সেই অবস্থায় যাইলেই মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্ব্বোচ্চ ব্যাখ্যা পাইয়া থাকে। মানুষ

যেখান হইতে আরম্ভ করে, তাহার শেষও সেইখানে হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই তাহার আত্মপ্রেম ছিল—কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া ভ্রম হওয়াতে প্রেমকেও স্বার্থপরতা দুষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোকের প্রকাশ হইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানবিশেষে অবস্থিত পুরুষবিশেষ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তিনি তখন যেন অনন্ত প্রেমে পরিণত হইলেন। মানুষ স্বয়ং তখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। তিনি তখন ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্ব্বে তাঁহার যে সমুদয় বৃথা বাসনা ছিল, তিনি তখন তাহা সব পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, আর প্রেমের চরম শিখরে গিয়া তিনি দেখিতে পান, প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক—এই তিন একই বস্তু।

সম্পূর্ণ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

স্বামীজি এমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজ কয়দিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের ৺ বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এর বাড়ী তার বাড়ী ঘুরিয়াও বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজির কাছে আসিয়া দেখিল স্বামীজি ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন "চল্—আমার সঙ্গে যাবি"। বলিতে বলিতে স্বামীজি নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বামীজি উঠিলেন; গাড়ি দক্ষিণমুখো চলিল।

শিষ্য—মশায়, কোথায় যাওয়া হবে?

স্বামীজি—চল্ না—দেখবি এখন।

শিষ্যকে স্বামীজি কিছুই ভেঙ্গে বলিলেন না। বিডনষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া স্বামীজি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "তোদের দেশে মেয়েদের

লেখাপড়া শিখাবার জন্য তোদের কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হয়েছিস্, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—তোদের প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত কত্তে—তোরা কি কচ্ছিস্ ?"

শিষ্য—কেন মশায়, আজ কাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল কলেজ হয়েছে—কত এম্ এ, বি এ, পাশ করছে।

স্বামীজি—ও ত বিলিতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনে,তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে ? কিন্তু জানিস্, সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার যো নাই।

শিষ্য—আমাদের দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই। গবর্ণমেণ্টের statistics এ দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন)ও হবে না নিঃসন্দেহ।

স্বামীজি—তাইত বলছি ;—এমন না হলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে ? তোরা দেশে যে কয়জন লেখা পড়া শিখেছিস্—যারা ভাবী আশার স্থল—তোদের ভেতরও এ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। আমার মত কি জানিস্—কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈয়িরি কত্তে হবে। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass (জনসাধারণ)এর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরণে এসব কত্তে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) কত্তে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র কত্তে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা এদের শিক্ষার ভার নিবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ নীতিপরায়ণ কত্তে হবে। কালে যাহাতে এঁরা ভাল গিন্নী তৈয়িরি হন, তাই কত্তে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে আরও উন্নতি লাভ কত্তে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (কাজ করবার যন্ত্র) করে তুলে-

ছিস্। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হলো? এই মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass (আপামর সাধারণ)কে জাগাতে হবে; তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

বলিতে বলিতে গাড়ী কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজের কাছে এসেছে। স্বামীজি বল্‌ছেন "চোরবাগানের রাস্তায় চল্"। গাড়ী মোড় ফিরিয়ে যখন ঐ রাস্তায় যাচ্ছে, তখন স্বামীজি বলিলেন "মহাকালী" পাঠশালায় যাইবেন। তপস্বিনী মাতা (যিনি মহাকালী পাঠশালার স্থাপনকর্ত্রী) স্বামীজিকে তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। তখন ঐ পাঠশালা চোরবাগানে ৺ রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর কিছু পূর্ব্বদিকে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে স্বামীজিকে দর্শন করিয়া দুই চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাঠশালার কুমারীগণ ক্লাশে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্কুল একেবারে নিস্তব্ধ, কোন গোলমাল নাই। তপস্বিনী মাতা স্বামীজিকে সঙ্গে করিয়া এক ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজির অভ্যর্থনা করিলেন। তপস্বিনী মাতাজির আদেশে মেয়েরা প্রথমতঃ শিবের ধ্যান সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। তার পর কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় শিবপূজা হয়, মাতাজির আদেশে কুমারীগণ তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিলেন, স্বামীজি উৎফুল্ল নয়নে ঐ সকল দর্শন করিয়া একান্তমনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতাজি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীজির সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিলেন না, স্কুলের দুই তিনটী শিক্ষককে বলিলেন, তাঁহারা স্বামীজিকে সকল ক্লাস ভাল করে যেন দেখান। স্বামীজি সকল ক্লাস ঘুরিয়া আসিয়া মাতাজির সম্মুখে অবস্থান করিলে একজন শিক্ষিতা কুমারীকে ডাকান হইল। ইনি রঘুবংশ পড়েন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর চমৎকার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া ইনি স্বামীজিকে শুনাইলেন। স্বামীজি শুনিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, আর মাতাজির স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকল্পে অধ্যবসায় ও যত্নপরতা দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজি বলিলেন, "আমি ভগবতী জ্ঞানে এঁদের পূজা করিয়া থাকি, আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।"

স্বামীজি বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজি দর্শকদিগের

স্কুল সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিবার বহি (Visitor's book) খানিতে স্বামীজিকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজিও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজের মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। ঐ লিখিত বিষয়ের শেষ লাইনটী এখনো শিষ্যের মনে আছে। তাহা এই,—The movement is in the right direction"।

অভিবাদনান্তে স্বামীজি শিষ্যের সঙ্গে পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং আসিতে আসিতে কেবল স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেই শিষ্যের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজি—দেখ্‌না, এর (মাতাজির) কোথায় জন্ম—কেমন ত্যাগী—তবু তোদের হিতের জন্য আবার কেমন যত্নবতী। মেয়ে না হ'লে কি মেয়েদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখনুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হলো না। শিক্ষিতা বিধবা—ব্রহ্মচারিণীগণের উপরেই স্কুলের শিক্ষা দিবার ভারটা দেওয়া উচিত। একেবারে পুরুষ-সংশ্রব ত্যাগ চাই;—তবে তোদের দেশের চালে শিক্ষার প্রবর্ত্তনা হবে।

শিষ্য—কিন্তু মশায়, দেশে এখন গার্গী, খনা, লীলাবতীর মত মেয়ে মানুষ পাওয়া যায় কৈ, যারা এই কুমারীদের শিক্ষার ভার নিতে পারে?

স্বামীজি—দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নাই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশে পুণ্য ক্ষেত্র ভারতে এখনো যেমন মেয়েদের চরিত্র, সেবাভাব—স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও ত তেমন্ দেখলুম্ না। ওদেশে মেয়েদের দেখে আমার মেয়ে বলে ধারণাই হতো না—ঠিক্ যেন পুরুষ মানুষ বলে জ্ঞান হতো। ট্রাম চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসারি কচ্ছে! একমাত্র ভারতবর্ষে এসেই পুরুষ আর মেয়ে মানুষে তফাৎ বোধ হয়। তোরা এমন সব আধার পেয়েও এদের উন্নত কত্তে পার্‌লিনে! এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা কর্‌লিনে! এদের ঠিক্ ঠিক্ শিক্ষা দিতে পার্‌লে এরা ideal (আদর্শ) মেয়ে মানুষ হতে পারে। মাতাজি এ বিষয়ে চেষ্টা কর্‌ছেন।

শিষ্য—মশায় এতে আর কি হবে? এই মেয়েরা বড় হয়ে ত বে কর্‌বে, আর গিন্নী বান্নি হয়ে সাধারণ মেয়েদের মত হয়ে যাবে। এদের ভেতর ব্রহ্মচর্য্য ভাব দিতে পার্‌লে ত এরা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে যত্ন

করবে। তবে ত এরা আপনার প্রচারিত উচ্চ আদর্শ লাভ করতে পারতো।

স্বামীজি—তা কি একবারেই হয় রে বাপ্। সবই ক্রমে হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখন জন্মায় নি, যারা নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রেখে সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়। এই দেখ্না মেয়েকে এখনও একটু ডাগর হতে দেবেন না—৯।১০ বৎসর পেরুতে না পেরুতে বে দিয়ে ফেলবে—লোকভয়ে—সমাজভয়ে এখনো সকলে ভয় খায়। নতুবা এই যে সেদিন consent (সম্মতিসূচক) আইন্ করলে—তা তোদের সমাজের নেতারা লাখ লোক জড় করে চেঁচাতে লাগলো "আমরা আইন চাই না।" অন্য দেশ হলে লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বসে থাক্তো, আর ভাবতো আমাদের সমাজে এখনো এ হেন কলঙ্ক রয়েছে! আর তোরা কি করলি? গড়ের মাঠে জড় হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে গিয়ে বললি "আমরা এ আইন চাইনি"। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হলো?

শিষ্য—মশায়, সংহিতাকারগণ একটা না ভেবে চিন্তে কিছু আর বাল্য-বিবাহের অনুমোদন করেন নি! এর ভেতর একটা রহস্য অবশ্যই ছিল।

স্বামীজি—কি ছিল?

শিষ্য—অল্প বয়সে মেয়েদের বে দিলে, তারা স্বামিগৃহে এসে family institutions (কুলধর্ম্ম) গুলো ছেলেবেলা থেকে শিখবে, শ্বশুর-শ্বাশুরীর আশ্রয়ে থেকে ভাল গিন্নী তৈয়িরি হবে, এই সব। পিতৃগৃহে বয়স্থা মেয়েদের যেমন উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা, ছেলে বেলায় বে দিলে পিতৃকুলে কি পতিকুলে তেমন উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি বিকশিত হয়ে উঠে।

স্বামীজি—আবার অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিতা হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিগণ ক্ষীণজীবী হয়ে দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মে না। বিশেষতঃ তোদের অবরোধপ্রথায় মেয়েরা জগতের কোন উন্নতির খবর রাখে না। লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মিবে, তাতে দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা, তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য—তা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বড় করে বে দিলে তারা গৃহকার্য্যে তেমন মনোযোগী হতে পারে না—যেমন আপনাদের কল্‌কাতায় হয়েছে। শ্বাশুরীরা রাঁধবে আর বধূরা পায় আল্‌তা পরে বসে থাক্‌বে। আমাদের বাঙ্গাল দেশে এমন কখনো হ'তে পারে না।

স্বামীজি—ওরে, ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মত হচ্ছে—মেয়েদের আগে শিক্ষিত করা; তার পর সমাজ আপনা আপনি গড়ে উঠবে। বাল্য-বিবাহ উঠে যাবে, কি বিধবাদের বে দিতে হবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। তোদের কার্য্য হচ্ছে—সকলকে শিক্ষা দেওয়া, সেই শিক্ষার ফলে—তারা নিজেরাই কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সব বুঝতে পারবে, ও আপনারাই তা করা ছেড়ে দিবে। তখন তোকে আর জোর করে সমাজ ভাঙ্গ্‌তে গড়্‌তে হবে না।

শিষ্য—এখন মেয়েদের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজি—ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, শেলাই, শরীর পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলি মেয়েদের আগে শেখাতে হবে। নভেল্ নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। এই যে মহাকালী পাঠশালা দেখে এলি—এটা অনেকটা ঠিক্ পথে চলেছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্র সব, মেয়েদের সাম্‌নে ধ'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের জীবন ঐরূপ গঠিত কত্তে পারে। বুঝলি?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগ্‌বাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিল। স্বামীজি অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন। শিষ্যও পেছনে পেছনে উপস্থিত হইল। এখানে পৌঁছিয়াই স্বামীজি ত্যাগী ও গৃহী যে সকল ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া তাঁহাদের একজনকে* সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মশায়, মেয়েদের জন্য একটা কিছু করুন; এঁদের উন্নতি হলে তবে দেশের উন্নতি।"

তার পর নূতন গঠিত "রামকৃষ্ণ মিশনের" দ্বারা জগতে কি কি কাজ করা হইবে, তার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে করিতে "বিদ্যাদান" ও "জ্ঞান-

* ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ ঘোষ।

দানের” শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, “educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে,) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ;”। শিক্ষাদানের বিরোধী মূর্খ ভক্তদলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন “যেন ঐ সকল প্রহ্লাদের দলে যাস্‌নি”। ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন “শুনিস্‌নি ? “ক” অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এলো—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে ?” স্বামী যোগানন্দ বল্লেন “তা তোমার যখন যেদিকে ঝোঁক্ উঠবে—তার একটা হেস্ত নেস্ত না হলে ত আর তোমার শান্তি নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে।” স্বামীজি তদুত্তরে বল্‌ছেন “তোরে ত এখন মিশনের President করে দিয়েছি, আর পালাতে পাবিনি। কিছু কাজ করিয়ে তবে ছাড়্‌বো, শ্রীশ্রীমায়ের একটা থাক্‌বার স্থান গঙ্গাতীরে হবে, তুই সেখানে মোহন্ত হয়ে বস্‌বি, আর মেয়েদের শিক্ষার ভার নিবি। একার্য্যে দু এক জন বিদেশী শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী তোদের কাজের সহায় হবে। এই সব plan আমার মাথায় রয়েছে।”

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি বারাণ্ডায় পাইচালি করিতে লাগিলেন। শিষ্য প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া গেল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

সকল মঙ্গলালয় পূর্ণ বিরাজিত
প্রেমের আধার,
নির্ব্বিকার হর্ষ-শোচ-বাসনা-বর্জ্জিত
জ্ঞানদীপ্ত মূর্ত্তি মহিমার ;
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্ম্মল—অনিল স্পর্শে যাঁর,
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি
চরণে হরণ ধরাভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।

শুভাশুভ এ সংসারে সম প্রবাহিত
মিশ্রিত ধারায়,
সুখে দুঃখে মানব-জীবন আন্দোলিত,
তুষ্ট রুষ্ট কহে দেবতায়,—
গৃহদগ্ধ অনল-প্রভায়,
পূতবারি প্রাণনাশ তায়,
পবন জগৎপ্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান্
রবিতাপে জীবন হারায়,
অন্ন—বিষ, শস্যক্ষয় কভু বরিষায় ।

কভু রোষান্বিত হন জনক জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহে সর্পের বিবর,—
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর,
স্নেহমায়া পাশরিয়া, দুষ্ট-কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,
অবিশ্বাসী, পুত্র-সম-পালিত কিঙ্কর ।

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়
হে দীনশরণ,
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষণ ;
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী গমন,
ত্যজি কন্যা পুত্র নারী, পানাসক্ত, অত্যাচারী,
লোকত্যজ্য ঘৃণিত জীবন,
তব দ্বারে মুক্ত তার পতিতপাবন ।

ভবে ভ্রান্ত অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান-আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে ;
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে
সন্দেহ উদয় বারে বারে.
দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য জ্ঞান প্রচার সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।

কর্ম্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে
নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান্ শ্রীচরণ রাজে
তার নরে কপালমোচন ;
নিরন্তর ত্রিতাপদহন,
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন,
কর্ম্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার স্নেহে,
কর' দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস হর পাশ ত্রিতাপহরণ।

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণজ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কামরসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুখ নেহারে সমান,—
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ,
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

কে তোমা পূজিতে পারে, পূজা জানে কেবা ?
অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ সেবা
তব ধ্যান পরম উৎসব,—
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,
দুষ্ট ষড়্‌রিপু পরাভব,
ভুলায় যন্ত্রণা-জ্বালা,　তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার—দমিত দানব,
অর্চ্চনার অধিকার অতুল বৈভব।

নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব মাঝে পরশিতে হিয়ে
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে ;
পাছে নর নাহি আসে ডরে
দীনবেশে ডাক সকাতরে,
হরিবারে মন প্রাণ,　কর নাথ আত্মদান
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

চিনালে চিনিতে পারে নহে অসম্ভব
পুরুষ-প্রধান,
মত্তচিত্ত মহাঘোর বিষয়-আহব
হৃদয়ে না রহে তব স্থান,—
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টি দান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন,　হয় রূপ বিস্মরণ
ইন্দ্রিয়-তাড়না বলবান্ !
হৃৎ পদ্ম বিকাশিয়ে হও অধিষ্ঠান !!

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

শঙ্কর ও রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

[নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" নামক গ্রন্থের কিয়দংশ। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে ইহা উপহার দেওয়া গেল।— ইতি, সম্পাদক, উদ্বোধন।]

১। গুরু-পরম্পরা। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে আচার্য্যের গুরু-পরম্পরা সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায়। আমি যতগুলি মত জানিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রদান করিলাম।

শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত সন্ন্যাস-পদ্ধতি মতে।

১। ব্রহ্মা ২। বিষ্ণু ৩। রুদ্র ৪। বশিষ্ঠ
৫। শক্তি ৬। পরাশর ৭। ব্যাস ৮। শুক
৯। গৌড়পাদ ১০। গোবিন্দপাদ ১১। শঙ্করাচার্য্য।

কাশীর সন্ন্যাসিগণ মধ্যে প্রচলিত।

১। নারায়ণ ২। ব্রহ্মা ৩। বশিষ্ঠ ৪। শক্তি
৫। পরাশর ৬। ব্যাস ৭। শুক ৮। গৌড়পাদ
৯। গোবিন্দপাদ। ১০। শঙ্করাচার্য্য।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মতে।

১। মহেশ্বর ২। নারায়ণ ৩। ব্রহ্মা ৪। বশিষ্ঠ
৫। শক্তি ৬। পরাশর ৭। ব্যাস ৮। শুক
৯। গৌড়পাদ ১০। গোবিন্দপাদ ১১। শঙ্করাচার্য্য।

দক্ষিণমার্গ তন্ত্র মতে।

১। কপিল ২। অত্রি ৩। বশিষ্ঠ ৪। সনক
৫। সনন্দন ৬। ভৃগু ৭। সনৎসুজাত ৮। বামদেব
৯। নারদ ১০। গৌতম ১১। শৌনক ১২। শক্তি
১৩। মার্কণ্ডেয় ১৪। কৌশিক ১৫। পরাশর ১৬। শুক ×
১৭। অঙ্গিরা ১৮। কণ্ব ১৯। জাবালি ২০। ভরদ্বাজ
২১। বেদব্যাস ২২। ঈশান ২৩। রমণ ২৪। কপর্দ্দী
২৫। ভূধর ২৬। সুভট্ট ২৭। জলজ ২৮। ভূতেশ

২৯। পরম	৩০। বিজয়	৩১। ভরণ	৩২। পদ্মেশ
৩৩। সুভগ	৩৪। বিশুদ্ধ	৩৫। সমর	৩৬। কৈবল্য
৩৭। গণেশ্বর	৩৮। সুযাত	৩৯। বিবুধ	৪০। যোগী
৪১। বিজ্ঞান	৪২। নগ	৪৩। বিভ্রম	৪৪। দামোদর
৪৫। চিদাভাস	৪৬। চিন্ময়	৪৭। কলাধর	৪৮। বীরেশ্বর
৪৯। মন্দার	৫০। ত্রিদশ	৫১। সাগর	৫২। মৃড়
৫৩। হর্ষ	৫৪। সিংহ	৫৫। গৌড়+	৫৬। বীর
৫৭। ঘোর	৫৮। ধ্রুব	৫৯। দিবাকর	৬০। চক্রধর
৬১। প্রমথেশ	৬২। চতুর্ভুজ	৬৩। আনন্দভৈরব	৬৪। ধীর
৬৫। গৌড়+	৬৬। পাবক	৬৭। পারাচার্য্য	৬৮। সত্যনিধি
৬৯। রামচন্দ্র	৭০। গোবিন্দ	৭১। শঙ্করাচার্য্য।	

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা যথা।—

গুরুপরম্পরা প্রভাবমতে উদ্বোধনে প্রকাশিত।

১। বিষ্ণু ২। পোইহে ৩। পূদত্ত ৪। পে আলোয়ার
৫। তিরুমড়িশি ৬। শঠারি ৭। মধুর কবি ৮। কুলশেখর
৯। পেরিয়া আলোয়ার ১০। ভক্তপদরেণু ১১। তরুপ্পান
১২। তিরু মঙ্গই ১৩। শ্রীনাথ মুনি ১৪। ঈশ্বর মুনি
১৫। যামুন মুনি ১৬। মহাপূর্ণ ১৭। রামানুজাচার্য্য।

শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের পুস্তক মতে।

১। বিষ্ণু ২। লক্ষ্মী ৩। সেনেশ ৪। শঠকোপ
৫। নাথ যোগী ৬। পুণ্ডরীকাক্ষ ৭। রামমিশ্র ৮। যামুনাচার্য্য
৯। মহাপূর্ণ ১০। রামানুজাচার্য্য।

উভয় সম্প্রদায়ে দেখা যায়, আদি-গুরু নারায়ণ। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কোন মতে নারায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই মাত্র প্রভেদ। তবে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকের মত মুনি ঋষি রামানুজ-সম্প্রদায়ে নাই। ইঁহাদের উভয় মতেই লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পোইহে। সেনেশ শব্দে বিশ্বক্‌সেন বুঝায়। কিন্তু গুরুপরম্পরা প্রভাবমতে আবার দেখা যায়, ষষ্ঠ গুরু শঠারিই সেনেশ। যাহা হউক, রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরাতে মুনি ঋষি কেহ নাই। পোইহে প্রভৃতি সকলেই ভগবানের

শঙ্খ চক্র প্রভৃতির অবতার, পৌরাণিক মুনি ঋষি নহেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধ যোগী। ইনি যত দিন ইচ্ছা দেহ রাখিতে পারেন অথবা দেবীভাগবতের মতে * ইনি ছায়া শুকদেবের সন্তান। শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে শুক ছায়া-আকারে গৃহে ফিরিয়া আসেন, ইনিই ছায়া-শুক। গোবিন্দপাদ নারায়ণের শেষাবতার। ইনিই এক সময়ে পতঞ্জলিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনিই সেই পতঞ্জলিদেব যোগসাহায্যে কলিকালে শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন। মাধবের গ্রন্থেও একথার ইঙ্গিত আছে, যথাঃ—একাননেন ভুবিযস্ত্ববতীর্য্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্নন্নু স এব পতঞ্জলিস্ত্বম্॥ ৫।৯৫। যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, শুক ও গৌড়পাদের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর-সম্প্রদায় মুনিঋষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, গৌড়পাদের সাংখ্য কারিকা চীনভাষায় অনুবাদ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দৃষ্ট হয় এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের সময় যদিও স্থির হয় নাই, তথাপি এটুকু স্থির যে,তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বে নহেন। এজন্য গৌড়পাদকে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর লোক স্বীকার করাই উচিত। তান্ত্রিক মতেও এক গৌড়পাদ শঙ্করের ৫ম ও অন্য গৌড়পাদ ১৫শ পুরুষ পূর্ব্বে আবির্ভূত। আর যদি গৌড়পাদকে ছায়াশুকসন্তান পৌরাণিক পুরুষ ধরা যায়,তাহা হইলেও সেই দোষ। কারণ,গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদে অস্বাভাবিক ব্যবধান আসিয়া পড়ে। গোবিন্দপাদকে শঙ্করের গুরু হইতে হইলে ৭ম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়। কুরুক্ষেত্রের সময় ব্যাস শুক ছিলেন, আর কুরুক্ষেত্র-সমর এক মতে কলির প্রারম্ভে, অপর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে। পতঞ্জলিদেব যদি পাণিনি ভাষ্যকার হয়েন, এবং তিনিই যদি গোবিন্দপাদ হন, তাহা হইলেও অসুবিধা ; কারণ, তিনি খৃষ্টীয় পূর্ব্ব শতাব্দীর লোক, আর শঙ্কর কোথায় ৭ম।৮ম শতাব্দীতে অবিভূর্ত। ব্যাসের সমসাময়িক বা শিষ্য পতঞ্জলির ত কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন ঐ

* আমাদের দেশে যে দেবীভাগবত মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে কিন্তু "গৌড়" স্থলে গৌর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়, পাথুরিয়া ঘাট, কলিকাতা।

সময়ের লোক হউন না, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে ; কারণ,তিনি যে সমস্ত ব্যক্তি-গণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সময়ের লোক নহেন, তাহা স্থির।

যাহা হউক, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে ব্যাসশুক সহ অবিচ্ছিন্ন, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গুরুপরম্পরাদৃষ্টে ঐতিহাসিকের নিকট সন্দেহাবসর থাকে মাত্র। কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের সূত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে একবার সম্প্রদায়বিৎ এবং আর একবার বেদান্তার্থ সম্প্রদায়বিৎ বলিয়াছেন এবং তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা দৃষ্টে যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে ৫০ জন গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত গুরুপরম্পরা যে, সকল আচার্য্যেরই নাম নহে,তাহা স্থির। উহা তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিখ্যাত, তাঁহাদেরই নাম। আমি ঠিক এই অনুমান করিয়াই অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কাশ্মীর হইতে উক্ত তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা পাইয়াছি। ইহা শঙ্কর স্বামীর প্রশিষ্য-লিখিত বিদ্যার্ণবতন্ত্রমধ্যে লিখিত আছে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে, উহার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা দুরূহ। সুতরাং শঙ্কর-সম্প্রদায় ব্যাস সহ অবিচ্ছিন্ন, তাহা স্থির। তবে যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন কথাই নাই ; কারণ, তাঁহাদের মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই যোগী, যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে ত ব্যাসশুকের সহিত সম্বন্ধই নাই। যদি রামা-নুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বোধায়ন মুনির বৃত্তিসম্মত হয় এবং তাহা যদি আবার রামানুজেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুরুপরম্পরা মধ্যে কেন গণ্য করা হইল না, বুঝিতে পারি না। তাহার পর এই আর্য বোধায়ন-বৃত্তি বস্তুতঃই ছিল কি না, অনেকে সন্দেহ করেন ; কারণ, (১) শঙ্করের মত লোক বোধায়নের নাম করেন নাই। (২) তাহার কোন টীকাকারও বোধায়নের নাম করেন নাই। (৩) শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে উপবর্ষেই পূর্ণ হইতে পারে ; কারণ, উপবর্ষ (ক) ব্রহ্মসূত্র ও পূর্ব্ব মীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার— ইহা পার্থসারথী মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে। (খ) শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে উপবর্ষের নাম করিয়াছেন, সেখানে টীকাকারগণ উপবর্ষকেই বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন। (গ) উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও পাণিনির গুরু। (ঘ) উভয় মীমাংসার

টীকাকার হওয়ায় জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী বলিয়া বোধ হয়। (৪) কোন পুরাণেও বোধায়ন বৃত্তির নাম নাই। গরুড়-পুরাণে ব্যাসকৃত ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়াছে। (৫) কাশী-পণ্ডিতগণেরও এই মত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সম্পাদিত অদ্বৈত সিদ্ধি সিদ্ধান্তসার গ্রন্থের ভূমিকা ইত্যাদি। (৬) বোধায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি যে ব্যাস শিষ্য, তাহা প্রমাণিত হয় না। (৭) বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে বোধি বা বোধ্য নামক একজন ব্যাস-প্রশিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বোধায়ন, তাহার প্রমাণ নাই। (৮) শঙ্করের পর শঙ্করের মত নিরাশ করিয়া ভাস্কর এক ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তিনি শঙ্কর-ব্যাখ্যাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, এবং নিজের ব্যাখ্যাকে সূত্রের স্পষ্টার্থযুক্ত বলিয়াছেন। যদি তিনি ব্যাস-শিষ্য বোধায়ন বৃত্তির অস্তিত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কি নিজে নূতন করিয়া ভাষ্য করিতে যাইতেন? তাহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেন না! ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে যে কথা উঠিতে পারে,তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ আচার্য্য যদি, উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিবেন, তাহা হইলে কখন "অপরে" "কেচিৎ" কখন "ভগবান্ উপবর্ষ" এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন? সর্ব্বত্রই একরূপ ব্যবহার করিতেন। এজন্য উভয় দিক্ দেখিলে মনে হয়, এ বৃত্তিকার উপবর্ষের পরবর্ত্তী এবং শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং ইনি ব্যাসশিষ্য বলিয়া আচার্য্যের নিকট পরিচিত ছিলেন না। এই বৃত্তিকার ব্যাস-শিষ্য হইলে উপবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানার্হ হইতেন,কিন্তু শঙ্কর উপবর্ষকেই ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং বৃত্তিকারের মত বহু স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। উপবর্ষের বৃত্তি আচার্য্যের বোধ হয় অভিমত। তাহার পর রামানুজ নিজের কোন স্থলে বোধায়নকে ব্যাস-শিষ্য বলেন নাই,শিষ্যগণ তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক, এই বোধায়নও রামানুজের গুরুপরাম্পরা-মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। তাহার পর ইঁহাদের গুরুসম্প্রদায়-মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ইতর জাতি এবং এক জন দস্যু, যদিচ সকলেই পরম ভক্ত। ইহাদের বিবরণ এইরূপ ; যথা,—

২। পোইহে। ইনি ভগবানের পাঞ্চজন্যাংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান কাঞ্চীপুরী। ইনি সরোবর-মধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন,

এজন্য ইহার নাম সরোযোগী। অদ্যাবধি সরোবর-মধ্যে মন্দিরে ইহার ধ্যান-নিমীলিত মূর্ত্তি আছে। ইনি দ্বাপর যুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর জন্ম গ্রহণ করেন।

৩। পূদত্ত। ইনি মান্দ্রাজ হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে তিরুবড়ল্ মলই নামক স্থানে নারায়ণের গদাংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নাস্তিক-গর্ব্বখর্ব্বকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিও দ্বাপর যুগের লোক।

৪। "পে"। মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটী কূপ মধ্যে ইহার জন্ম হয়। ইনি সদা হরিপ্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন ও ভগবানের খড়্গাংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হন।

৫। তিরু মড়িশি। ইনি ভগবানের সুদর্শনাংশে মহীসারপুরে ৪২০২ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাকে লোকে মহীসারপুরের অধীশ্বর বলিয়া সম্মান করিত। ইনি প্রতিদিন তুলসী ও কুসুম-মাল্য রচনা করিয়া ভগবৎ চরণে অর্পণ করিতেন। মহীসার বর্ত্তমান তিরু মড়িশি, ইহা পুনা-মেলির দুই মাইল পশ্চিমে।

৬। শঠারি। ইঁহার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, পরাঙ্কুশ ইত্যাদি। ইনি কলিযুগপ্রারম্ভে অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ৪০ দিন পরে পাণ্ড্য দেশস্থ কুরিকা পুরীতে চণ্ডালবংশসম্ভূত সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকারীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাকে বিশ্বক সেনের অবতার বলা হয়। কুরুকা-পুরী বা কুরুকুর তিরুনভেলির নিকট তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। ঐতি-হাসিকের মতে ইনি খৃষ্টীয় ৯ম।১০ম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৮ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন।

৭। মধুর কবি। ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুরীর নিকট একটী স্থানে ৩২২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শঠারি ইঁহার গুরু ছিলেন। ইঁহার কবিতা অতি মধুর বলিয়া ইহাকে মধুর কবি বলা হইত। ইনি অযোধ্যা হইতে একটী আলোক রশ্মি ধরিয়া শ্রীনগরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন ও তথায় শঠারিকে দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হন।

৮। কুল শেখর। ইনি কেরল দেশের রাজা ছিলেন। মালাবার দেশে চোল পট্টন বা তিরুভঞ্জি ক্কোণম্ নামক স্থানে ৩১০২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভগবানের কৌস্তুভাংসে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বজন সমক্ষে রথারোহন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন।

ইঁহার জন্মকাল মালাবার দেশে প্রচলিত কেরলোৎপত্তিতে কিন্তু অন্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হয়।

৯। পেরিয়া আলোয়ার। ইহার অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইনি ৩০৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবল্লিরপুত্তুর নগরে বিষ্ণুর রথাংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার কন্যা অণ্ডাল ভগবান্ রঙ্গনাথ নামক বিষ্ণুকে বিবাহ করিতে আসিয়া বিষ্ণু বিগ্রহে মিশিয়া যান।

১০। ভক্ত পদরেণু বা তোণ্ডারাড়িপেপাড়ি আলোয়ার। ইনি ভগবানের বন মালার অংশে জন্মিয়াছিলেন। চোল রাজ্যস্থ মাণ্ডুঙ্গুড়িপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইহা বর্ত্তমান ত্রিচিনাপল্লির নিকট। ইঁহার জন্ম কাল ২৮১৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ। ইনি নিত্য ভগবান্‌কে মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন, এজন্য ইঁহাকে ভগবানের বন মালার অবতার বলা হয়।

১১। তিরুপ্পান আলোয়ার। ইঁহার অপর নাম মুনি বাহন। ইনি খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের শ্রীবৎস অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সুগায়াক ছিলেন। গান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। ইনিও একজন পরম ভক্ত। ইনি একদিন পথে গান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রঙ্গনাথের এক সেবক ভগবানের জন্য জল আনিতে যাইতেছিলেন। পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক লোষ্ট্রাঘাতে তিরুপ্পানের সংজ্ঞাসাধন করেন। কিন্তু জল আনিয়া মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ দেখেন ও ভগবানের নিকট যদি কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। ভগবান্ ভিতর হইতে আদেশ করেন—"যদি তুমি উক্ত চণ্ডালকে স্কন্ধে করিয়া আমার মন্দির বেষ্টন করিতে পার তাহা হইলে দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।" সেবক তাহাই করিল এবং দ্বারও উদ্ঘাটিত হইল। কথিত আছে ইনি রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন।

১২। কালিয়ান বা তিরুমঙ্গই। ইনি ভগবানের শার্ঙ্গধনুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার চারিজন শিষ্য ছিল। প্রথম তোরা বড় কন, অর্থাৎ তার্কিক শিরোমণি, ২য় তাড়ূদুয়ান্ অর্থাৎ দ্বার উদ্ঘাটক। ইনি ফুৎকার দ্বারা দ্বারের তালা খুলিতে পারিতেন। ৩য় নেড়েলাহ মেরিপ্পান্ অর্থাৎ ছায়া গ্রহ। ইনি যাহার ছায়া স্পর্শ করিতেন তাহার গতিরোধ হইত। ৪র্থ নীরমেল্ নড়প্পান্ অর্থাৎ জলোপরিচর। ইনি জলের উপরও গমন করিতে পারিতেন। কালিয়ন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই চারি জন

শিষ্য সহ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। এ সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতি ক্ষুদ্র ও ভগ্নদশাগ্রস্ত ছিল। তিরুমঙ্গই মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, এবং ধনিগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু ধনিগণ কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তিনি ধনিগণের এই দুর্ব্ব্যবহারে ক্রোধে অধীর হইয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজসভা প্রভৃতি স্থানে গিয়া তার্কিক শিরোমণি শিষ্যটী সকলকে বাক্‌চাতুর্য্যে যখন মুগ্ধ করিয়া আবদ্ধ করিত, দ্বিতীয় শিষ্য ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তখন ফুৎকার দ্বারা তালা খুলিয়া দিত, কেহ আসিলে তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার গতিরোধ করিত, এবং তিরুমঙ্গই স্বয়ং ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিতেন। পরিখা প্রভৃতি দ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইত। এই প্রকার ৬০ বৎসর যাবৎ দস্যুবৃত্তি করিয়া তিনি ঐ দেশের রাজা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিজে ভিক্ষান্ন ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করিতেন না। সহস্র দস্যু তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার দস্যুতায় সাহায্য করিত, তাঁহাকে ভয় করিত না, তখন এমন কেহই ছিল না। এইরূপে ৬০ বৎসর অন্তে সপ্তপ্রাকার বিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পিগণকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন। এই সময় সহস্র দস্যু শিষ্যও বেতন লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু তিরুমঙ্গইয়ের নিকট তখন এক পয়সাও নাই। দস্যুগণ তিরুমঙ্গইকে নিঃস্ব জানিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই চতুর্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নৌকা-যোগে উক্ত দস্যুগণকে জলে ডুবাইয়া মারিবার পরামর্শ দিয়া বসিয়া আছেন। শিষ্য আসিয়া দস্যুগণকে বলিল, "তোমরা আমার সঙ্গে এই সুবৃহৎ নৌকা আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর পারে আইস তথায় বহু ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে, আমরা উহা লইব। দস্যুগণ আনন্দসহকারে নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিল। নৌকা মধ্যনদীতে আসিলে সহসা জলমগ্ন হইল, দস্যুগণ প্রাণে মরিল, শিষ্য জলের উপর দিয়া গুরু-সন্নিধানে ফিরিয়া আসিল। যেখানে এই সহস্র দস্যু বিনষ্ট হয়, অদ্যাবধি তাহাকে হত্যাস্থল বা কোল্লিড়ম্ বলা হয়। ইনি ৮ম৷৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন ও দিব্য প্রবন্ধ নামক এই সম্প্রদায়ের বেদস্থানীয় পুস্তকের ৬টী প্রবন্ধ রচনাকর্ত্তা। ইনিও পরম-ভক্ত; ইঁহার রচিত এক সহস্র শ্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশ্ববিখ্যাত।

১৩। শ্রীনাথ মুনি। ইনি ব্রাহ্মণ কিন্তু শঠকোপের শিষ্য। কলি ৩৬৮৪ বা ৯০৮ খৃষ্টাব্দে বীরনারায়ণপুরে বিশ্বক্‌সেনের পরিষদ গজবদনের অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি পরাঙ্কুশ দাস নামক মধুর কবির শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া তপস্যা দ্বারা দ্রাবিড় বেদ উদ্ধার করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন, ৩৩০।৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন ও সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। শঙ্করের সময় ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়তত্ত্ব, যোগরহস্য, শ্রীপুরুষ-নির্ণয় প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ;

১৪। ঈশ্বর মুনি শ্রীনাথ মুনির পুত্র, ইনি কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে নাথমুনি পৌত্রের মুখ দর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েন। এই পৌত্রই ভবিষ্যতে যামুন মুনি নামে বিখ্যাত হয়েন। ঈশ্বর ভট্ট পৃষ্ণিগর্ভ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৫। যামুন মনি। ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ভে আগমন করেন বলিয়া ইঁহার পিতামহ নাথ মুনি ইহার যামুন মুনি নাম রাখিয়াছিলেন। যামুন কলি ৪০১৭ অব্দে বুধবার পূর্ণিমা আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর বা মাদুরা। ইনি বিষ্ণুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইনি অসাধারণ-ধী-সম্পন্ন ছিলেন। ইনি রাজসভায় সমুদায় পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া রাজাও রাণীর প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ড্য দেশের অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন, এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচ জন শিষ্য ছিলেন। রামানুজ সকলের নিকটই শিক্ষালাভ করেন, তবে বিশেষ ভাবে মহাপূর্ণই রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে নাথ যোগীর পর পুণ্ডরাকাক্ষ, তৎপর রামমিশ্র, তাঁহার শিষ্য যামুনাচার্য্য।

১৪। পুণ্ডরীকাক্ষ। কলির ৩২৯৭ অব্দে শ্রীরঙ্গমের উত্তর শ্বেত গিরিতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ও সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। ইনি নাথ মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট হইতে যোগবিদ্যা ও দ্রাবিড় বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন। যামুনাচার্য্যকে শিক্ষার জন্য নাথমুনি ইহাকে তাঁহার সমুদায় বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫। রামমিশ্র। ইনি ৩৯৩২ কল্যব্দে ভগবানের কুমুদের অংশে শ্রীরঙ্গমে

জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ অতি বৃদ্ধ হওয়ায় যামুনাচার্য্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথ মুনির নিকট তিনি যে সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহা ইহাকে শিখাইয়া যান।

উপরিউক্ত বৃত্তান্ত দর্শনে দেখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে আদি ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন,দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রথমে আবির্ভূত। শঠকোপ, যাঁহাকে ঐতিহাসিকগণ অত প্রাচীন মনে করেন না, তিনি পর্য্যন্ত প্রাচীনদলভুক্ত। পরন্তু নাথ মুনি হইতে আধুনিক দলভুক্ত বলা যায়। নাথ মুনি যেরূপ যোগী ছিলেন, ইঁহার শিষ্য প্রশিষ্য সেরূপ ছিলেন না। ইঁহার শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামমিশ্র তাহা পারেন নাই। যামুনাচার্য্য যদিও রামমিশ্রের নিকট নাথমুনিপ্রদত্ত যোগ-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং নাথমুনির অপর শিষ্য যোগী ও সমাধিবান্ কুরুকাধিপের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন,তথাপি তিনি সমাধি-যোগে দেহত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই। তাহার পর যামুনের শিষ্য মহা-পূর্ণ বা তৎ শিষ্য রামানুজ কেহই যোগে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, একথা শুনা যায় না ; ইঁহারা সকলে শঠকোপ প্রভৃতি রচিত দ্রাবিড়বেদোক্ত ভক্তিমার্গেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। এতদ্দ্বারা আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে যোগবিদ্যা অধিক অভ্যস্ত ছিল। শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ ও পরম গুরু গৌড়পাদ সিদ্ধযোগী ও বহু সহস্র বৎসর জীবী বলিয়া পরিচিত। শঙ্করের নিজের ও তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ উভয়েরই দেহত্যাগ সমাধি দ্বারা হয়। পক্ষান্তরে রামানুজ বা মহাপূর্ণ বা যামুনাচার্য্যের তাহা ঘটে নাই। যদিচ তিব্বতে শঙ্করের লামার নিকট তপ্ত তৈলে, মতান্তরে ছুরিকাখণ্ডে প্রাণ-ত্যাগের কথা আছে, তাহা তাঁহার শত্রুসম্প্রদায়ের কথা। এই তুলনাকার্য্যে আমরা উভয় পক্ষেরই মিত্র ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কথা গ্রহণ করিব। শত্রুতে কি না বলিয়া থাকে। দয়ানন্দ স্বামী বলিতেন, শঙ্কর বিষপ্রযুক্ত হইয়া দেহ-ত্যাগ করেন। কিন্তু এসব কথার আকর কোন গ্রন্থ নহে। তাহার পর গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, মাণ্ডূক্য উপনিষদকারিকা, উত্তর গীতা ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ, গোবিন্দপাদের অদ্বৈতানুভূতি দেখিলে এই সম্প্রদায়কে যোগবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্ব—বিশেষতঃ বেদান্তবিদ্যায় বিশারদ বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে রামানুজ-সম্প্রদায়ে নাথমুনি-বিরচিত ন্যায়তত্ত্ব, যোগরহস্য ও শ্রীপুরুষনির্ণয় নামক দার্শনিক বা যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ ব্যতীত শঠকোপ

প্রভৃতির বৈদান্তিক বা দার্শনিক গ্রন্থ কিছুই নাই। এই ঘটনাকে যদি শঙ্করসম্প্রদায়ের সহিত সমান করিবার জন্য ধরা যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, নাথ মুনির সহিত রামানুজের যে কালগত ও পরম্পরাগত ব্যবধান, শঙ্কর ও গোবিন্দপাদ বা গৌড়পাদে সে ব্যবধান নাই। সুতরাং বলিতে পারা যায়, শঙ্করের গুরুসম্প্রদায় যোগবিদ্যা ও সাংখ্য-বেদান্তশাস্ত্রে বড়। রামানুজের গুরুসম্প্রদায় ভক্তিবিদ্যায় বড়।

তাহার পর শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণেতর নীচ শূদ্র জাতির গুরুত্ব শুনা যায় না, রামানুজসম্প্রদায়ে চণ্ডাল প্রভৃতিও গুরুপদে আসীন দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুকালীন যে দশটী প্রধান উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে শঠারি-সূত্র পাঠের আদেশ একটী নিদর্শন। তিরুমঙ্গই দ্বাদশ গুরু, ইনি রঙ্গনাথের মন্দিরের জন্য যে দস্যুদল গঠন করিয়াছিলেন, মন্দির শেষ হইলে তাহারা যখন অর্থ প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদিগকে কাবেরীতে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দেন। শঙ্করসম্প্রদায়ে এরূপ গুরু কেহ নাই। যদি বলা যায়, নীচজাতি ভক্ত হইলে, তাঁহাকেও গুরু করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামানুজের গুরুসম্প্রদায়ে উদারতার আধিক্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা উচিত, এরূপ উদারতা উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক কি না! উন্নতি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া যতটা হয়, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়া ততটা হইতে পারে না, ইহা স্থির। আর এই শৃঙ্খলার জন্যই ব্রাহ্মণ লোকগুরু, অপরে তাঁহাদের অনুগমনকারী, এই নিয়ম করা হইয়াছে। এখন কদাচিৎ কোথায়ও অন্য জাতিতে মহত্ত্ব দর্শনে তাহাকে গুরুপদে স্থান দিলে ঐ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়। আর এই জন্যই আদর্শচরিত্র রামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই জন্যই রামানুজের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও পরমভক্ত শূদ্র কাঞ্চিপূর্ণ, রামানুজকে মন্ত্রদান করেন নাই। সুতরাং রামানুজ-গুরু-সম্প্রদায়ে ইহাকে উদারতা বলিয়া ইহার আদর করা কতদূর সঙ্গত, তাহা ভাবিবার বিষয়। অবশ্য এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা যে ভক্তিভাবের আধিক্য-জন্য, তাহাও স্থির। তজ্জন্য আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের গুরুসম্প্রদায় শান্ত স্থির ও গম্ভীর, এবং রামানুজসম্প্রদায় ভাববিহ্বল। শঙ্করসম্প্রদায়ে লক্ষ্য ও উপায় উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি, রামানুজসম্প্রদায়ে লক্ষ্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি। এক্ষণে পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে আমরা এই পর্য্যন্ত

বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে শঙ্করসম্প্রদায় রামানুজসম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঐরূপ হইলেও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চিন্তনীয়। শঙ্কর ব্রাহ্মণ-কুমার, ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন, ইহাতে বলিবার কিছু নাই; কিন্তু রামানুজ ব্রাহ্মণকুমার হইয়াও তিনি কেন এরূপ গুরুসম্প্রদায় আশ্রয় করিলেন ইহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর ব্যাপার। পরন্তু যাহাই হউক, ইহা যে রামানুজের গুণগ্রাহিতার পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মণভক্ত পাইলে, প্রথমে কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অত অনুরক্ত হইতেন কি না সন্দেহ। তিনি স্বজাতিসুলভ দম্ভ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যে শূদ্র কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচয়, সন্দেহ নাই। এ জন্য ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে রামানুজকেই বড় বলা উচিত। সত্য, কিন্তু এ বিষয় প্রসঙ্গান্তর বলিয়া "উদারতা" "গুণগ্রাহিতা" প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে—এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল।

পাণ্ডবগণের ঐতিহাসিকতা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

হরিবংশের ৩০ তম অধ্যায়ে একটি ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা এইরূপ। পুরাকালে জনমেজয় নামে কুরুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার সমক্ষে গর্গ মুনির একটি বালক পুত্র দুর্ম্মুখতা দোষে অপরাধী হন। রাজা সেই অপরাধে ঐ ব্রাহ্মণ-বালকের প্রাণ সংহার করেন। এই ব্যাপারে পৌর ও জনপদগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত রুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এইরূপে প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজা জনমেজয় সন্তপ্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন কিন্তু কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে তিনি ইন্দ্রোত শৌনক নামক এক ঋষির শরণাপন্ন হন। ঋষি শৌনক রাজার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান। ঐ যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলে পর

রাজা জনমেজয় ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হন। ঐ স্থলে এরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র জনমেজয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাজা যযাতিকে যে একখানি দিব্যকাঞ্চনময় ভাস্বর রথ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত পাপের জন্য রাজা জনমেজয় সেই রথ হইতে বঞ্চিত হন ; এবং তাঁহার শরীর লৌহ-গন্ধময় হইয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার গাত্র হইতে লৌহগন্ধ অপনীত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই দিব্যরথ আর তিনি ফিরিয়া পাইলেন না। উহা অতঃপর চেদিরাজ বসুর হস্তগত হয়। লিঙ্গ পুরাণের ৬৬ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই বর্ণনা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, শতপথ ব্রাহ্মণের উপরে উদ্ধৃত বচনগুলিতে যে ঘটনার আভাস পাইয়াছি, তাহার সহিত এই বর্ণনার ঐক্য আছে। কেবল নামের অল্পাধিক পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি। শতপথ ব্রাহ্মণে যে ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হরিবংশ ও লিঙ্গপুরাণে যে ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁর নাম ইন্দ্রোত শৌনক লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ ঋষির নামে "দৈবাপ" এই কথাটি অধিক রহিয়াছে। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে, বুঝি এই দুইটি বিভিন্ন ঋষির নাম। কিন্তু সে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমরা উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, পুরাকালে প্রত্যেক ব্যক্তির তিনটি করিয়া নাম থাকিত। তন্মধ্যে একটি স্বীয় নাম, একটি পিতার নাম হইতে সিদ্ধ নাম এবং তৃতীয়টি গোত্রনাম ; যথা, উদ্দালক, আরুণি, গৌতম এই তিনটি লইয়া এক ব্যক্তির নাম। ইহার মধ্যে "উদ্দালক" এইটি স্বকীয় নাম। অরুণের পুত্র বলিয়া আর একটি নাম "আরুণি" এবং "গৌতম" এইটি তাঁহার গোত্রনাম। এই তিনটি নামের মধ্যে কেবল "উদ্দালক" কিম্বা কেবল "গৌতম" কিম্বা "উদ্দালক আরুণি" অথবা "উদ্দালক গৌতম" এরূপভাবে নামের ব্যবহারও বহু স্থলে দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে এইরূপ খণ্ডিতভাবে নামের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত দেখা যায়। এই কারণেই পুরাণাদি গ্রন্থের নামের সহিত বৈদিক গ্রন্থের নামের এইরূপ পার্থক্য দেখিতে পাই। কেবল স্বকীয় নাম যথা "উদ্দালক" অথবা কেবল গোত্রনাম যথা "গৌতম" এইরূপ ভাবের ব্যবহারই মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাকালে যে অন্যরূপ প্রথা

ছিল, বৈদিক গ্রন্থ পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই প্রথা মহারাষ্ট্র দেশে অদ্যাপি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা সখারাম গণেশ দেউস্কর, ইহার মধ্যে মধ্যস্থ নামটি পিতার নাম। হরিবংশ ও লিঙ্গ-পুরাণের সহিত শতপথ ব্রাহ্মণের নামের যে পার্থক্য দেখিলাম, তাহার ইহাই কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে যাঁহাকে ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক বলা হইয়াছে, হরিবংশ ও লিঙ্গপুরাণে তাঁহাকেই ইন্দ্রোত শৌনক বলা হইয়াছে। দেবাপির পুত্র বলিয়া ইন্দ্রোতের আর একটি নাম ছিল "দৈবাপ"। হরিবংশে ও লিঙ্গপুরাণে, অপ্রয়োজন বোধে এবং সে সময়-কার প্রথানুসারে, সেই নামটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পাণ্ডবগণের এবং মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে উপরি উক্ত উপাখ্যান বর্ণিত রাজা জনমেজয় পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম অর্জ্জুনের প্রপৌত্র কিনা—এই বিষয়েরই মীমাংসার উপর। ইহা সকলেই জানেন, হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া খ্যাত এবং মহাভারতের ন্যায় হরিবংশের আখ্যানও বৈশম্পায়ন, অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়কে বলিতেছেন। এখন কথা হইতেছে, যদি উপাখ্যানবর্ণিত জনমেজয় অর্জ্জুনের প্রপৌত্র হইবেন তবে, তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনা তাঁহারই নিকট বিবৃত করা বৈশম্পায়নের কি প্রযোজন ছিল? বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ, আমরা হরিবংশে দেখিতে পাই যে উপরিলিখিত আখ্যান বর্ণনাকালে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন "আপনার স্বনামা কুরুবংশীয় রাজা জনমেজয় ইত্যাদি"। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইনি অর্জ্জুনের প্রপৌত্র নহেন; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী একই নাম-ধারী অন্য কোন রাজা। হরিবংশের ৩২ অধ্যায়ে পুরুবংশ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কৌরবগণের পূর্ব্বপুরুষ রাজা কুরুর সুধন্বা, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও প্রবর নামে চারি পুত্র হয়। তন্মধ্যে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। জনমেজয়ের পাঁচ পুত্র—শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন, সুরথ ও মতিমান। পাছে পরবর্ত্তী কালে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় হরিবংশ-কার কযেক শ্লোক পরেই আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন "মহারাজ আপনার এই বংশে দুই ঋক্ষ, দুই পরীক্ষিৎ, তিন ভীমসেন ও দুই জনমেজয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।" অতএব দেখিতে পাইতেছি যে, কুরুবংশে দুই জন জনমেজয় রাজা ছিলেন। একজন অর্জ্জুনের প্রপৌত্র, অপর জন

কুরুর পৌত্র। সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বৈশম্পায়ন যাঁহাকে "আপনার সনামা কুরুবংশীয় রাজা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কুরুর পৌত্র। লিঙ্গপুরাণে ৬৬ অধ্যায়ের যে স্থলে উপরিউক্ত উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সে স্থলেও দেখিতে পাই, রাজা জনমেজয় স্পষ্টভাবে পরীক্ষিতের পুত্র ও কুরুর পৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এক্ষণে মহাভারতে এ বিষয়ে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখা আবশ্যক। মহাভারতে দেখিতে পাই, জনমেজয়ের পিতা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অপমানের কথা, তাঁহার সর্প দংশনের কথা, জনমেজয়ের নিজের অনুষ্ঠিত সর্পসত্রের কথা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু জনমেজয় যে কখনও ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতক করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সে পাপ ক্ষালন করিয়াছিলেন, সমগ্র মহাভারত খুঁজিলেও একথা পাওয়া যায় না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অর্জ্জুন-প্রপৌত্র জনমেজয় কখনও ব্রহ্মহত্যা করেন নাই, করিলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। আর একটি কথা, উপরে দেখাইয়াছি যে, Weber সাহেব শতপথ ব্রাহ্মণের বচনগুলিতে যে ভীমসেন, উগ্রসেন এবং শ্রুতসেন বলিয়া তিন ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে জনমেজয়ের ভ্রাতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু ঐ নামে জনমেজয়ের কোন ভ্রাতা ছিলেন, এ কথা মহাভারতে পাওয়া যায় না। যিনি এত বড় একটা বিচিত্র-ঘটনাবলী পূর্ণ সহস্র সহস্র নামপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিলেন, তিনি সেই গ্রন্থে জনমেজয়ের ভ্রাতার নাম লিখিতে ভুলিয়া গেলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে কুরুবংশের পুরুষানুক্রমিক বিবরণ দিয়া শেষে গ্রন্থকার বলিতেছেন, অভিমন্যুর এক পুত্র পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিতের এক পুত্র জনমেজয় এবং জনমেজয়ের দুই পুত্র শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, অর্জ্জুন-প্রপৌত্র জনমেজয়ের ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেন বলিয়া কোন ভ্রাতা ছিলেন না। উপরে হরিবংশের পুরুবংশ বর্ণনাবিষয়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, কুরুর পৌত্র জনমেজয়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিন জনের নাম শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। সুতরাং ইঁহারা জনমেজয়ের ভ্রাতা নহেন, তাঁহার পুত্র, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণের বচন হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হয়। ঐ বচনগুলিতে শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন "পারীক্ষিতীয়" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন এবং জনমেজয় "পারীক্ষিত" বলিয়া অভিহিত

হইয়াছেন। এই দুইটি পৃথক্ শব্দ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, জনমেজয় পরিক্ষিতের পুত্র এবং শ্রুতসেনাদি পরিক্ষিতের পৌত্র। কারণ 'পরিক্ষিৎ' শব্দের উত্তর ষণ্ প্রত্যয় করিয়া 'পারীক্ষিত শব্দের' উৎপত্তি হইয়াছে এবং পারীক্ষিত শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিয়া পারীক্ষিতীয় পদের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ অধ্যাপক max muller সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ঐ "পারীক্ষিতীয়" পদটির অনুবাদ না করিয়া Foot note এ লিখিতেছেন "That is, according to Hari Swamin (and the Gatha) the brothers of (Janamejaya) Parikshita, though one would rather have thought of his sons, the grandsons of Parikshita.

উপরে আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, শতপথব্রাহ্মণোক্ত "জনমেজয় পারীক্ষিত" অর্জ্জুনের প্রপৌত্র নহেন। সুতরাং মহাভারতে পুরাতন রাজাগণের যে বংশপত্রিকা লিখিত আছে, তাহার যে কিছু ঐতিহাসিকতা আছে, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। যেহেতু ইহাতে কবি-কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ যে সকল পৌরাণিক গ্রন্থের বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থের বর্ণনার সহিত মিল আছে, সেই গুলিকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। অবশ্য পৌরাণিক গ্রন্থে, গুরুত্বের হিসাবে সাবধানতার অভাবে, অনেক ভ্রম প্রমাদ প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাদেরও অনেক স্থলে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হরিবংশাদি-লিখিত বংশবৃত্তান্ত অনুসারে শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত জনমেজয় যে পাণ্ডবগণের বহুপূর্ব্বকালবর্ত্তী লোক, ইহাই আমরা দেখিলাম। সুতরাং ঐ বর্ণনাতে এবং শতপথ ব্রাহ্মণের অন্য কোনও স্থলে পাণ্ডবগণের নামোল্লেখ না থাকাতে তাঁহারা যে অলীক ও কবি-কল্পনাপ্রসূত, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। German পণ্ডিত Lassen তাঁহার রচিত Indian Antique গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মহাভারত গ্রন্থ বিশ্লেষণ করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে এ বিষয়ের আভাস দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই বৃহৎ এবং অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যটীতে

ইউরোপীয় কি ভারতবাসী কোনও ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। আশা করি, আমাদের স্বদেশবৎসল যুবকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ এই কার্য্যটি গ্রহণ করিবেন এবং জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিয়া অধ্যবসায়-সহকারে এই মহৎ কার্য্য সমাধা করিবেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন যে, মহাভারত গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা খুব প্রাচীন এবং তাহাই আদিম মহাভারতের অবশিষ্ট। মহাভারত বলিয়া যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ অতি প্রাচীন কাল হইতে দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাণিনির সূত্রের বহু স্থলে মহাভারতোক্ত ব্যক্তিগণের নামবিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। যথা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব, বাসুদেব, সুভদ্রা, কুন্তী ইত্যাদি। পাণিনীয় সময়ে মহাভারতের কাহিনী এত প্রাচীন যে, সে সময়ে বাসুদেব এবং অর্জ্জুনের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না।

আমরা দেখিয়াছি, শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে পাণ্ডবগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, একথা কোনও ক্রমে প্রমাণ করা যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে যদি পাণ্ডবগণের উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে এই মাত্র অনুমিত হইতে পারে যে, পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তথাপি ইহা হইতেই ইউরোপীয় পণ্ডিত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত Ancient India নামক গ্রন্থে পঞ্চপাণ্ডব সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"The five heroes of the existing epic are myths pure and simple" অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাভারতের নায়ক পঞ্চপাণ্ডব সম্পূর্ণ অলীক ও কল্পনাপ্রসূত। এমন সহৃদয় ভারতবাসী কে আছেন, যিনি একথা পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত না হইবেন? বিদেশীয় পণ্ডিতগণ পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও গবেষণা দেখান, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয় ও আমাদের অনুকরণীয়; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহাদের একটী বিশেষ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে দেশবাসীর সাবধান থাকা প্রয়োজন। সেটী এই, বর্ত্তমান ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার,

ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের একান্ত সহানুভূতির অভাব এবং কোনও কোনও স্থলে তাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব। পুরাতনের আলোচনায় একটা কৌতূহল-চরিতার্থতা-জনিত স্বাভাবিক আনন্দ আছে, নূতনের আলোচনায় তাহা নাই। কিন্তু বিদেশীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে প্রীতির চক্ষে অন্ততঃ সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারে, এরূপ সহৃদয় ব্যক্তি জগতে বিরল। বিদেশীর নিকট সে প্রীতি বা সহানুভূতি না পাইলে আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যখন স্বদেশবাসীতে তাহার অভাব দেখি, তখন আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে। এদেশে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরের চাকচিক্য যাঁহাদিগকে মোহিত করিয়াছে, দেশের কোনও পদার্থের উপর তাঁহাদের সহানুভূতি দেখা যায় না। সুতরাং যদি কোনও বিদেশী ভারতীয় কোনও বিষয়ের নিন্দা করেন, ইঁহারা বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করেন। এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। কিন্তু বিদেশীগণের সে টান থাকা প্রায় অসম্ভব। অতীতের বিষয় অনুসন্ধান যে অত্যন্ত আবশ্যকীয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অতীতের ভিতর বর্ত্তমানের বীজ নাই, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? যে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ নাই, যাহা আমাদের বর্ত্তমান যুগের সহিত একেবারে বিচ্ছিন্ন, তাহার মূল্য কি? পৃথিবীতে পুরাকালে mammoth বলিয়া এক প্রকাণ্ডকায় জানোয়ার ছিল, ইহা জানিলে আমাদের তত উপকার হয় না। তবে যদি কোন উপায়ে জানা যায় যে mammoth আমাদের হস্তীর পূর্ব্বপুরুষ, তবে সে কথার একটা ঐতিহাসিক মূল্য হয়। পুরাকালে ভারতে কাত্যায়ন বা লাট্যায়ন বলিয়া একজন লোক ছিলেন, ইহা জানিয়া আমাদের লাভ কি? তবে যদি দেখিতে পাই যে, যে আচার বা ব্যবহার এখন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত, তাহার পূর্ব্বাভাস ঐ কাত্যায়ন বা লাট্যায়নের লেখার মধ্যে আছে, তবেই উহার ঐতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার করিব। যে অতীতের ধারা বর্ত্তমানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাই জীবন্ত ইতিহাসের অংশ। বর্ত্তমানের সহিত সম্পর্কহীন অতীত পূতিগন্ধ শবের ন্যায়। যদি জীবন্ত ইতিহাস লিখিতে হয়, তবে এমন পুরাতনের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যাহার সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অতীতের অনুসন্ধানে কোনরূপ তত্ত্ব বাহির করিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত হন। বর্ত্তমানের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি তাহা আবিষ্কারের প্রয়োজন কিছুই দেখেন না! পুরাকালে কুরুপাঞ্চাল নামে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, একথা তাঁহারা তারস্বরে ঘোষণা করিবেন, হয়ত একথাও স্বীকার করিবেন যে, কুরুপাঞ্চালের মধ্যে এক লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু যে পাণ্ডবগণের গুণগাথায় বর্ত্তমান ভারতবাসীর হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হয়, যে কৃষ্ণের গীতা বর্ত্তমান ভারতবাসীর প্রত্যেক হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই পাণ্ডবগণকে এবং সেই কৃষ্ণকে অলীক কবি-কল্পনা বলিতে পারিলে যেন তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন! এ ভাব যথার্থ ঐতিহাসিকের উপযুক্ত নহে। সেই জন্য স্বদেশবাসীর নিকট অনুনয়, যদি তাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত জীবন্ত ইতিহাস লিখিতে চান, তবে যেন অতীত গৌরব না ভুলিয়া তাহার সহিত বর্ত্তমানকেও ভাল বাসিতে শিখেন। যেন অন্ততঃ বর্ত্তমানের সহিত সহানুভূতি করিতে শিখেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতি উপলক্ষে লিখিত।]

নাগ মহাশয়।

দীনের সুদীন, ছিন্ন মলিন বসনে
আবরি উজ্জ্বল কান্তি—প্রশান্ত মূরতি,
কে তুমি হে রামকৃষ্ণলীলার সহায়
উদিলে পূরববঙ্গ নিভৃত কুটীরে ?
কৃপামন্ত্রে মহামায়াবন্ধন ছেদিয়ে
অসংসারী,—সংসারের বিচিত্রতা মাঝে।
রাজর্ষি জনক সম—বিদেহ—নিষ্কাম,
লোভশূন্য, কামশূন্য, মায়ামুক্ত যতী।
নমিত নয়নে নাহি মায়াঞ্জনরেখা,
ইষ্ট-সমাবিষ্ট, তবু বিস্ফার নয়নে
জ্বলন্ত পাবক-শিখা—জ্বলে ধিকি ধিকি।

তিতিক্ষায় জিতদ্বন্দ্ব, আনন্দ-আলয়,
রামকৃষ্ণপদে প্রাণ দিলে বলিদান।
দীনতার অবতার—অদৈন্য দয়ায়।
গৃহধর্ম্মে স্থির, কিন্তু কামিনীকাঞ্চন—
কাল ভুজঙ্গম জ্ঞান—সমনস্ক সদা।
সন্ন্যাসের পরা কাষ্ঠা গৃহস্থ আশ্রমে
দেখাইতে জন্ম তব—এ যুগাবতারে।
দেও ভোগ পুণ্য ভূমে লভিয়ে জনম
পবিত্র করিলে ধরা, শ্রীপদ পরশে॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত উদ্বোধনের পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, বিবেকানন্দ-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বাবু বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় টাইফয়েড্ জ্বরে গত ৪ঠা জুলাই তারিখে রাত্রি এক ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত পরলোকগত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের নিকট যাতায়াত করিতেন; পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন। ইনি গৃহী হইয়াও অনাসক্তভাবে সংসার করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি, বিশ্বাস, পরার্থ-তৎপরতা এবং সর্ব্বোপরি চরিত্রবল ও মিষ্ট ভাষিতায় ইনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এ জীবনে কাহারও সহিত ইঁহার শত্রুভাব ছিল না। চরিত্রগুণে সকলকেই আপনার করিয়া লইতেন। উদ্বোধন পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ইঁহার প্রবন্ধ বাহির হওয়ায় উদ্বোধনের পাঠকগণের নিকট ইনি অপরিচিত নহেন। এক প্রকার ইঁহারই বিশেষ উৎসাহে বিবেকানন্দ-সমিতি কলিকাতায় স্থাপিত হয়—এইজন্য উক্ত সমিতির সভ্যগণ ইঁহার বিয়োগে অতিশয় বিষণ্ণ। ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারগণকে আমরা কি বলিয়া আর সান্ত্বনা দিব? যাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে বিপিন বাবু মায়িক নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সর্ব্বান্তর্যামী সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাঁহাদের শান্তি বিধান করুন।

ইটালীর অন্তর্গত পাডুস্ (Padus) মিউজিয়মের প্রফেসার মোছেটী (Moschetti) ভূমি খনন করিতে করিতে কতকগুলি ইজিপ্টের জিনীস পাইয়াছেন। অনেকগুলি ইষ্টকস্তূপও সেই সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে গ্রীক্ বণিকেরা আলেক্জেন্দ্রিয়া হইতে ইটালীতে যে ইটের ব্যবসা করিত এই ভূখননে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইট দিয়ে পাকা বাড়ী ঘর প্রস্তুত করা ইজিপ্ট হইতেই যে ইয়ুরোপে প্রচারিত হয়,এটী তাহার অন্যতর প্রমাণ।

জেনারেল বুথ্ ভারত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার মতের কথায় বলেন, "He made it plain that, if he could have his ways, he would have all men free to belive suth religious creeds and *observe such religious customs as they conscientiously* preferred" অর্থাৎ সম্রাট এক সময়ে আমায় বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সাধ্য থাকিলে তিনি জগতের নরনারী যে যে ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে তাহাকে সেই বিষয়ে সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা প্রদান করিতেন !"

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের বাটী মেরামতের জন্য সুলতানপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লিডার লালা শম্ভুনাথ বিগত ১লা জুলাই ২০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং ঐ কার্য্য আরম্ভ হইলে আরও ২০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উদ্বোধনের পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মহাসমাধি লাভের অল্প কাল পূর্ব্বেই কাশীধামে বেলুড় মঠের শাখাস্বরূপ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনভজন সহায়ে নিজ মুক্তি সাধনের চেষ্টা ও অপরকে যথাসম্ভব সেই বিষয়ে সাহায্য করা।

সার কথা।

১

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহাকেও বলিতেন, "তাঁহার উপর নির্ভর করো ; ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যাও"। আবার কাহাকেও বলিতেন "তাঁর কৃপা-বাতাস

ত সর্ব্বদাই বইছে; তুমি পাল তুলে দেওনা—তবে ত তাঁর কৃপা-বাতাস অনুভব হবে"। প্রথমটী নির্ভরতা, দ্বিতীয়টী পুরুষকার। সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় উভয়ই সত্য।

২

স্বামী বিবেকানন্দ একবার লণ্ডন থেকে জাহাজে চড়ে এমেরিকায় যাইতেছিলেন। সঙ্গে ৪।৫ জন ভক্ত ছিলেন। রাত্রে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া নির্ম্মল আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়াছে, নীল জলনিধির দূর চক্রবালে আকাশ ও সাগর যেন এক হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া একজন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক স্বামীজিকে বলিয়াছিলেন "আহা, আজ প্রকৃতির কি শোভাই হয়েছে! সমুদ্র, আকাশ, চাঁদের আলো এই সব দেখে মনে কতই না ভাবের স্ফূর্ত্তি হচ্ছে"! শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন "যাঁহার বহির্বিকাশই এমন আনন্দপূর্ণ, সকল আনন্দের মূল সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যে কত সুন্দর, তাহা একবার স্থিরচিত্তে অনুভব কর"।

৩

কোন এক সাধু একবার যমুনার জলে স্নান করিতে নাবিয়াছেন। একটা বিছে জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। জল হইতে তুলিয়া সেটাকে তীরে নিক্ষেপ করিবার কালে বিছেটা সাধুর হস্তে হুল ফুটাইয়া দিল। সাধু তাহাতে অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিলেন। পরক্ষণে বিছেটা আবার জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এবারেও সাধু তাহাকে উদ্ধার করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিলেন—এবারেও বিছেটা তাঁহাকে দংশন করিল। তৃতীয় বার বিছেটা যখন জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সাধুটী তাহাকে আর তুলিতে যত্নপর হইলেন না। ভাবিলেন, এমন অকৃতজ্ঞ জীবের উদ্ধার সাধন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। অমনি দৈববাণী হইল, "ওহে সাধু! বিছে তাহার সহজাত বৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই, তুমি সাধু হইয়া তোমার পরোপকার-ব্রত হইতে কেন নিবৃত্ত হইতেছ?" দৈবাদেশ শ্রবণ করিয়া সাধুর চমক হইল ও বিছেটার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন।

৪

একজন সাধু বহুকাল গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই গায়ত্রী দেবীর কৃপালাভ

করিতে পারেন নাই। অবশেষে হরিদ্বার তীর্থে উপস্থিত হইয়া তিনি একাদিক্রমে তিন বৎসর জপ করিতে লাগিলেন। তথাপি অনুভূতির আভাস পাইলেন না। কাজেই সন্দেহ, দুঃখ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল এবং আচার নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া তিনি অনাহারে গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন এইরূপ পড়িয়া থাকার পর একজন গৃহী ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহার গৃহে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। সাধুটী তাঁহার বাড়ীতে গিয়া যখন আহারে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তখন ঐ গৃহী ভক্ত বলিলেন, "মহাশয়, গত কল্য রাত্রে গায়ত্রী দেবী আমাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন যে, আমার অমুক ভক্ত আজ তিনদিন অনশনে পড়িয়া আছেন—তুমি তাঁহাকে অন্নদান কর।" সাধুটী শিহরিয়া উঠিয়া ভোজন সাঙ্গ না করিয়াই ছুটিলেন এবং যাইতে যাইতে পাগলের মত বলিতে লাগিলেন "মা! তা হলে আমার ডাক তোমার কাছে পঁহুছিযাছে! আমি এবার এক মনে আবার জপে মনোনিবেশ করিব।" তার পর বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

৫

স্বামী বিবেকানন্দ একদা ইংলণ্ডে কোন এক বড় লোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রাতে দুইটী যুবক ঐ বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ইঁহাদের পিতা একজন বড় ধনী ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে দেউলিয়া হইয়া যান। যুবকদ্বয় তাঁহাদের পিতৃবন্ধুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। বিষয়কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় বড় ছেলেটী বলিলেন যে, তিনি নানারূপ কর্ম্মের মত্‌লব আঁটিতেছেন, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। দ্বিতীয় ছেলেটী বলিলেন যে, তিনি সামান্য গচ্ছিত অর্থে একখানি মুদীর দোকান খুলিয়াছেন এবং তাহাতে সামান্য আয়ও হইতেছে। ঐ বড় লোকটী এই দ্বিতীয় যুবকটীকে পর দিন এক হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক্ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু প্রথম যুবককে কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। স্বামীজি কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ঐ বড় লোকটী বলেন যে, প্রথম যুবকটী দিনরাত কেবল মতলবই আঁটিতেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় যুবকটী যাহাই হউক, কোনরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকেই সাহায্য করা উচিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [স্বামী সারদানন্দ।

ঠাকুরের গুরুভাব ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারকুলের ত কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জন সমাজে যে ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়! শরীরেন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থা সকলের অনুকূলতা প্রভৃতি কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে তাঁহাদের গুরু করিয়া তুলে তাহা নহে। দেখা যায়, যেন উহা তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, যাহা লইয়া তাঁহারা জীবন আরম্ভ করিয়া থাকেন, এবং বর্ত্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণ, সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! ঠাকুরের জীবনে গুরু ভাবোৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক ঐরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অল্পাধিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইতে হয়; আর, কিরূপে ঐভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকাল, যাহার কথা আমরা পাঠককে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে এত দিন বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মথুর বাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে—এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের অব-

ধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশ জন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহুগুরু গ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, 'ন্যাংটা' তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময়ে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবল মাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধনপ্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না, অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্প কালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সে জন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহু কাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কিছু-কাল পূর্ব্ব হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৺কাশীধামে তপস্যায় কাল কাটাইতেছিলেন। ইহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহু কাল দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতটে যথা দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে, বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতেই শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্টিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধনপ্রণালী সকলই একে একে করাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমত সম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতেও সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন; এবং শুনিয়াছি যে, ঠাকুরকে ঐ

রূপে সাধনকালে সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি অনেক কাল বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং কখন কখন ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে পর্য্যন্ত যাইয়া ঠাকুরের আত্মীয়দিগের মধ্যে তাঁহাদেরই একজন হইয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন শ্বশ্রূর ন্যায় সম্মান এবং মাতৃ সম্বোধন করিতেন।

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্যবাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন। আরিয়াদহে দেব মণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। আর এ দিকে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং তিনি বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐই দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ঐ ননী ভোজন করিতেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখন কখন কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।

ব্রাহ্মণী গুণে যেমন রূপেও তেমনি অসামান্যা ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুর বাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্য দর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় যথা তথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। এক দিন নাকি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "ভৈরবি, তোমার ভৈরব কোথায়?" ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থির ভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন। সন্দিগ্ধমনা

বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, 'ও ভৈরব ত অচল।' ব্রাহ্মণী তখন ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 'যদি অচলকে সচল করিতেই না পারিব, তবে আর ভৈরবী হইয়াছি কেন?' ব্রাহ্মণীর ঐরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই 'বড় ঘরের মেয়ে' বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাঁহার ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরণীরূপে কাহারও ঘর কখন উজ্জল করিয়াছিলেন কি না, এবং প্রৌঢ় বয়সে এই রূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনও শুনি নাই। আবার এত লেখাপড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতি লাভ, কোথায়, কবে করিলেন—তাহাও আমাদের কাহারও কিছু মাত্র জানা নাই।

সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না। দৈব কর্ত্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত হওয়াতেই তাহার পরিচয় বিশেষরূপেই পাওয়া যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায় সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন আর ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্ব্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে এত দিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, আজ পেলেম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দিব।' বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দুই জনেই উচ্চ দরের সাধক ছিলেন।

কিন্তু সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধ-কাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার 'গুটিকা সিদ্ধি' লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সতর্কিত ভাবে রক্ষিত, দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মানবমন ঐ প্রকার সিদ্ধাই সকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে, এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাজালে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই পাপের বৃদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কার বৃদ্ধিতেই ধর্ম্মহানি এবং অহঙ্কার নাশেই ধর্ম্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল', একথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন! বলিতেন, 'ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব'—এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ওই বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুলো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ও সকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর এগুতে পারে না।' স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন—কতকটা মন সর্ব্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন তিনি 'ধ্যানসিদ্ধ'। ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তি সকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত! ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে উঠিত যে, তিনি দেখিতেন, অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন! ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য

কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে! কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর, ঠাকুরকে ঐকথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, 'ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছু দিন আর ধ্যান করিস্ নি।'

গুটিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কামকাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাই প্রভাবে তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন, এবং অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হন!

গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীর নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শম্ভু বাবু ২৫০৲ দিয়া কালিবাড়ীর নিকট কিছু জমী খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর থাকিবার জন্য ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন তখন গঙ্গাস্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিতে থাকিতে এক বার তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্তা হন; তখন শম্ভু বাবুই চিকিৎসা পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শম্ভু বাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; প্রতি জয়মঙ্গল বারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শম্ভুবাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়ীভাড়া এবং খাদ্যাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুর বাবুর শরীর ত্যাগের পরেই শম্ভুবাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার দ্বিতীয় রসদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে কয়েক ঘণ্টা কাল কাটাইয়া আসিতেন।

গিরিজার সহিত সেদিন শম্ভু বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথায় বার্ত্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব হয়। গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কল্‌কেতে ভরপূর এক দম লাগিয়ে কল্‌কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়িতে থাকে, অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কল্‌কেটা না দিতে পারিলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না, ভক্তেরাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে তন্ময় হয়ে ব'লে আনন্দে চুপ করে ও অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়'। সেদিনও শম্ভুবাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা, কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁস হইল! শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্খলন ও দিক্ ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছেন, শম্ভুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন 'দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।' এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন! ঠাকুর বলিতেন, 'সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম!'

এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশী দিন রহিল না! এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাহার ঐ সকল সিদ্ধাই চলে গেল!" আমরা ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) "মা এর ভিতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের যত শক্তি সব আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তাদের মন আবার ঐ সব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল!"

এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, "ও সকলে কি আছে? ও সব সিদ্ধাইর বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। একটা গল্প শোন—এক জনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখা পড়া শিখে ধার্ম্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসারধর্ম্ম করতে লাগলো। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম, বার বৎসর অন্তে, ইচ্ছা হলে, একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভেয়ের জমী চাষ বাস ধন ঐশ্বর্য্য দেখতে দেখতে তার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাহিরে আসিয়া দেখে, তার বড় ভাই! অনেক দিন পরে ভেয়ের সঙ্গে দেখা, ছোট ভেয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। দাদাকে প্রণাম করে বাড়ীতে এনে বসিয়ে তার সেবাদি করতে লাগল। আহারান্তে দুই ভেয়ে নানা প্রসঙ্গ হতে লাগল। তখন ছোট, বড়কে জিজ্ঞাসা করিল 'দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ সুখ সব ত্যাগ করে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি লাভ করলে আমাকে বল?' শুনিয়াই দাদা বল্লে, 'দেখবি? তবে আমার সঙ্গে আয়।' বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হল এবং বল্লে 'এই দেখ্।' বলেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল! গিয়ে বল্লে 'দেখ্লি'? ছোট ভাইও পার্শ্বের খেয়া নৌকার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভেয়ের নিকটে গিয়ে বল্লে 'কি দেখলুম?' বড় বল্লে, 'কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?' তখন ছোট ভাই হেসে বল্লে, 'দাদা, তুমিও ত দেখ্লে, আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট সয়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম ত আধ পয়সা মাত্র!' বড় ভেয়ের ঐ কথায় তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।'

ঐরূপে কথাচ্ছলে ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্ম্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতা লাভ অতি তুচ্ছ হেয় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! ঠাকুরের ঐরূপ আর একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'এক জন যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যাকে যা বলিত, তাহাই তৎক্ষণাৎ হইত; এমন কি কাকেও যদি বলত 'মর,' ত সে

অমনি মরে যেত, আবার যদি তখনি বলত 'বাঁচ' ত তখনি বেঁচে উঠত! একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে, তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুনলে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধরে ঐরূপে তপস্যা কচ্ছেন! দেখে শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বল্লে "ওহে! এতকাল ধরে ত 'ভগবান্, ভগবান্' করচ, কিছু পেলে বলতে পার?" ভক্ত সাধু বল্লেন, "কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার ত আর অন্য কোন কামনা নাই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাই পড়ে পড়ে তাঁকে ডাকছি, দীন হীন বলে যদি কোন দিন কৃপা করেন।" যোগী ঐ কথা শুনেই বল্লে, 'যদি নাই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ড শ্রমের আবশ্যক? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।" ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন, শুনতে পাই কি?" যোগী বল্লে, "শুনবে আর কি, এই দেখ!" এই বলে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাহাকে বলিল, 'হাতী, তুই মর!' অমনি হাতীটা মরিয়া পড়িয়া গেল! যোগী দম্ভ করিয়া বল্লে 'দেখলে? আবার দেখ।' বলেই মরা হাতীটাকে বল্লে, 'হাতী, তুই বাঁচ।' অমনি হাতীটা বাঁচিয়া পূর্ব্বের ন্যায় গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! যোগী বল্লে, 'কি হে, দেখলে ত?' ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন; এখন বল্লেন, কি আর দেখলুম বলুন, হাতীটা একবার মলো, আবার বাঁচলো; কিন্তু বল্‌বেন কি, হাতীর ঐরূপ মরা বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তি লাভ করে বার বার জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরা ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না, আপনার অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে?" যোগী তখন নির্ব্বাক হয়ে রইল এবং তার চৈতন্য হল!'

চন্দ্র * ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয় পথে

---

* স্বামী বিবেকানন্দের শরীরত্যাগের পর ১৯০৩ খৃঃ বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন। মন্দিরে যাইয়া প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি পরিধেয় ধুতি, গামছা

অনেক দূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দর্শন লাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধায়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ে চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ংও সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ লাভে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তাহারও পরিচয় আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, নির্ব্বিকল্প অবস্থার অধিকারী 'ল্যাংটা' তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটিতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়া গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্তপথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'বাবা,—ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপ সম্বোধন করিতেন—ওর কাছে বেশী যাওয়া আসা করো না, বেশী মেশামিশি করো না; ওদের সব শুষ্ক পথ; ওর সঙ্গে মিশ্‌লে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব প্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে!' ইহাতেই বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্যা হইলেও একথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বেদান্তোক্ত যে নির্ব্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্ক মার্গ বলিয়া নিদ্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তিলাভের প্রথম সোপান, যে, শুদ্ধবুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে কোনরূপ হেতুশূন্য হইয়া ভক্তি প্রেম করিতে পারেন এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান, দুইই এক পদার্থ!' আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী একথা বুঝিতেন না এবং বুঝিবেন না বলিয়াই ঠাকুর পুরী স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক

ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটিমাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। মঠে একদিন মাত্র অবস্থান করিয়া তিনি চলিয়া যান; পুনরায় আর আসেন নাই। ঠাকুরের নিকট যাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম, ইনিই সেই চন্দ্র কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে ঐরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। মঠস্থ স্বামিগণ তাঁহাকে বিশেষ আদর সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে বলিলেও কিন্তু তিনি থাকিলেন না। হইতে পারে, প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্রই তিনি।

ধারণ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। কারণ, শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উত্তর দিকের নহবৎখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীর ভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্রে পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বর-সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে ; সেজন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন, এবং বাহ্যিকে শৌচাচার প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নাম জপ পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীরভাবের সাধকে কামক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চনরূপ রসাদির আকর্ষণ তাহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কামকাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া, উহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন প্রাণ অর্পণ করিবেন। দিব্য ভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন যাঁহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মত ভাসিয়া গিয়াছে এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় যাঁহাতে ক্ষমার্জ্জব-দয়া-তোষ সত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের ভাবুক, মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধমাধিকারীই পশুভাবের সাধক।

বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবে অধিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণী দেখিলেন, গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন, সতী বা

নটী কোন স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনি শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয় এবং কাঞ্চনাদিধাতুসংস্পর্শে সুপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়! এ জ্বলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়বিভবাদির প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্ট কাল তীব্র তপস্যায় কাটাইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।

ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশী মেশামিশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, এ কথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ন্যাঙটো ছেলে, বড় হইয়া বাটীর অপর কাহাকেও ভাল বাসিলে বা আদর যত্ন করিলে, তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি এই ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মণীর ন্যায় অত উচ্চদরের সাধিকার মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এতকাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের ন্যায় 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের মতই অর্পিত হইয়াছিল। তাহাতে আর জোয়ার ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায় মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্ব্বদাই ভালবাসিতকে চিরকালের মত বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও! এতটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে চাও না! মনে কর, স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসিত আর তোমাদের থাকিবে না! অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে! তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্ব্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসিতকে স্বাধীনতা দেয় না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা

চাহে, তাহাতেই আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থসম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তোমার ভালবাসিতকেও চরমে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তি পর্য্যন্ত আনিয়া দিবে!

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্ব্বোক্ত কথাটি বুঝিতেন না বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থা হন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুত্বপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া 'তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়,' 'তাঁহার কথা সকলে সর্ব্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই,' এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে যে কখন কখন শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্ব্বদা ভীতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিতেন! যাহাই হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্ব্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব জয়ে সমর্থা হইবেন; এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার টান সোণার শিকলে বন্ধনের ন্যায় হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং 'রমতা সাধু ও বয়তা জল কখন মলিন হয় না' * ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন ও তপস্যায় কালহরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাব-সহায়েই ব্রাহ্মণীর যে এই প্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।

* সংসারবৈরাগী সাধুদিগের ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। 'রমতা' অর্থাৎ নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর স্রোত বহিতেছে এইরূপ জলে কখন মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্য-পর্য্যটনশীল সাধুর মন কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।

তোতাপুরী লম্বা চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেক কাল কাটাইতেন। আর সর্ব্বদা বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ল্যাংটা' নামে নির্দ্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে নাই বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন ল্যাংটা কখন ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা অগ্নিসেবা করিতেন। নাগা সাধুরা অগ্নিকে মহাপবিত্র ভাবে দর্শন করে; এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর 'ধূনি' নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধূনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য সমুদায় প্রথমে ধূনি রূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ল্যাংটা সেজন্য পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধূনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক, ল্যাংটার ধূনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল, ল্যাংটা ঐ ধূনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্য জগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, ল্যাংটা তখন উঠিয়া ধূনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও ল্যাংটা অনেক সময় ধ্যান করিতেন। কিন্তু লোকে না জানিতে পারে, এমন ভাবে করিতেন। সেজন্য পরিধেয় চাদরে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া ধূনির ধারে শবের ন্যায় লম্বা হইয়া ল্যাংটাকে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, ল্যাংটা নিদ্রা যাইতেছেন!

ল্যাংটা নিকটে একটি জলপাত্র বা 'লোটা', একটি সুদীর্ঘ চিম্‌টা এবং আসন করিয়া বসিবার জন্য একখণ্ড চর্ম্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্ব্বদা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া রাখিতেন। লোটা ও চিমটাটি ল্যাংটা নিত্য মাজিয়া ঝক্‌ঝকে রাখিতেন। ল্যাংটার ঐরূপ নিত্য ধ্যানানু-

ষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, 'তোমার ত ব্রহ্মলাভ হইয়াছে, সিদ্ধ হইয়াছ, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?' ল্যাংটা ইহাতে ধীরভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'কেমন উজ্জ্বল দেখ্‌ছ? আর যদি নিত্য না মাজি?—মলিন হয়ে যাবে, না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভাস করে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মাজিয়া ঘসিয়া রাখিলে মলিন হইয়া পড়ে।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ল্যাংটা গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন "কিন্তু যদি সোণার লোটা হয়? তাহলে ত আর নিত্য না মাজিলেও ময়লা ধরে না।" ল্যাংটা হাসিয়া স্বীকার করিলেন 'হাঁ, তাহা বটে'। নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে ল্যাংটার কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা ল্যাংটার নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা ঠাকুরের 'সোণার লোটায় ময়লা ধরে না' কথাটি ল্যাংটার মনেও চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। ল্যাংটা বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মত উজ্জ্বল! গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান প্রদান ইঁহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।

বেদান্তশাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়। সম্পূর্ণ অভী হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা। যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই, ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া কোথাই বা হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই বিহার নাই, নিদ্রা নাই জাগরণ নাই, অভাব নাই আলস্য নাই, শোক নাই হর্ষ নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই, অতীত নাই ভবিষ্যৎ নাই—মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি সহায়ে যাহা কিছু দেখে শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই! এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র 'নেতি নেতি'র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পারে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষ দর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদাসর্ব্বক্ষণ হওয়ার নামই 'জ্ঞানে অবস্থান', এবং এই প্রকার জ্ঞানে

অবস্থান হইলেই সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায়, এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহংজ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্প কালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর, নিত্য-মুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাঁহারা কোন বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু-জনের কল্যাণ সাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্প কালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্ম্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। আর, যাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই, তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং, মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন অথবা অত্যদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন মানব, সেই অব-তার পুরুষেরা এই পূর্ণজ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোককল্যাণের নিমিত্ত জন্মজরাশোকহর্ষা-দির মিলন ভূমি সংসারে আসিতে পারেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনের ফলে পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্য্যই মানব-সাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায় তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের দোষগুণ কখন স্পর্শ করিতে পারিত না; এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না! কারণ, ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথায়ও অবস্থান করিতে পারিতেন না! ঠাকুরের অদ্ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! ঠাকুরের কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই ছিল!

তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একটি ভূতুড়ে ঘটনাও বলেন; তাহা এই—গভীর নিশীথে তোতা এক দিন ধূনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন; জগৎ নিরব, নিস্তব্ধ; ঝিল্লি ও মধ্যে মধ্যে মন্দির চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর

নিস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুর ও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখা সকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পাদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ন্যাংটা নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষ প্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব; এই দেবস্থান রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি'। ন্যাংটা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই; তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই; এস, বস, ধ্যান কর'। পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন! ন্যাংটা ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে ন্যাংটা ঠাকুরকে ঐ ঘটনা বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, 'হাঁ উনি ঐ খানে থাকেন বটে; আমিও উঁহার দর্শন অনেক বার পাইয়াছি। কখন কখন কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। কোম্পানি, বারুদখানার (powder magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমীটি একবার লইবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জ্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না, সে জন্য। মথুরত রাণী রাসমণির তরপ থেকে কোম্পানীর সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানী জমীটি না নেয়। সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলিয়াছিলেন, কোম্পানী জায়গা নিতে পারবে না; মামলায় হেরে যাবে। বাস্তবিক ও তাহাই হ'ল!'

ন্যাংটার জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়ত ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ আবার পূর্ব্ব নাম ধাম গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ঠাকুর হয়ত সেজন্যই ঐ প্রশ্ন ন্যাংটাকে কখন করেন নাই। তবে বেলুড়-মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী পরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী

গোস্বামী পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্ত্তি কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুস্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমৎ তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনও যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার সমাজে এখনও উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসি-মণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্তশাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহু কাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায় ও সাধনরহস্য অবগত হন। কারণ, ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মণ্ডলীতে সাত শত সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত সত্য সকল জীবনে অনুভবের জন্য ধ্যানাদি নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান শিক্ষাদি দানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এবিষয়েও ল্যাংটা ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাষ দিয়াছিলেন। ঠাকুরও ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশচ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, ল্যাংটা বল্‌ত, তাদের দলে সাত শ ল্যাংটা ছিল। যারা এই প্রথম ধ্যান শিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌চে, তাদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত! কেন না কঠিন আসনে বসে ধ্যান করলে পা টন্ টন্ করবে; আর ঐ টন্‌টনানিতে অনভ্যস্ত মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তার পর তার যত ধ্যান জম্‌ত ততই তাকে কঠিন কঠিনতর আসনে বসে ধ্যান করতে দেওয়া হত। শেষ কালে শুধু চর্ম্মাসন ও খালি মাটিতে পর্য্যন্ত বসে তাকে ধ্যান করতে হত। আহারাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হয়ে থাকতে অভ্যাস করান হত। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান, ইত্যাদি অষ্ট পাশে মানুষ জন্মাবধি বদ্ধ আছে কি না? এক এক করে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তার পর

ধ্যানাদিতে মন পাকা হয়ে বস্‌লে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে তার পর একা একা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হ'ত। ল্যাংটাদের এই রকম সব নিয়ম ছিল। মণ্ডলীর মোহন্ত নির্ব্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজির নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, 'ল্যাংটাদের ভিতর যারা ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখ্‌তো, গদি খালি হলে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত করে ঐ গদিতে বসাত। তা না হলে টাকা মান ক্ষমতা হাতে পড়ে ঠিক থাক্‌তে পারবে কি করে? মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে যে? সে জন্য যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখতো, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকাকড়ির ভার দিত। কেন না, সেই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করবে বলে।'

পুরী গোস্বামীর ঐ সকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়ামোহ ঈর্ষাদ্বেষাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতীর যথা-সময়ে সন্তান জন্মে না, তাঁহারা দেবস্থানে কামন করেন যে, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন। এবং কার্য্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেই-রূপে গুরুর নিকট অর্পিত হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার পূর্ব্বা-শ্রমের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের নিকট কখনও উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

পূর্ব্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজির মনটিও তেমনি সরলবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা, এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়, এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না। পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা ধারণা করিয়া সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনও বেশী ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে।—

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল।
একের দয়া না হ'তে জীব ছারেখারে গেল!"—

'একের' অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল! পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজি মনের হাতে পড়িয়া কখনও ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরস মন সরল ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীর পদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসায় কটাক্ষপাত করে নাই! কাজেই গোঁসাইজী নিজ পুরুষকার, উদ্যম এবং আত্মনির্ভর ও প্রত্যয়কেই সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, ঐ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া তুলে, একথা গোঁসাইজী জানিতেন না। ঈশ্বরকৃপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অনুকূলতা না পাইলে জীবের শত সহস্র উদ্যম ও যে আশানুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া একথা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই! কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন, আজন্ম তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন—যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন—তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই 'মন বুঝেছে, প্রাণে বুঝে না' এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, 'মন মুখ এক' করিতে না পারিয়া সে যে শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্ত্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতামিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে,—একথা গোঁসাইজি কখনও কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! আনিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাৎ। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে মানবমনের ঐরূপ অবস্থার ছবি এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য 'পরমেশ-শক্তি অনাত্মবিস্থা

মায়ার দুরন্ত প্রভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন। এবং সেজন্য দুর্ব্বল মানব-মনের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি কখনও কঠোর দ্বেষ-দৃষ্টি ভিন্ন, করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবের সম্পর্কে আসিয়াই তাঁহার এই অভাব অপনিত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়ই বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগবদ্ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল। ভক্তি ভালবাসা যে মানবকে ভালবাসিতের জন্য সংসারের সকল বিষয় এবং আত্মতৃপ্তি পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বরদর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্ত সাধক যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারও সাধনসহায় জপ কীর্ত্তন ভজনাদি যে উপেক্ষায় বিষয় নহে, একথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গোঁসাইজি ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য, একথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে, পুরী গোস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদি সম্পত্তিসহায় শান্তপ্রকৃতি গোঁসাইজি স্বয়ং ভক্তির শান্তভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরেও ঐ ভাবের ঈশ্বর-ভক্তি বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে জগৎকর্ত্তা মহান্ ঈশ্বরকে নিজ সখা পুত্র স্ত্রী বা স্বামী ভাবে ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, একথা পুরীজির মাথায় কখন ঢোকে নাই। ঐরূপ ভক্তের নিজভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার অনুরোধ, তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য ক্রন্দন নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল-প্রলাপের মধ্যেই গণ্য করিতেন; এবং উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফল লাভ হইতে পারে, একথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদি লইয়া পুরীজির সহিত ঠাকুরের অনেক সময়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।

ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে, 'হরিবোল হরিবোল,' 'হরি গুরু, গুরু হরি,' 'মরি প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন,' 'মন কৃষ্ণ—প্রাণ কৃষ্ণ—জ্ঞান কৃষ্ণ—ধ্যান কৃষ্ণ—বোধ কৃষ্ণ—বুদ্ধি কৃষ্ণ,' 'জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে,' 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বারবার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতে পুরীজির নিকট অপরাহ্ণে বসিয়া নানাধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যিনি বেদান্ত পথের এত উত্তম অধিকারী যে তিন দিনেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মত এ সব অনুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, 'আরে, কেঁউ রোটি ঠোক্‌তে হো?'—অর্থাৎ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট্ আওয়াজ করিতে করিতে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন করচ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'দূর্ শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটি ঠুকচি!' পুরীজিও ঠাকুরের বালকের ন্যায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোনও গূঢ় ভাব আছে, যাহা তাঁহার রুচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে বুঝিতে পারিতেছেন না! উঁহার ঐরূপ কার্য্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজির ধূনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গোঁসাইজি উভয়েরই মন খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধূনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন তাঁহাদের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন! এমন সময় বাগানের চাকরবাকরদিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায়, কল্‌কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধূনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গোঁসাইজি ঠাকুরের সহিত বাক্যা-

লাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধূনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন! এমন কি চিম্‌টা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতও ভয় দেখাইতে লাগিলেন! কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাগা সাধুরা ধূনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ঠাকুর পুরীজির ঐরূপ ব্যবহারে অর্দ্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, 'দূর্ শালা! দূর্ শালা!' ঐ কথা বারবার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন! তোতা ঠাকুরের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'তুমি অমন করচ যে? কি অন্যায় বল দেখি?' ঠাকুর হাসিতে হাঁসিতে বলিলেন, 'তা ত বটে, তবে এই তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টা দেখচি! এই মুখে বল্‌ছিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নাই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতেই উঠেছে! তাই হাস্‌ছি, যে মায়ার কি প্রভাব!' তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ঠিক্ বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিকই ভুলিয়া গিয়াছিলাম! ক্রোধ বড় পাজি জিনীস! আজ থেকে আর ক্রোধ করব না, ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম।' বাস্তবিকই স্বামীজিকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই!

ঠাকুর বলিতেন "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে," "চোখ বুজে তুমি 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', যতই কেন মনকে বুঝাও না, কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট্ করে বিঁদে গিয়ে উহু উহু করে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন মনকে বুঝাও না, তোমার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, পাপ নেই পুণ্য নেই, শোক নেই দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই—তুমি জন্মজরারহিত নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা—যাই শরীরে অসুস্থতা এল, যাই মন সংসারের রূপরসাদি প্রলোভনের সাম্‌নে পড়ল, যাই কামকাঞ্চনের আপাতঃ সুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ করে ফেল্লে, অমনি মোহ যন্ত্রণা দুঃখ সব উপস্থিত হয়ে সব বিচার আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হলে, মায়া না দোর ছেড়ে দিলে, কারুর আত্মজ্ঞান ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, জানবি। চণ্ডীতে আছে শুনিস্ নি?—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং

ভবতি মুক্তয়ে'—মা না কৃপা করে পথ ছেড়ে দিলে কিছুই হবার যো নাই।

"রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। বনের সরু পথ, এক জনের বেশী যাওয়া যায় না। রাম ধনুক হাতে আগে আগে চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের, রামের উপর এমনি ভক্তি ভালবাসা যে, সর্ব্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘন শ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চল্‌তে চল্‌তে রামচন্দ্রকে দেখ্‌তে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন। বুদ্ধিমতি সীতা তা বুঝ্‌তে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হয়ে চল্‌তে চল্‌তে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন 'এই ত্থাখ্'। তবে লক্ষ্মণ প্রাণ ভ'রে একবার তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তি রামরূপ দেখতে পেলেন! সেই রকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিত হয়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখ্‌তে পায় না,জান্‌বি। তিনি যাই কৃপা করেন, অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়! নৈলে, হাজারই বিচার আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে, এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না—সেই রকম জানবি।

তোতাপুরী স্বামীজি ৺জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র। সৎ সংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ,বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর, বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া ত তাঁহাকে কখন তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি দেখান নাই; তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্ত্তির ফাঁদে ত ফেলেন নাই, কাজেই গোঁসাইজির নিকট, পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার যত কিছু বিঘ্ন বাধা, মা যে সে সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—একথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজিকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তাঁহার ঐ মনের ভ্রম বুঝিবার অবসর হইল।

পুরীজির পশ্চিমী শরীর; রোগ, অজীর্ণ, শরীরের শতপ্রকার অসুস্থতা

কাহাকে বলে তাহা কখন জানিতেন না। যাহা খাইতেন, তাহাই হজম হইত ; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন, সুনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর জ্ঞানে ও দর্শনে মনের উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিরাম ধারে মনে প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বাষ্পকনাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে, ঠাকুরের শ্রদ্ধা ভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজি কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের মোচোড় ও টন্‌টনানিতে পুরীজির ধীর স্থির সমাধিস্থ মনও অনেক সময়ে ব্রহ্মসম্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল! 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে' ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন সর্ব্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?

অসুস্থতা হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে না, আর এখানে থাকা যুক্তি যুক্ত নয়। কিন্তু ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায় তিনি চলিয়া যাইবেন? শরীর—হাড় মাসের খাঁচা—রসরক্তপূর্ণ কৃমিকুলসঙ্কুল, দুই দিন মাত্র স্থায়ী দেহ—যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতা দৃষ্টি করিয়া তিনি কি না অশেষ-আনন্দ-প্রদ এই দেব মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন? যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি ত হইতে পারে? আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি? শরীরটাই ভুগিবে, কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? তিনি ত প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তিনি অসঙ্গ নির্ব্বিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধই নাই—তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজি মনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।

ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজির স্থান ত্যাগের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবেন ভাবিয়া কখনও কখনও তাঁহার নিকট উপস্থিত ও হইলেন, কিন্তু অন্য সৎপ্রসঙ্গে ভুলিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনেও পড়িল, ত তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের জন্য বাক্যরুদ্ধ করিয়া দিল ; বলিতে বাধ বাধ হইয়া পুরীজি ভাবিলেন 'আজ থাক্, কাল বলা যাইবে'। এইরূপ

ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজি, ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল এবং স্বামীজির শরীর অধিকতর দুর্ব্বল ও ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর, স্বামীজির শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি সেবনের বন্দোবস্ত ইতি পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা, যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনও পর্য্যন্ত স্বামীজি শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তি লাভ করিতেছিলেন।

রাত্রিকাল—আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামীজিকে স্থির হইয়া শয়ন পর্য্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি নাই! ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যত বার চেষ্টা করি-লেন, তত বারই চেষ্টা বিফল হইল! তখন স্বামীজি নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, এ হাড় মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হক্, জানিয়াছি ত শরীরটা কোন মতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জ্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই ভাবিয়া ল্যাংটা বিশেষ যত্নে মনকে স্থির ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্য সত্যই শুষ্কা হইয়াছেন?—অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুব-

জল পাইলেন না! যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া? ডুবিয়া মরিবার পর্য্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই? একি ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিলেন, মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিবশক্তি একাধারে হরগৌরীমূর্ত্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট্ রূপের দর্শন করিতে করিতে, গম্ভীর অম্বারবে দিক্ সকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি জল ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই, প্রাণ সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব্ব উল্লাসে উল্লাসিত! ধীরে ধীরে স্বামীজি পঞ্চবটীতলে ধূনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন!

প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজির শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন, যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্য-প্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! যাহা হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল পূর্ব্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্য তোমার কাছেও বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা বলিতে দেয় নাই! অন্য প্রসঙ্গে ভুলাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিয়াছে! ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মাকে যে আগে মান্‌তে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' বলে তর্ক করতে? এখন দেখলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি।'

অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবৎ ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিবরামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীর ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দর্শন—কারণ, ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনও এ দিকে ফিরেন নাই।

আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরীর সম্বন্ধে আমরা যত কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায় পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী কিমিয়া বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করিতেন, তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, তিনি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেক বার স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন, তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিদ্যা অবগত আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও বলিতেন, 'ঐ বিদ্যাপ্রভাবে নিজের স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিষেধ আছে, উহাতে গুরুর অভিসম্পাত আছে! তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু—উঁহাদের লইয়া কখন কখন মণ্ডলীশ্বরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন করিতে হয়, এবং তাঁহাদের সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। গুরুর আদেশ, ঐ সময়ে অর্থের অনাটন হইলে ঐ বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে পার।'

এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী,

নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণও যে তাঁহার সহায়ে এইরূপে আধ্যাত্মিক উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান করিতে পারি।

ক্রমশঃ।

ঈষা অনুসরণ।

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

[আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সমুদয় লেখা সর্ব্বসাধারণে যাহাতে জানিতে পারেন ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য সুরক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছি।

সাহিত্য কল্পদ্রুম নামক মাসিক পত্রে, স্বামীজি 'Imitation of Christ' নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। আমরা উহা যতদূর পাইয়াছি, প্রকাশ করিতেছি। উহার সূচনা স্বামীজির মৌলিক রচনা। আমেরিকা যাইবার বহু পূর্ব্বে স্বামীজি কিরূপ ওজস্বিনী ভাষায় লিখিতে পারিতেন, পাঠক ইহাতে তাহার পরিচয় পাইবেন।—উঃ সং।]

সূচনা।

খ্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খৃষ্ট-জগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন "রোম্যান্ ক্যাথলিক্" সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়—ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈষা-প্রেমে সর্ব্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জলন্ত জীবন্ত বাণী আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনী শক্তি বলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে—রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা এবং সাধন বলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান্ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপ্রোষিত বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত

করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন?—যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্ত্তী লোকেরা অনুমান করিয়া "টমাস আ কেম্পিস্" নামক এক জন ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন, কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনরি মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি—'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই,' তাঁহার শিষ্যেরা, তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া বিবাহের বরটী সাজিয়া এক পয়সার মা বাপ হইয়া—ঈষার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না। এ অদ্ভুত বিলাসী, অতি দাম্ভিক, মহা অত্যাচারী, বেরুস এবং ক্রমে চড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান সম্বন্ধে আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইবে।

"সব্ সেয়ান্ কি একমত্" সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" প্রভৃতি উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্ত্তি, এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনের একটী সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব,—

"আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ"।

সিদ্ধ পুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে টীকাকার ঋষি জৈমিনি বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।

যদি 'যবনাচার্য্য' প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ পুরাকালে আর্য্যদিগের নিকট এতাদৃশী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তসিংহের পুস্তক যে এদেশে আদর পাইবে না, তাহা বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকগণের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিব। আশা করি, রাশি রাশি অসার নভেল নাটকে বঙ্গের সাধারণ পাঠক যে সময় নিয়োজিত করেন, তাহার শতাংশের একাংশ ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

অনুবাদ যতদুর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য "বাইবেল" সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।

কিমধিকমিতি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"খ্রীষ্টের অনুসরণ" এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা।

১। প্রভু বলিতেছেন "যে কেহ আমার অনুগমন করে, সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না"। (ক)

যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি, তাহা হইলে খ্রীষ্টের এই কয়েকটী কথা আমাদের স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ক) যোহন ৮। ১২

He that followeth me &c.

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গীতা। ৭ অ-১৪।

অতএব ঈষার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। (ক)

২। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অন্য সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত, তিনি ইহারই মধ্যে লুকায়িত "মান্না" * প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ প্রকার অনেক সময়ে হয় যে, অনেকেই খ্রীষ্টের সুসমাচার বার-ম্বার শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না, কারণ তাহারা খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। অতএব যদ্যপি তুমি আনন্দ-হৃদয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্ট-বাক্য তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সহিত তোমার জীবনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য স্থাপনের জন্য সমধিক যত্নশীল হও। (খ)

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী তেজ-মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য ; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

(ক) To meditate &c.

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনিঃ।
তিষ্ঠেৎ সদা মুক্ত সমস্তবন্ধনং॥ রামগীতা।

মুনি এই প্রকারে অহর্নিশি পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

* ইস্রায়েলেরা যখন মরুভূমিতে আহারাভাবে কষ্ট পাইয়াছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদের নিমিত্ত একপ্রকার খাদ্য বর্ষণ করেন—তাহার নাম "মান্না"।

(খ) But it happens &c.

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। গীতা।

শ্রবণ করিয়াও অনেকে ইহাকে বুঝিতে পারে না।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধি রৌষধশব্দতঃ
বিনা পরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ণমুচ্যতে।

বিবেকচূড়ামণি—৬৪।

"ঔষধ" কথাটিতেই ব্যাধি আরোগ্য হয় না, অপরোক্ষানুভব ব্যতিরেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিলেই মুক্তি হইবে না।

শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরেৎ।

মহাভারত।

যদি ধর্ম্ম আচরণ না কর, বেদ পড়িয়া কি হইবে?

৩। "ত্রিত্ববাদ" সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় তোমার কি লাভ হইবে, যদি সেই সমস্ত সময় তোমার নম্রতার অভাব, সেই ঐশ্বরীক ত্রিত্বকে অসন্তুষ্ট করে? *

নিশ্চয়ই উচ্চ বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না; কিন্তু ধার্ম্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে। (ক)

অনুতাপে হৃদয়শল্য বরং ভোগ করিব,—তাহার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত বর্ণনা জানিতে চাহি না।

যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপা-বিহীন হও। (২)

"অসার হইতেও অসার সকলই অসার, সার একমাত্র তাঁহাকে ভাল-বাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।" (৩) (খ)

তখনই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে, যখন তুমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে ঘৃণা করিবে।

৪। অসারতা—অতএব ধন অন্বেষণ করা এবং সেই নশ্বর পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

---

* খ্রীষ্টিয়ান মতে জনকেশ্বর (পিতা) পবিত্র আত্মা এবং তনয়েশ্বর (পুত্র) ইনি একে তিন তিনে এক।

(ক) Surely sublime language &c.

বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিবেকচূড়ামণি—৬০।

নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল মাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

(২) করিনথিয়ান ১৩।২

(৩) ইক্লিজিয়াষ্টিক ১।২

(খ) Vanity of vanities, all is vanity &c.

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ
অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ॥

(মণিরত্নমালা)— শঙ্করাচার্য্য।

অসারতা—অতএব মান অন্বেষণ করা ও উচ্চ পদ লাভের চেষ্টা করা।

অসারতা—অতএব শারীরিক বাসনার অনুবর্ত্তী হওয়া এবং যাহা অন্তে অতি কঠিন দণ্ড ভোগ করাইবে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অসারতা—অতএব জীবনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের ইচ্ছা করা।

অসারতা—অতএব পরকালের সম্বলের চেষ্টা না করিয়া কেবল ইহ-জীবনের বিষয় চিন্তা করা।

অসারতা—অতএব, যথায় অবিনাশী আনন্দ বিরাজমান, দ্রুতবেগে সে স্থানে উপস্থিত হইবার চেষ্টা না করিয়া অতিশীঘ্র বিনাশশীল বস্তুকে ভালবাসা।

৫। উপদেশকের এই বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ কর—"চক্ষু দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, কর্ণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হয় না।" (১)

পরিদৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ হইতে মনের অনুরাগকে উপরত করিয়া অদৃশ্য রাজ্যে হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর, যেহেতুক ইন্দ্রিয় সকলের অনুগমন করিলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলঙ্কিত হইবে এবং ঈশ্বরের কৃপা হারাইবে। (ক)

যাঁহারা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, তাঁহারাই সাধু।

(১) ইক্লিজিয়াষ্টিক্ ১। ৮

(ক) Strive therefore &c.

ন যাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

মনুঃ।

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

আজ কয়েক দিন স্বামীজি বাগ্‌বাজার ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দুপুরে, কি সন্ধ্যায় তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিরাম নাই, বহু উৎসাহী যুবক—কলেজের বহু ছেলে এ সময় তিনি যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজি সকলকেই আদর অভ্যর্থনা করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজে বুঝাইয়া দেন; স্বামীজির প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্য্যগ্রহণ—সর্ব্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণ দেখিতে নানা-স্থানে গিয়াছেন। ধর্ম্মোৎসাহী নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজির কিন্তু গ্রহণ সম্বন্ধে যেন কোন উৎসাহই নাই। শিষ্য আজ স্বামীজিকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন—স্বামীজির আদেশ। মাছ, তরকারী ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া শিষ্য আজ বেলা ৮টা আন্দাজ ৺বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন্, তোদের বাঙ্গাল দেশের মত রান্না কত্তে হবে, আর গ্রহণের পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।

সে সময় বলরাম বাবুদের বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা কেহই কলিকাতা নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতর হেঁসেলে গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। যোগীনমাতা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধী সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বামীজিও মধ্যে মধ্যে এসে শিষ্যের রান্না দেখিয়া তাঁহার স্নেহের বাঙ্গাল শিষ্যকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখন বা "মাছের জুল" "মাছের জুল" বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে করিতে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখিস্ "জুল" যেন ঠিক বাঙ্গাল দিশি ধরণে হয়। যোগীনমাকেও বলিলেন, "ওকে কিছু বলে দিও না, ওর যেমন ইচ্ছা তেমনি করে রাঁধতে দাও, আমি ঠিক ঠিক বাঙ্গাল দিশি রান্না খাবো।"

শিষ্যও রাঁধিতে রাঁধিতে এক এক বার গিয়ে স্বামীজিকে দর্শন করিয়া আসিতেছে—স্বামীজির প্রেমাকর্ষণে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহার অধিকক্ষণ অন্যত্র অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই। স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন্ "যা, তোর আর এখন এ সব কথাবার্ত্তা শুন্‌তে হবে না—ভাল করে সকাল সকাল রান্না করে ফেল্—বড় খিদে পেয়েছে।" যোগীন মহারাজ স্বামীজির নিকটে ছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "ওর (শিষ্যের) বুদ্ধি দেখ্ না, আমরা খিদেয় মরে যাচ্ছি, আর উনি দর্শনশাস্ত্রের কথা (Philosophy) শুন্‌তে এসেছেন"! শিষ্য কাজেই লজ্জিত হইয়া দৌড়ে হেঁসেলে চলিয়া গেল। যোগীন মহারাজও পেছনে পেছনে এসে শিষ্যকে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওরে, স্বামীজি ক্ষুধায় অস্থির হয়েছেন—শীঘ্‌গির শীঘ্‌গির রেঁধে ফেল্।"

শিষ্য ভাত, মুগের দাল, কৈমাছের ঝোল, ভাজা মাছের টক ও ছোট মাছের সুক্তুনি, রাঁধিয়া ফেলিল। রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় স্বামীজি স্নান করে এসে নিজেই পাতা করে খেতে বসিলেন। "এখনো রান্নার কিছু বাকী আছে," বলিলেও শুনিলেন না, আব্‌দেরে ছেলের মতন বলিলেন "যা হয়েছে শীগ্‌গির নিয়ে আয়, আমি আর বস্‌তে পাচ্ছিনে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।" শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজিকে মাছের সুক্তনি ও ভাত দিয়ে গেল, স্বামীজি তৎক্ষণাৎ খেতে সুরু করিলেন! আর খাইতে খাইতে বলিলেন "আহা এমন মাছের সুক্তুনি কখনো খাইনি।" তার পর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজিকে অন্য সকল তরকারী আনিয়া দিল; এবং স্বামীজিকে দেবার পর, যোগানন্দ-প্রেমানন্দ-প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল না, কিন্তু স্বামীজি ও অন্যান্য মহারাজগণ আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তুনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু স্বামীজি সেই সুক্তুনি খেয়ে বড় খুসী! বলিতে লাগিলেন, "ওরে, আজ থেকে আর ওকে বাঙ্গাল বলে ঠাট্টা করিস্ নে, ওর বাঙ্গালত্ব সব গেছে—কেবল কথার মাত্রায় "ইসে"টা আছে।"* খেতে খেতে স্বামীজি বল্‌ছেন,"এই মাছের "জুলটা" যেমন ঝাল হয়েছে—এমন কিন্তু কোনটাই হয় নাই।" শিষ্য, স্বামীজি

* শিষ্য বঙ্গদেশী লোক। কথায় কথায় "ইসে" উচ্চারণ করিয়া থাকে। এদেশে যেমন কেহ কেহ "ওর নাম্ কি" বলে, সেইরূপ।

ঝাল ভালবাসেন বলে, মাছের ঝোলে খুব লঙ্কা ও জীরেমরিচ দিয়াছে। স্বামীজি ভিন্ন আর সকলেই সে ঝোল খেয়ে সজলনয়নে হুস্‌হাস করচেন! অথচ স্বামীজি ভাল বলেছেন বলে, কিছু বল্‌তেও পারছেন না। টকের মাছ খেয়ে স্বামীজি বল্‌ছেন, "এটা বর্দ্ধমানী ধরণে হয়েছে"। তার পর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজি ভোজন শেষ করিলেন। আচমনান্তে স্বামীজি ভেতরকার ঘরের খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজির সাম্‌নেই দালানে প্রসাদ পেতে বসিল। স্বামীজি তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "যে ভাল রাঁধ্‌তে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মনশুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।"

শিষ্য প্রসাদগ্রহণান্তে স্বামীজির পাদমূলে উপবেশন করিয়া তাঁহার রাতুল পদযুগল ধীরে ধীরে সম্বাহন করিতে লাগিল। স্বামীজি শয়ন করিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

খানিক বাদে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং মেয়েদের উলুধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। স্বামীজি তাই শুনে বলিলেন, "ওরে গেরণ লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে"; এই বলিয়া স্বামীজি একটু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যের আজ একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সে গ্রহণকালে গঙ্গাস্নান ক'রে জপ পুরশ্চরণ করে। স্বামীজির পদসেবা করিতে করিতে সে কথা মনে হওয়ায় ভাবিল, "আমি এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাধিকার লাভ করিয়াছি। ইহাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।" এই ভেবে শিষ্য শান্ত মনে স্বামীজির পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্ব্ব-গ্রাস হয়ে যখন চারিদিক্ সন্ধ্যাকালের মত তমাচ্ছন্ন হয়েছে, তখন স্বামীজি একটু জাগ্রত হয়ে বল্‌ছেন, "খুব গেরণ লেগেছে—নারে?" শিষ্য বল্‌ছে, 'আজ্ঞে হাঁ।' স্বামীজি বাঁ পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

যখন গ্রহণ ছেড়ে যেতে ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজি উঠে মুখহাতে জল দিলেন ও শিষ্যকে তামাক আনিতে বলিলেন। শিষ্য তামাক আনিলে পর স্বামীজি তামাক খেতে খেতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এই গেরণের সময় যে যা করে, তাই নাকি কোটিগুণে পায়—তা মহামায়া এ শরীরেও সুনিদ্রা দেন নাই—তা মনে কল্লুম, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি ত এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তাত হলো না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।"

শিষ্যও স্বামীজির ঐ কথা শুনে ভাবতে লাগল "আজ এ সময় ত আমি গুরুসেবাধিকার পেয়েছিলুম, আমি ত তবে জন্মে জন্মে ঐরূপ পাইব।"

স্বামীজি—ওরে, আজ গঙ্গাস্নান কর্‌লি নি?

শিষ্য—মশায়, আজ আর ও কথা বল্‌বেন না।

স্বামীজি—দেখ্‌না, যোগীনমাকে মন্ত্র সব লিখে দিলুম, তাঁরা গঙ্গায় গিয়ে কত জপ তপস্যা কর্‌ছেন। তুই কিছু কর্‌লি নি? (এই বলে স্বামীজি শিষ্যের মন পরীক্ষা করিতেছেন)।

শিষ্য—মহাশয়, আমি গ্রহণসময় আপনার পদতলে অবস্থান করিয়াছি—তাহাতেই আমার সর্ব্বতীর্থসলিলে স্নান করা হইয়াছে।

শুনিয়া স্বামীজি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তার পর সকলকে সেই ঘরে স্থির হইয়া বসিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামীজি শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতিপূর্ব্বে কথনো স্বামীজির সমক্ষে কিছু বলে নাই। তাহার বুক্ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাগ্মীসম্রাটের নিকট শিষ্য কি বলিবে, ভাবিয়া আকুল হইল। কিন্তু স্বামীজি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জেদ্ করিতে লাগিলেন; শিষ্যকে কিছু বলিতেই হইবে। শিষ্য উঠিয়া "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভো" মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, তারপর গুরু ভক্তি ও ত্যাগের মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা নির্ণয় করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজি পুনঃপুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন "আহা! কেমন সুন্দর বলেছে।"

তার পর সুধীরকে (শুদ্ধানন্দ স্বামীকে) কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। তিনিও ওজস্বিনী ভাষায় বৈরাগ্য ও ত্যাগ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইলেন। স্বামীজি তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া বলিলেন "কালে এ সুন্দর বক্তা হইবে।"

এই বক্তৃতার পর সকলেই বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। এখনো প্রায় সন্ধ্যা হতে এক ঘণ্টা বাকী আছে। স্বামীজি বলিলেন "তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল্।"

শুদ্ধানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?"

স্বামীজি—কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে

একাগ্র করিতে পারিলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হোক্ না কেন, একাগ্র করিতে পারা যায়।

শিষ্য—শাস্ত্রে যে, বিষয় ও নির্ব্বিষয় ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, এর মানেই বা কি ? আর এর মধ্যে কোন্‌টা বড় ?

স্বামীজি—প্রথম কোন একটী বিষয় লয়ে ধ্যান অভ্যাস কর্ত্তে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে তিন দিন ক্রমান্বয়ে মনসংযম করিয়াছিলাম। শেষে আর বিন্দু বলে কিছু দেখ্‌তে পেতুম না। মন নিরোধ হয়ে যেতো—কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠ্‌তো না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া যেন সব দেখ্‌তে পেতুম। তাই মনে হয় যে, কোন সামান্য বাহ্যিক বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেই হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই তোদের দেশে এত দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে কেমন art develop হয়ে ছিল। যাক্ সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তন ও প্রচার করে গেছেন। তার পর, কালে তাতে মনস্থির করাটা ভুলে গিয়ে সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার যো নাই।

শুদ্ধানন্দ—মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হলে তাতে ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হতে পারে ?

স্বামীজি—বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা হয় বটে ; কিন্তু পরে বিষয়েরই জ্ঞান থাকে না, তখন শুদ্ধ "অস্তি" এই বোধ থাকে।

শিষ্য—মনের একাগ্রতা হলেও কামনা বাসনা ওঠে কেন ?

স্বামীজি—ওগুলি পূর্ব্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখনই মারের অভ্যুদয়। মার কিছু বাহিরে ছিলেন না। মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাহিরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য—তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হবার আগে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তা কি মনকল্পিত ?

স্বামীজি—তা নয়ত কি? সাধক তখন বুঝ্‌তে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। বাইরে কিছুই নাই। এই যে জগৎ দেখ্‌ছিস্, এটাও নাই। সকলি মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস দর্শন হয়। তখন "যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি" সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সংকল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। তখনও যে সমনস্ক কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐতে যে বিচলিত হয় সে নানা সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি পুনঃ পুনঃ 'শিব' 'শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, এই তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হোক্। "সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং" বলিয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাশের শেষ করিলেন এবং উঠিয়া বরাণ্ডায় পাইচালি করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

কিছু দিন হইতে আমাদের এ দেশে বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি, বিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা অনেকটা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ কাল ইহা অনেকটা সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেকেই আজকাল এবিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, অনেকেই ইদানীং পত্রিকাদিতে এ বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ প্রাচীন আকরগ্রন্থ অধ্যয়নেও তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু যথারীতি অলোচনা করিতে হইলে প্রণালীবদ্ধ ভাবে করিতে পারিলেই ভাল হয়। একদিকে যেমন নিজ নিজ চিন্তা প্রয়োজন, অপর দিকে তদ্রূপ প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আকরগ্রন্থ অধ্যয়ন করাও আবশ্যক। বেদান্ত শাস্ত্র যতটা সাধকশ্রেণীর সম্পত্তি, ভোগ-বিলাসীর ইহাতে তত দাবি নাই। এজন্য এই শাস্ত্রটী আলোচনা করিতে

হইলে, সাধারণ ভোগবিলাসি-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রাচীন, সাধক-শ্রেণীভুক্ত আচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয়।

এদেশে আচার্য্য-শঙ্কর-মতানুযায়ী বেদান্তশাস্ত্রেরই অধিক প্রচার। এমন কি, বেদান্তশাস্ত্রের মধ্যে কত মতান্তর আছে, তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন, অথচ, এই মতান্তরের কথা উঠিলেই যে ইহা তাঁহাদের নিকট একেবারে নূতন ঠেকে, তাহা নহে। জ্ঞান আছে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার জ্ঞান নাই। এমত স্থলে এই সব মতান্তরের মূল যতই জানিতে পারা যাইবে, ততই আমাদের লাভ। আমরা অনেক সময়ে এ বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে সব সংশয় উত্থাপন করি, তাহা প্রায়ই হয়ত অপর আচার্য্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সে মতটী ভালরূপ জানা না থাকায়, সে সংশয়টী প্রবল প্রতিপক্ষের মতের চাপে চাপা পড়িয়া যায়, তাহার প্রতি সুবিচার করা হয় না,—তাহার পক্ষের সকল কথা শুনিবার সাবকাশ থাকে না।

বেদান্তশাস্ত্রে, আচার্য্য-শঙ্কর-মতের একটী প্রবল প্রতিপক্ষ আচার্য্য রামানুজের মত। আমাদের দেশে এ সময় এ মতটী ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। এখন পূর্ব্ব হইতেই যদি আমরা ইহার আকরগ্রন্থসমূহ প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রমপ্রমাদ অল্প ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি এই ভাবিয়া আচার্য্য-রামানুজ সম্প্রদায়ের অত্যুৎকৃষ্ট একখানি প্রাচীন গ্রন্থের তাৎপর্য্য, এই প্রবন্ধে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

গ্রন্থখানির নাম যতীন্দ্রমতদীপিকা বা যতিপতিমতদীপিকা। ইহার রচয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য্য। ইনি মহাচার্য্যের শিষ্য। মহাচার্য্য আচার্য্য রামানুজের ৫।৭ পুরুষ পরে আবির্ভূত। যতীন্দ্র বা যতিপতি-আচার্য্য রামানুজের একটী নাম। ইহা তাঁহারই মতের দীপিকাস্বরূপ বলিয়া গ্রন্থকার ইহার নাম দিয়াছেন যতিপতি বা যতীন্দ্রমত দীপিকা। বাস্তবিক আচার্য্য রামানুজের এ নামটী সাধারণের মধ্যে তত প্রচারিত নহে বলিয়া অনেক সময় নামটী দেখিয়াই গ্রন্থে কি আছে, জানা যায় না।

রামানুজ-মতের অনেক গ্রন্থ পড়িয়া যে কাজ হয়, বাস্তবিকপক্ষে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির দ্বারাও প্রায় সেই কাজই হইতে পারে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য এ সম্প্রদায়ের যাবতীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থই অবলোকন

করিয়াছেন। ইনি,, ইদানীন্তনীয় লেখকগণের মত গ্রন্থশেষে ঐ সকল গ্রন্থের একটী তালিকাও দিয়াছেন। তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে,আলোচ্য গ্রন্থখানি কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং গ্রন্থকারের দৃষ্টি কতদূর বিস্তৃত।

তালিকাটী এই ঃ—

১। দ্রাবিড় ভাষ্য।	২। ন্যায়তত্ত্ব।	৩। সিদ্ধিত্রয়।
৪। শ্রীভাষ্য।	৫। দীপসার।	৬। বেদার্থসংগ্রহ।
৭। ভাষ্য-বিবরণ।	৮। সঙ্গীতমালা।	৯। ষড়র্থ সংক্ষেপ।
১০। শ্রুতপ্রকাশিকা।	১১। তত্ত্বরত্নাকর।	১২। প্রজ্ঞাপরিত্রাণ।
১৩। প্রমেয়সংগ্রহ।	১৪। ন্যায়কুলিশ।	১৫। ন্যায়সুদর্শন।
১৬। মানযাথাত্ম্যনির্ণয়।	১৭। ন্যায়সার।	১৮। তত্ত্বদীপন।
১৯। তত্ত্বনির্ণয়।	২০। সর্ব্বার্থসিদ্ধি।	২১। ন্যায়পরিশুদ্ধি।
২২। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন।	২৩। পরমতভঙ্গ।	২৪। তত্ত্বত্রয়চুলুক।
২৫। তত্ত্বত্রয়নিরূপণ।	২৬। তত্ত্বত্রয়প্রচণ্ডমারুত।	
২৭। বেদান্তবিজয়।	২৮। পারাশর্য্য বিজয়।	

কেবল ইহাই নহে। গ্রন্থখানির রচনাপ্রণালীও বিশেষ প্রশংসার্হ। সমগ্র সাম্প্রদায়িক মতটীকে সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থারম্ভেই যাবতীয় পদার্থের একটী শ্রেণীবিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে এবং পরে উক্ত বিভক্ত পদার্থের এমন কয়েকটী বিষয় লইয়া গ্রন্থের পরিচ্ছেদবিভাগ করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে গ্রন্থকারের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি অবতার নামে অভিহিত। অবতারণা বা প্রস্তাবনা এই অর্থে উক্ত অবতার শব্দের প্রয়োগ। অথচ, ভগবানের যেমন দশ অবতার, তদ্রূপ ইহার পরিচ্ছেদের সংখ্যাও দশটী। ইহার নির্ঘণ্ট এই রূপ।—প্রথমাদি তিনটী অবতারে ত্রিবিধ প্রমাণ, চতুর্থ হইতে নবম পর্য্যন্ত ছয়টীতে ছয় প্রকার দ্রব্য এবং শেষ পরিচ্ছেদে অদ্রব্যের বিষয় আলোচিত। ত্রিবিধ প্রমাণ বলিতে সকলেই অবগত আছেন যে, উহা সাংখ্যমতের তিনটী প্রমাণ ; যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। দ্রব্য ছয় প্রকার। ইহা ন্যায় বা বৈশেষিক সম্মত দ্রব্য নহে, ইহা সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব। দ্রব্য ছয়টী ; যথা— প্রকৃতি, কাল, নিত্যবিভূতি, বুদ্ধি, জীব ও ঈশ্বর। অদ্রব্য বলিতে দশ প্রকার পদার্থ বুঝিতে হইবে, ইহা পরে স্পষ্ট ভাবে বলা হইতেছে।

প্রথম অবতারে গ্রন্থকার, প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলোচনার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত-

পদার্থবিভাগ, এবং তৎপূর্ব্বে, গ্রন্থরচনার প্রতিজ্ঞা, এবং তৎপূর্ব্বে গুরু ও ইষ্ট নমস্কার করিয়াছেন। গুরু ও ইষ্ট-নমস্কারেও গ্রন্থকারের নিষ্ঠার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। গ্রন্থরচনার প্রতিজ্ঞামধ্যে, ইনি এক কথাতেই যেন ইহাঁদের সমগ্র মতটাই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উহার যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

গুরু ও ইষ্ট-নমস্কার ; যথা—

"করিশৈলনাথ—শ্রীবেঙ্কটেশ, ঘটিকাদ্রিসিংহ—শ্রীদেবরাজ, কৃষ্ণের সহিত যতিরাজ এবং অদ্য স্বপ্নেদৃষ্ট মদীয় পূজনীয় গুরুদেবকে বন্দনা করি।"

বলাবাহুল্য প্রথম চারিটী নাম এ সম্প্রদায়ের পরম পবিত্র তীর্থ ও তাহার অধিষ্ঠিত দেবতাদ্বয়। যতিরাজ—স্বয়ং রামানুজাচার্য্য। নিজগুরুদেবের বিশেষণস্বরূপ পদ কয়টী অর্থাৎ অদ্য স্বপ্নেদৃষ্ট এই অংশটী গ্রন্থকারের গুরু-ভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাবাক্যটী এই রূপ—

"বেদান্তাচার্য্য মহাগুরু যতীশ্বরকে প্রণাম করিয়া অজ্ঞজন-বোধার্থ যতীন্দ্র-মত দীপিকা রচনা করিতেছি।

শ্রীমন্নরায়ণই চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট সেই অদ্বৈত তত্ত্ব। (তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তিনিই তাহার উপায়, তাঁহাকে লাভের উপায় তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই।) ভক্তি ও প্রপত্তি বা শরণাগতি দ্বারা প্রসন্ন তিনিই "উপায়" এবং অপ্রাকৃত দেশবিশিষ্ট তিনিই "উপেয়" বা প্রাপ্য। এই কথাই ব্যাস, বোধায়ন, গুহদেব, ভারুচি, ব্রহ্মানন্দি, দ্রাবিড়াচার্য্য, শ্রীপরাঙ্কুশনাথ যামুনমুনি এবং রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদান্তবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মহাচার্য্যের কৃপা-ভিখারী আমি, আমা দ্বারা, ইহাঁদেরই মতানুসারে অজ্ঞজনবোধার্থ, বেদান্তানুসারী যতিপতিমতদীপিকা নামক শারীরক পরিভাষা সংক্ষেপে যথামতি প্রকাশিত হইতেছে।"

এই কয়টী কথাতেই সুধী পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ সম্প্র-দায়ের লক্ষ্য কি। ইহাদের মতে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় অন্য কিছু নহে, ইহা ভগবৎপ্রসন্নতা মাত্র, এবং ইহাদের সম্প্রদায় সেই ভগবদবতার মহামুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব হইতে মহাত্মাগণের মধ্য দিয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

ইহার পর গ্রন্থকার উক্ত পদার্থবিভাগ প্রদান করিয়াছেন। আমি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য তাহা কুলুজির মত করিয়া অঙ্কিত করিলাম।

পদার্থ
প্রমাণ
প্রমেয়
প্রত্যক্ষ
অনুমান
শাব্দ
দ্রব্য
অদ্রব্য ১০টী
সত্ত্ব
রজ
তম
শব্দ
স্পর্শ,
রূপ, রস, গন্ধ
সংযোগ
শক্তি
জড়
অজড়
প্রকৃতি
২।৪
প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার মন, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্র, ৫ মহাভূত
কাল
বর্ত্তমান
ভূত
ভবিষ্যৎ
পরাক্
প্রত্যক্
নিত্য বিভূতি
ধর্ম্ম ভূত জ্ঞান
জীব
ঈশ্বর
বদ্ধজীব
মুক্ত জীব
নিত্য জীব
বুভুক্ষু
মুমুক্ষু
পর
ব্যূহ,
বিভব
অন্তর্য্যামী
অর্চ্চাবতার
মৎস্যাদি অস্ত
অর্থকামপর
ধর্ম্মপর
কৈবল্যপর
মোক্ষপর
সংকর্ষণ
বাসুদেব
প্রদ্যুম্ন
অনিরুদ্ধ
দেবান্তরপূজক
ভগবৎপূজক
ভক্ত
প্রপন্ন
শ্রীরঙ্গম
বেঙ্কাটাদী
হস্তিগিরি
যাদবাদী
ঘটিকাচল
একান্তী
পরম একান্তী
দৃপ্ত
আর্ত্ত

ধীমান্ পাঠকবর্গমাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন জিনীসের পরিচয় দিতে হইলেই তাহার জাতি বা শ্রেণীর কথা বলিতে হয়। কারণ, যদি আমরা জানিতে পারি, এই জিনীসটা এই শ্রেণীর বা জাতির অন্তর্গত, এবং পক্ষান্তরে তাহার ভিতর আবার কত শ্রেণীভেদ আছে, তাহা হইলে তাহার অনেক কথাই জানা হয়। গ্রন্থকার এই জন্য যে সমস্ত বিষয় তিনি গ্রন্থমধ্যে বিচার করিবেন সর্ব্বাগ্রে তাহার একটী শ্রেণীবিভাগ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার যে বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, এই বিষয়ের অনভিজ্ঞতা বশতঃ বৃথা সকলের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইয়া থাকে। এখন এই বিভাগের কথা যাঁহারই মনে থাকিবে, তিনি আর কখন ধরুন"কাল" পদার্থকে"অজড়" বলিতে পারিবেন না অথবা "শক্তি" পদার্থকে "দ্রব্যের" মধ্যে ফেলিতে পারিবেন না। এইরূপে এই বিভাগের দ্বারা পদার্থের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইয়া গেল। তাহার পর এই সমুদায় পদার্থের মধ্যে ত্রিবিধ প্রমাণ, প্রকৃতি, কাল, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি ষড়্বিধ দ্রব্য এবং দশবিধ অদ্রব্য বিচার করায়, প্রকৃতপক্ষে সকল কথাই বিচার করা হইল। পরিশেষে এই দশটী প্রস্তাবনা দ্বারা ভগবানের দশ অবতারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পাঠকের মনোবৃত্তিকে ভগবন্মুখী করিয়া দেওয়া হইল। গ্রন্থকারের ইচ্ছা, যেন লোকে ভগবানের দশ অবতারের কথা মনে করিয়া যেমন তাঁহার দয়া, মহিমা, জগৎপালনের কথা স্মরণ করে, এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইয়া তদ্রূপ এই মতের অনুরূপ গুণের কথা চিন্তা করুক।

ইহারই পর উক্ত পদার্থসমূহের লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। একটা জিনীসের একটা লক্ষণ করা হইল, কিন্তু সেটা পরীক্ষাতে কতদূর টিকিতে পারে, অর্থাৎ সেই লক্ষণ ধরিয়া সেই জিনীসটাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় কি না, ইহা না জানিতে পারিলে সে লক্ষণ করা লাভ কি? এজন্য গ্রন্থকার যেমন যেমন লক্ষণ করিবেন অমনি তাহার পরীক্ষাও করিবেন। অবশ্য এ লক্ষণ এই অবতারে (অর্থাৎ ১ম পরিচ্ছেদে) কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের—অন্য কিছুর নহে। যাহা হউক, এ বিষয় বারান্তরে আলোচ্য।

কে তুমি ?

কে তুমি ব্রজের মাঝে নন্দদুলাল,
বন-ফুল-মালা গলে,
অনুপম শ্রুতিমূলে,
ললিত লীলায় দুলে
কুন্তল বিশাল ?
পরিহিত পীতবাস,
অধরে অমিয় হাস,
আলো করি আছ সদা
তরুণ তমাল ?
কে তুমি ব্রজের মাঝে নন্দদুলাল ?
যমুনা চলেছে ধীরে,
বক্রনীপ-শাখা-পরে
মুখর কানন শিখী
প্রমোদ বিহ্বল ;
কুসুম পরাগ রাশি
সুধীর সমীরে ভাসি
করিয়াছে সুরভিত
শ্যাম তরুতল।
চারিদিকে চরে ধেনু
শিরীষ-পেলব তনু,
উশীর-চন্দন-গন্ধ
করে বিতরণ ;
পুঞ্জে পুঞ্জে দক্ষে বামে,
স্ফুট অরবিন্দ ভ্রমে,
আনন্দে মধুপ আসে
চুম্বিতে চরণ।

শুনিয়া মুরলী-রব
স্থাবর জঙ্গম সব
বিগলিত প্রেমভরে
নাচে তালে তাল;
খেলাধূলা ফেলি মরি,
গোচারণ পরিহরি,
থমকি দাঁড়ায় পার্শ্বে
মুগধ রাখাল।

কে তুমি ব্রজের মাঝে নন্দদুলাল ?
আলু থালু বেশ বাস,
সচঞ্চল কেশপাশ,
উদ্‌গ্রীব বরজ-বধূ
নেহারে তোমায়।
কেহ বা ব্যজনে রতা,
কোন তন্বী শুচিস্মিতা
করে পদ সংবাহন
করাম্বুজে হায়।
তমাল কুঞ্জের শিরে
মেঘ যবে নামে ঘিরে,
সঘন তিমির পুঞ্জে
বিলুপ্তা অবনী;
মসী-কৃষ্ণ নভোগায়,
শিহরি বিজলি ধায়,
উড্ডীন বলাকাকুল
করে কলধ্বনি—
সে সময় রাধাসনে,
নন্দাদেশে বনে বনে
প্রেম-বিলোড়িত বক্ষে
করহ ভ্রমণ;

পরশি সে পুণ্য-পদ—
সৌন্দর্য্যের কোকনদ,
নীরবে বিকশি উঠে
মানসে যেমন।

বৃন্দাবনাকাশ গায়
তুমি গো শশাঙ্কপ্রায়,
ভয়ে তব দূরে যায়
তামসী করাল;

আমার আঁধার হরি
দিবে না কি দূর করি?
রহিব কি এই ভাবে
ভবে চিরকাল?
কে তুমি ব্রজের মাঝে নন্দদুলাল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

হদিশ্।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

হদিশ্ বলিতে ভগবান্ মহম্মদের উক্তি সকল বুঝাইয়া থাকে। মহম্মদের জীবৎকালে তাঁহার শিষ্য, অনুসঙ্গী ও পারিবারিক জনগণ মহম্মদের উক্তিগুলি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় ঐ বিধিনিষেধাত্মক উক্তিগুলি ক্রমে বিরাট্ মুসলমান্-সাম্রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। মহম্মদের মৃত্যুর বহুকাল পরে এই উক্তিগুলি মেধাবী মুসলমান্ পণ্ডিতগণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমতঃ উহা আরবী ভাষায়

লিখিত হয়। হদিশ্কারগণের মধ্যে বোখারীর নাম প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ইনি হজরত্ মহম্মদ কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া চিরন্তন প্রচলিত লক্ষাধিক হদিশ হইতে ধ্যানবলে কিঞ্চিদধিক চতুঃসহস্র উক্তি মাত্র মহম্মদের যথার্থ উক্তি বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইহাও কথিত আছে, বোখারী কাবা-মন্দিরে নমাজ করিতে করিতে হদিশ্ লিখিতেন; এবং প্রায় চিরজীবন শুষ্ক রুটী ব্যতীত খাদ্যরূপে আর কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। বোখারী ব্যতীত হেজ্জালের পুত্র মোস্লেম, এমাম্ আবু মহম্মদ, আব্দোল মোলক্, সোফিয়ানী স্থরী এবং হমাদীন্ প্রভৃতি সাধকগণও হদিশ্প্রণেতা বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

অদ্য আমরা মহম্মদের উদার উক্তিগুলির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সিদ্ধ লোকোত্তর মহাপুরুষগণ সকলেই যে ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া এক কথাই বলিয়াছেন, তাহারও আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "সব শেয়ালেরই এক রা"। মহম্মদের জীবনেও তাহার বহুধা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেব মুসলমান ভাবে সাধন করিয়া মহম্মদের যে দর্শন পাইযাছিলেন, তাহাও পাঠকগণের অবিদিত নাই। স্থতরাং হদিশের বর্ণনা উপলক্ষে মুসলমান ধর্ম্মের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি কথঞ্চিৎ অবগত হইলে আমাদের উপকার বই অপকার নাই। আমরা সকল ধর্ম্মমতের উদার উক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেই মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে স্থান পাইবার যোগ্য।

হিন্দুদের বেদ ও স্মৃতি যেমন, মুসলমানদের কোরাণ ও হদিশ্ তেমনি; বেদবিরোধী স্মৃতি যেমন আদৃত হয় না—কোরাণবিরোধী হদিশ্ও তেমন মুসলমানগণের গ্রহণীয় হয় না। আবার স্মৃতি সংহিতায় যেমদ হিন্দুদের পালনীয় বিধিনিষেধাত্মক বিধানগুলির বিশেষ বর্ণনা আছে, মুসলমানের নিত্যনৈমিত্তিক করণীয় কার্য্যগুলিও সেইরূপ হদিশে পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়; এবং মুসলমানগণের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মন্বাদি সংহিতার ন্যায় হদিশ্ই মুসলমানগণের গার্হস্থ্য জীবনের আইন স্থানীয় হইয়াছে।

আমরা সমগ্র হদিশ্ গ্রন্থের আলোচনা এ প্রবন্ধে করিতে পারিব না। উদারচরিত্র মহম্মদের ও সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের উদারতার সমর্থন উপলক্ষে ভাল ভাল হদিশ্গুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব ধর্ম্ম

একই জিনিষ—দেশ কাল পাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মনস্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র ; "একং সৎবিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

এই হদিশ্ গ্রন্থালোচনায় আমরা মুসলমান ধর্ম্মের আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধেও বহু তত্ত্ব জানিতে পারিব। এবম্ ওমরের ন্যায় সংসারবিরাগী একান্ত-নির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা মুসলমান, মহম্মদের সমসাময়িক শিষ্যগণের মধ্যে অতি বিরল ছিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "পাঁচটী স্তম্ভের উপর মুসলমান ধর্ম্ম সংস্থাপিত। (১) এক ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও দাস (লা এলাহ এল্লেলাহ মহম্মদ রসুলাল্লাহ)। (২) নমাজ (ঈশ্বর উপাসনা) প্রতিষ্ঠিত রাখা। (৩) ঈশ্বর উদ্দেশ্যে দান করা (জকাত দান করা)। (৪) হজ্জব্রত পালন করা (তীর্থযাত্রা করা)।* এবং (৫) রমজান্ মাসে রোজা (উপবাস) প্রতি পালন করা।"

মহম্মদ একদা আবুহোরেয় রায়কে বলিয়াছিলেন "যাহার বাক্য ও শরীর দ্বারা অন্য মুসলমান উদ্বেজিত হয় না, তাহাকেই মুসলমান বলিয়া জানিবে। আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে যিনি স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত ধর্ম্মযোদ্ধা (গাজী) বলিয়া অবগত হও।"

মেশর-নিবাসী আবু এমামাকে হজ্‌রত মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তদুদ্দেশে দান করে, তাহার বিশ্বাস পূর্ণ।"

মহম্মদ নিয়তিবাদী ছিলেন। তাহার সমর্থন করিয়া তিনি আবুদর-বার নামক জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর মানুষকে পাঁচটী বিষয় জন্ম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ;—মৃত্যু, জীবিকা, গতি, সদসৎক্রিয়া ও বিশ্রান্তি।" এই নিয়তিবাদ সমর্থন উপলক্ষে মহম্মদের সহধর্ম্মিণী ওম্মসলমারকে একদিন তিনি স্বীয় শূলরোগ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন "আমি এই রোগে যে কিছু কষ্ট পাই—তাহা আদমের সৃষ্টির পূর্ব্বেই কর্দ্দম-পিণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল।"

মহম্মদ কখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতেন ; কখন বা জিব্রাইল নামক দেবদুত তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইতেন। এই অবস্থায় তিনি সকলই

* মক্কা মদিনা ও তায়েফের অন্তর্গতস্থান—নজদ্ ও গোর প্রদেশের অন্তর্গত স্থানকে "হেজাজ্", বলে।

ভুলিয়া যাইতেন। এই বিষয়ে তিনি শিষ্যগণকে একদিন বলিয়াছিলেন "আমি সামান্য মানুষ ভিন্ন আর কিছু নই, তখন আমার কথা পালন করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমি যখন প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কিছু বলি তাহার অন্যথা করিলে তোমাদিগকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।"

হজরত আবুহোরয়রায়কে একদিন বলিয়াছিলেন "মৃত্যুর পর তিনটী সৎকার্য্য ব্যতীত আর সকলই খণ্ডিত হইয়া যায়। (১) ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্থায়ী দান, (২) নিয়ত উপকার-সাধক ঈশ্বরসম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান এবং (৩) সাধু পুত্র যে তাহার জন্য মৃত্যুর পরেও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে।'

মহম্মদ সমগ্র মুসলমান জাতিকে জ্ঞানান্বেষণে প্রবুদ্ধ করিতেন আর বলিতেন "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে, তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।" কিন্তু ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি কেবল পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতার জন্য, অথবা বিরোধ করিবার জন্য জ্ঞানার্জ্জন করে, ভগবান্ তাহাকে অনন্ত নরকানলে স্থাপন করেন।" "যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর অন্বেষণ করা হয় না, অথবা যে জ্ঞান পার্থিব বস্তুর বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে।" জ্ঞান সম্বন্ধে হজ্‌রত আরো বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুসারে বা জ্ঞান না রাখিয়া কোরাণ ব্যাখ্যা করে, ঐ উভয়েই অন্তিমে নরকে যায়।"

জ্ঞান।

স্বীয় স্ত্রী আযেসাকে মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "তপস্যা-সম্বন্ধীয় উন্নতি অপেক্ষা জ্ঞানোন্নতি সমধিক শ্রেয়স্কর; অপিচ ভোগ-নিবৃত্তিতে ধর্ম্মবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

আনস্‌কে মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "দুইজন লোভীর তৃপ্তি হয় না। একজন জ্ঞানলোভী; আর একজন বিষয়লোভী।"

অকল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন করায় মহম্মদ হকিম্‌কে একদিন বলিয়াছিলেন "জীবের অকল্যাণ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিও না, কল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন কর। জানিও, জ্ঞানীদিগের অসদাচার জগতের প্রধান অকল্যাণ; তাহাদের সদাচার জগতের প্রধান কল্যাণ।" আরও বলিয়াছিলেন "জ্ঞানীর পদস্খলন, কোরাণ বিষয়ে বিতর্ক ও বিপথগামী দলপতির অনুজ্ঞা এই তিনটী থেকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের মহাভয়।

মহম্মদ তাঁহার অনুচর জাবেরকে একদিন বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি এই পলাণ্ডুর (পেঁজের) কিছুমাত্র ভক্ষণ করে, সে যেন কদাচ আমাদের মস্‌জিদের

নিকটস্থ না হয়। যে হেতু মনুষ্য যে গন্ধে কষ্ট বোধ করে, দেবতারাও তাহাতে কষ্ট বোধ 'করিয়া থাকেন। মাবিয়ার উক্তিতেও দৃষ্ট হয়, মহম্মদ মুসলমানগণকে পেঁজ রসুন খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

আবু সইদের উক্তিতে এইরূপ দেখা যায় যে, মহম্মদ তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন "সমাধিস্থান ও সাধারণ স্নানাগার ব্যতীত সমুদয় পৃথিবী ঈশ্বরের মসজিদ।" মহম্মদ স্বীয় পত্নী আয়েসাকে একদা বলিয়াছিলেন "যুবতী নারী মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া নমাজ না পড়িলে তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না।"

মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রেরিত এক সৈন্যদল একবার নজদ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া দ্রুত গতিতে প্রত্যাগমন করে। তাহাদের ক্ষিপ্র গতির প্রশংসা শুনিয়া মহম্মদ বলিয়াছিলেন "যাহারা নিশান্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নমাজ পড়ে, তাহারাই লুণ্ঠনবিষয়ে ও দ্রুতগমনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"।

মহম্মদ এরূপ উপদেশ করিয়াছেন যে, ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিয়া নমাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে মহম্মদ বলিয়াছেন "বিলাস বেশ বা সুগন্ধিদ্রব্য মাখিয়া তাহাদের নমাজে যোগদান করা বিধেয় নহে। তাহাদের গৃহেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।"

মহম্মদ এবন্ অব্বাস্‌কে বলিয়াছিলেন "এই তিন ব্যক্তির উপাসনা গৃহীত হয় না। (১) যে এমামের প্রতি মণ্ডলী অসন্তুষ্ট, (২) যে স্ত্রীর প্রতি স্বামী অপ্রসন্ন, এবং (৩) যে দুই ভ্রাতা মনোমালিন্য বশতঃ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে।"

হজরত মহম্মদ অনুচরগণকে 'অগ্রসর' হইতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "পুরুষগণের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী দল, এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে পশ্চাৎ-বর্ত্তী দল উৎকৃষ্ট।"

একদা মহম্মদ বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কেহই—এমন কি আমিও স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারিব না।"

আবু মুসাকে মহম্মদ বলিয়াছিলেন "ক্ষুধিতকে অন্নদান, রোগীর তত্ত্বাবধান ও বন্দীকে মুক্তিপ্রদান করিও।"

আনসের উক্তি:—মহম্মদ বলিয়াছেন "যখন ঈশ্বর স্বীয় দাসের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তখন নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি সত্বর শাস্তি প্রদান

করেন আর যখন অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন শাস্তি না দিয়ে তাহাকে সংসারভোগে প্রবৃত্ত করান।" আরও বলিতেন "গুরুতর বিপদের গুরুতর পুরস্কার; বিপদে যাহার ধৈর্য্য, ঈশ্বর তাহার প্রতি সমধিক প্রীত থাকেন।"

একজন মুসলমান মহম্মদকে বলিয়াছিলেন "মহাশয়, আমি আজীবন কখনো রোগাক্রান্ত হই নাই।" তাই শু'নে মহম্মদ বলিয়াছিলেন "তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও, তোমাতে সয়তান অবস্থান করিতেছে; তুমি আমাদের অন্তর্গত নও।"

একজন সুস্থ শরীরে হঠাৎ মরিয়া গেলে একজন মুসলমান হজ্রত মহম্মদের নিকট যাইয়া ঐ কথা বলেন। তাহাতে প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন "যদি ঐ ব্যক্তি কোন রোগে পীড়িত হইয়া মরিত, তবে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত।"

ওমরের পুত্র আবদল্লাকে মহম্মদ একদা বলিয়াছিলেন "তুমি যেন বিদেশী বা পথিক এই ভাবে সংসারে স্থিতি করিও। সন্ধ্যাকালে প্রাতের অপেক্ষা করিও না—প্রাতে সন্ধ্যার অপেক্ষা রাখিও না। সুস্থকালে অসুস্থতাকে স্মরণ রাখিও এবং জীবৎকালে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইও।"

আনস্ বলেন, মহম্মদের এক কন্যার মৃত্যু হইলে তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল; এবং উপস্থিত মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যে কেহ গতরাত্রে স্ত্রীসঙ্গ করে নাই, সেই যেন কবরে অবতরণ করিয়া শব রক্ষা করে।

হরজত আর একদিন বলিয়াছিলেন "আমার সম্প্রদায়ের লোক এই চারিটী মূর্খতার কার্য্য এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। (১) ধনৈশ্বর্য্যের আত্মগৌরব করা, (২) বংশমর্য্যাদার স্পর্দ্ধা করা, (৩) গ্রহসংক্রমণে বৃষ্টির আশা করা এবং (৪) শোকে বিলাপ করা।

হজরত মহম্মদ পুরুষদিগকে কবর দর্শনে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বলিতেন "তোমরা কবরস্থান দর্শন করিবে, তাহাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়।" কিন্তু কবরদর্শনকারিণী নারীদিগকে তিনি অভিসম্পাত করিয়া গিয়াছেন।

নিজের ধনবৃদ্ধির জন্য যাচ্ঞা করাকে তিনি অগ্নিকণা ভিক্ষার তুল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিরন্তর যাচ্ঞাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন।

যাচ্ঞা।

তিনি বলিতেন "যাচ্ঞা ক্ষতরোগস্বরূপ—ইহাতে মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হয়।

মহম্মদ এক দিন বলিয়াছিলেন "আমি স্বর্গে তাহারই প্রতিভূ হইব, যে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনো যাচ্ঞা করে নাই।" কখনো বলিতেন "দান করিয়া গণনা করিও না—ব্যয় করিয়া যাও—ধন রক্ষা করিও না, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

মহম্মদ বেলালের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান সে শুষ্ক খেজুর পুঞ্জীভূত করিয়া গৃহে রাখিয়াছে। তাহাকে মহম্মদ বলেন—"ওহে বেলাল! তুমি কি জাননা যে, এই খেজুরে কত লোককে জীবিত রাখিতে পারে? ইহা এখনি ব্যয় কর—নতুবা কেয়ামত দিবসের নরকাগ্নি তোমাকে উত্তাপিত করিবে।"

ঈশ্বর এই তিন জনের প্রতি সর্ব্বদা বিমুখ বলিয়া মহম্মদ সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেন। (১) পরদারাভিগামী বৃদ্ধ, (২) অহঙ্কারী দরিদ্র, (৩) এবং অত্যাচারী ধনী।

মহম্মদকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় কি? তাহাতে তিনি পর্ব্বতের নাম করেন। তদপেক্ষা কিছু দৃঢ় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বলেন "লৌহ"। এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বস্তুর নাম করিয়া সর্ব্বশেষে বলেন "সেই আদমসন্তান সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, যাহার দক্ষিণ হস্ত দান করিয়া বাম হস্তের নিকট গোপন রাখিয়াছে।" প্রার্থনা অধ্যায়ে লিখিত আছে, মহম্মদ বলিতেন—"যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে সেই জীবিত—যে করে না সে মৃত!" আরও বলিতেন "জগতে সেই ধন্য, যে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঈশ্বরগুণকীর্ত্তনে আপনার রসনা সরস রাখিয়াছে।' এবনওমরকে মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা কহে, সে নিশ্চয় অতি পাষাণহৃদয় এবং ঈশ্বর হইতে বহু দূরবর্ত্তী।" এই প্রকরণের অন্যত্র মহম্মদ আবু শরিদকে বলিয়াছেন "যে পর্য্যন্ত করবাল ভগ্ন ও শোণিত-রঞ্জিত না হয়, যে লোক সেই পর্য্যন্ত করবাল চালনা করে সেই মুসলমান-গণের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাহার রসনা ঈশ্বরগুণকীর্ত্তনে নিয়োজিত, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযোদ্ধা আর কেহই নাই।"

প্রার্থনা।

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মহম্মদ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন "হে ঈশ্বর! তুমি ভূলোক দ্যুলোক স্বর্গলোকের প্রতিপালক। তোমার আদিতে কেহ ছিলনা—তোমার অন্তেও কিছু নাই! তুমি ব্যক্ত—তুমিই অব্যক্ত—তুমি

আমার একমাত্র আশ্রয়—আমাকে ঋণমুক্ত কর—আমার দৈন্য দূর কর।" কখনো বলিতেন "যখনি কোন লোক ঈশ্বরের কৃপা ও দর্শন লাভ করে, পর্ব্বত-প্রমাণ পাপরাশি থাকিলেও—তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।" কখনো বলিতেন "সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে জীবের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন।" মহম্মদের এক প্রার্থনাবাক্য এই-রূপ লিপিবদ্ধ আছে :—"হে ঈশ্বর! আমাকে দুর্ব্বলতা, নিশ্চেষ্টতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা ও কবরদণ্ড হইতে অব্যাহতি দান কর। আমায় "বিষয়নিবৃত্তি" বিধান করিয়া শুদ্ধ কর। যাহা হিতসাধন করে না, এমন জ্ঞান হইতে—যাহা বিনম্র নয়, এমন হৃদয় হইতে—যাহা সংসারে পরিতৃপ্ত নয়, এমন জীবন হইতে—যাহা গৃহীত হয়না, এমন প্রার্থনা হইতে—আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমার একান্ত আশ্রিত। আমার সংগ্রাম বিজয়াদি তোমার কৃপাতেই সাধিত হইয়াছে।"

প্রার্থনাপ্রসঙ্গে অন্যত্র এইরূপ হদিশ্‌ আছে। "হে প্রাণারাম ঈশ্বর! আমি তোমার নিকট সত্যালোক, নিবৃত্তি, পবিত্রতা ও চরিতার্থতা প্রার্থনা করিতেছি।"

এমাম্‌ হসন্‌কে মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "যাহা সন্দেহযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ কর; সত্যের প্রতি অনুরাগী হও। অসত্যই অশান্তির ও সত্য শান্তির কারণ।"

ঋণগ্রস্ততা সম্বন্ধে মহম্মদ একদিন একজনকে বলিয়াছিলেন "যুদ্ধে নিহত হইলে তোমার স্বর্গলাভ হইবে কিন্তু ঋণ থাকিতে নয়।"

সেমিটিক জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যভাবের উপদেশ দৃষ্ট হয় না। বরং মহম্মদ বিবাহাদি কার্য্য সর্ব্বথা সমর্থন করিতেন। তিনি যুবকমণ্ডলীকে বিবাহ করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, যাহাদের ইন্দ্রিয়সামর্থ্য আছে, তাহারা যেন বিবাহ করে। কারণ, উহাতে পরস্ত্রী সম্বন্ধে তাহারা সংযতেন্দ্রিয় হয়। কিন্তু ভোগাদি বিষয়ে তিনি মুসলমানগণকে সর্ব্বদা সংযত হইতে আদেশ করিতেন। পুরুষ-গণকে সদ্বংশজাত কন্যা, কন্যাগণকে চরিত্রবান্‌ ধার্ম্মিক যুবক বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন। কখনো বলিতেন, নারী শয়তানরূপে মানুষের চিত্ত-হরণ করিয়া—শয়তানরূপে অন্তর্হিত হয়। যুবকগণকে পরস্ত্রী হইতে দৃষ্টি সংযত করিতে সর্ব্বদা আদেশ করিতেন। স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপাসনা

বিবাহ।

করিতে উৎসাহিত করিতেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলিতেন "যে নারী পাঁচ বার উপাসনা করে, ইন্দ্রিয় সংযত রাখে ও সর্ব্বদা স্বামীর বাধ্য থাকে, সে যে কোন দ্বার দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে।" কথনো বলিতেন "যদি আমি কোন ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে আদেশ করিতাম, তবে নারীদিগের মধ্যে পতি নমস্কার প্রথার প্রবর্ত্তন করিতাম।" আর একটী এরূপ উক্তি আছে, "যে স্ত্রী বিধবা হইয়াছে, সে যেন রঞ্জিত বস্ত্র,অঙ্গরাগ ও অলঙ্কার ধারণ না করে—যেন কেশদাম রঞ্জিত না করে—নেত্রে না অঞ্জন দান করে।"

কসাস্ (হত্যা) প্রকরণে লিখিত আছে "বিশ্বাসী লোক সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম-শীল ও সাধক হইয়া থাকেন। তিনি অবৈধরূপে রক্তপাত করেন না। অবৈধ রক্তপাতে ভগবান্ বিষন্ন হন।"

"মদ্যপায়ী, ভেদনীতি প্রবর্ত্তক এবং সিদ্ধাই-সমর্থনকারী—ইহারা কদাপি স্বর্গে যাইতে পারে না।" মহম্মদ বলিতেন "তুমি নেতা হইবার জন্ম প্রার্থনা করিও না—ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর তোমাকে আপনি নেতা করিয়া দিবেন," আরও বলিতেন "অত্যাচারী রাজার নিকট যে সত্য কথা নির্ভয়ে বলিতে পারে সে যথার্থ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযোদ্ধা।" রাজাকে "ভূতলে ঈশ্বর-প্রতিবিম্ব" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতেন। মহম্মদ একদা বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর-কিঙ্করগণের অন্তরে" "কৃপণতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস" কথনো একত্রাবস্থান করিতে পারে না।

যুদ্ধের সময় তিনি স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বধ করিতে নিষেধ করিতেন।

হদিফাকে মহম্মদ একদিন বলিয়া ছিলেন "যাহাতে ঈশ্বরনাম উচ্চারিত হয় না এমন অন্ন যেন কেহ গ্রহণ না করে। আরও বলিতেন "যথার্থ বিশ্বাসিগণ অল্পাহারী, কাফেরগণ সপ্ত-পাকস্থলীর অনুরূপ ভোজন করে।

অন্ন।

আবু ওমামাকে মহম্মদ একদিন বলিয়াছিলেন "তোমরা কি শুন নাই জীর্ণ বস্ত্র পরিধান বিশ্বাসের পরিচয়?" আবার বলিয়া-ছেন,"যে পর্য্যন্ত তোমাকে গর্ব্ব আশ্রয় না করে, ততক্ষণ তুমি যথেচ্ছ পানভোজন যথেচ্ছ পরিধান কর।"

বস্ত্র।

আমরা হদিশ উক্ত বাক্যাবলী শ্রেণী বদ্ধভাবে সাজাইতে পারি নাই। কিন্তু এই সকল উক্তি হইতে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন,মহম্মদ কতদূর উদার-নীতি পরায়ণ, কতদূর ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি সময়োপযোগী কতকগুলি

বিধি-নিষেধই প্রচার করিয়াছিলেন। উহা তৎকালের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুতরাং অন্যধর্ম্মিগণ তাহাতে কটাক্ষ করিবেন না। দুর্দ্দান্ত আরব-বাসিগণকে ধর্ম্মের গণ্ডীতে আনিতে সক্ষম হইয়া মহম্মদ নিজের ধর্ম্ম ও শক্তিমত্তার বহুধা পরিচয় দিয়াছেন। এমন স্বাধীনচেতা ধর্ম্মবীর জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক মুসলমানসমাজে তদুপদেশের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিলে উপদেষ্টা মহম্মদ সেজন্য দায়ী নহেন। মহম্মদের পবিত্র জীবন, অকলঙ্ক চরিত্র, উদার ধর্ম্মভাবের বিষয় যতই আলোচিত হইবে, ততই জগতের কল্যাণ। ইহাতে লেখকের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

কনখল (হরিদ্বার)

পুণ্যধাম হরিদ্বার একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া বৎসরের সর্ব্ব সময় ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী এ স্থানে আসিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত অনেক সাধুসন্ন্যাসী মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এখানে সাধনভজনের জন্য বাস করেন। ইঁহাদের শারীরিক অসুস্থতার সময় আশ্রয়, সেবা ও ঔষধ পথ্যাদির অভাবে পূর্ব্বে যে ইঁহারা কি প্রকার বিপন্ন হইতেন, তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়া অনুভব করিবার বিষয়—লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব বলিলে বোধ হয়—অত্যুক্তি হইবে না। এই বহুদিবসানুভূত অভাব দূর করিবার জন্য এবং 'রোগী নারায়ণগণকে' সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী সেবকের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ১৯০১ সালের জুন মাসে হরিদ্বারের সন্নিহিত কনখলে একটী সেবাশ্রম সংস্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সেবকগণ সাধারণের অর্থ-সাহায্যে এবং নিজেদের প্রাণপণ পরিশ্রম দ্বারা সাধু, তীর্থযাত্রী, স্থানীয় গৃহস্থ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। কার্য্য প্রতি বৎসরেই বাড়িয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত গত দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সাল	আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	কেবল মাত্র ঔষধ সাহায্য প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
১৯০৮	৮৮	৭৯১৪
১৯০৯	১২০	১০২৭০

গত নয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২০ জন রোগী আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং ৩৭১৮৪ জন ব্যক্তি ঔষধ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; আর ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, সেবকগণের যত্ন ও সুচিকিৎসা-গুণে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই আশ্রমের দ্বারা যে বাস্তবিক সর্ব্বসাধারণের একটী বিশেষ অভাব পূরণ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা এখনও সন্দিহান, তাঁহারা স্বয়ং ঐ স্থানে গিয়া আশ্রমের কার্য্যাদি দেখিয়া আসিতে পারেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কার্য্যের অনুপাতে অর্থ-সাহায্য না বাড়ায় সেবকগণ তাঁহাদের আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত সেবা করিতে পারিতেছেন না। আশ্রমের স্থায়ী বার্ষিক আয় ১০২॥০ মাত্র, এবং অবশিষ্ট ব্যয়ভার জনসাধারণের সাময়িক অনিশ্চিত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। গত বৎসর এই ভাবে ৪০৮৫৷১০ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। গত বৎসরে সাধারণের সাহায্যে ৮ জন সাধারণ রোগী থাকিবার উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে ক্ষয়রোগী বা অন্য সংক্রামক রোগী অনেকে চিকিৎসার্থ আসিয়া থাকে। তাহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান না থাকায় তাহাদিগকে একেবারে স্থান দিতে পারা যায় না। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে ক্ষয়রোগীর বাসস্থানের জন্য গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, অন্যান্য সংক্রামক রোগীর গৃহ এখনও মোটেই আরম্ভ হয় নাই—ঐ দুইটী সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৮।৯ সহস্র টাকা আবশ্যক।

আমাদের মনে হয়, এরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত, হিন্দুর বিশেষ গৌরবের সামগ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত এবং তদনুবর্ত্তী নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী সেবকগণ কর্তৃক পরিচালিত এই শুভ অনুষ্ঠানকে স্থায়ী ভাবে পরিণত করা সমগ্র ভারতবাসীর এক প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের অনুষ্ঠান নহে, সমগ্র দেশবাসীর নিজের কার্য্য। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে যথাসাধ্য এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায়তায় নিজ আত্মোন্নতি সাধনে এবং উক্ত সেবক সন্ন্যাসিগণকে তাঁহাদের পরম আকা-

ক্ষিত সেবাকার্য্যের অবসর প্রদানে অগ্রসর হইলে আমরা পরম সুখী হইব।

আশ্রমের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে
স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,
কনখল পোঃ (সাহারাণ পুর)

ঠিকানায় পত্র লিখুন। সাহায্যও ঐ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা তাঁহাদের কোন প্রিয় আত্মীয় স্বজনের স্মৃতির জন্য স্বতন্ত্র গৃহের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

'বেদান্তের আমি'—শ্রীভগবৎ দাস প্রণীত। মূল্য আট আনা। বৈদ্যনাথে 'থাক্ চক্' নামধেয় কোন নবপ্রতিষ্ঠিত অজ্ঞাতনামা আখড়ায় সাধুসেবার জন্য পুস্তকের লভ্যাংশ গ্রন্থকারের দ্বারা উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থকারের এ সঙ্কল্প প্রশংসনীয় বটে, তবে ঐ উদ্দেশ্যের সমালোচনা আমরা করিতে বসি নাই; অতএব ঐ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। পুস্তকের কথা—গ্রন্থখানি যেন মাকাল ফল—উপরে বেশ চাকন্ চিকন্, ভিতরে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত অসারতায় পূর্ণ! আবার ঐ অসারতার সহিত পবিত্র বেদান্ত নাম সংযুক্ত করিয়া গ্রন্থকার মানুষকে যে কি বিষম ভ্রমে, ভাঁওতায় ফেলিয়াছেন তাহা আর বলিবার নহে।

বাবাজির পুস্তকগত অদ্ভুত বেদান্তভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমময়ী রাধা, অপরা প্রকৃতি বা পরমাণুরাশিতে, গোপীজনবল্লভ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, কেন্দ্রাভিকর্ষিণী শক্তিতে (centripetal force) এবং রেবতীরমণ মহাবীর বলভদ্র, কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে (centrifugal force) পরিণত হইয়াছেন! এতদ্ভিন্ন, যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠী ও তিলক, শিখা ও শ্মশ্রু, দেবস্থান ও তীর্থস্থান, আহার, বিহার, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম প্রভৃতি সকল বিষয়েরই মুখ্য উপকারিতা, তাঁহার মতে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ। 'থাক্ চক্' আখড়ায় বসিয়া মুখে মুখে ঐ সকল ব্যাখ্যায় শ্রোতৃ-

বর্গকে মুগ্ধ করিলেই চলিত ; পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল না। গ্রন্থকার অধিকাংশ বিষয়েপ্রাচীন আচারেরই পক্ষপাতী, নতুবা মনে হইত,সকল বিষয়ের ওলট পালট্ করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার অভ্যুদয়। তবে জাতিভেদ ও বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বেশ উদারমতাবলম্বী দেখিলাম। পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিলাম বলিয়া গ্রন্থকার যেন রাগ না করেন। তিনি বৈরাগ্যাবলম্বন ও সাধুসেবায় ব্রতী হইয়াছেন, সেজন্য আমাদের প্রণম্য। পুস্তক প্রকাশের দ্বারা না হউক, প্রার্থনা করি, অন্য উপায়ে তাঁহার ব্রত পূর্ণ হউক।

"**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মদিরা**"—(প্রথম ভাগ) শ্রীরামকৃষ্ণ দাস প্রণীত—উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা, দেখিলে পড়িতে ইচ্ছা করে। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন 'ভাবোন্মাদ' হইয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ; উদ্দেশ্য—আত্মশুদ্ধি (১ম পরিচ্ছেদ, ৫ পৃষ্ঠা), কিন্তু পুস্তক প্রণয়ন ত অপরের জন্যই করা হয়; আত্মশুদ্ধির জন্য পুস্তক প্রণয়ন, এ এক নূতন কথা—লোকে এই কথাই বলিবে। কিন্তু পাগলকে বলা না বলা সমান—সে বিষয়ে তিনি কোন উত্তর দেন নাই। অতএব সমালোচনা অনাবশ্যক। পাগলের যাহা খেয়াল আসিয়াছে, বকিয়াছেন—পাঠকের ও যাহার খেয়াল হয় পড়িবেন। কেহ কেহ হয়ত কিছু কিছু আনন্দ পাইবেন। আবার কেহ কেহ 'এরা সব ভাল এক রামকৃষ্ণ পেয়েছে' বলে পুস্তক খানা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিবেন। সমালোচনা অনাবশ্যক হইলেও পাগলকে আমাদের অনুরোধ—সে অনুরোধ তিনি রাখিবেন কি না জানি না—যে, নিজের মনের ভাব টাব গুলো যতদূর সম্ভব চেপে চুপে বলাই ভাল, নহিলে সকলে লয় না ; আর অনেক সময় 'মধুর হরিনাম বাঘ করে তোলা হয়'—বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের নিকট। "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" ঢৌলে পাগল খেয়াল প্রলাপ বকিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে পাগলামির মাত্রা কিছু বেশী চড়িয়াছে। শেষ অধ্যায়টি ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের স্বপ্নদর্শনের ঢৌলে—তাহাতেও কিছু কিছু পাগলামি চাপিয়া যাইলে ভাল হইত। আর এক কথা—১৲ টাকা মূল্য দিয়া এ পুস্তক কতজনে পড়িতে প্রস্তুত, বলিতে পারি না। তবে গ্রন্থকারের বোধ হয় সেদিকে দৃষ্টিই নাই।

"**শান্তিপথ**" ; প্রকাশক সেবানন্দ স্বামী, কাশী যোগাশ্রম। বিনামূল্যে বিতরণীয়। গ্রন্থ প্রাচীন শাস্ত্রাবলম্বনে লিখিত। ভাষা শাস্ত্র-পরি-

ভাষাপূর্ণ হওয়ায় কটমট। সোজা কথায় এখনকার সাধারণ পাঠক যেরূপে বলিলে বুঝিতে পারে, এরূপ ভাবে ঐ সকল কথা বলিলে লোকের অধিক উপকার হইত। বিনামূল্যে পাইয়া লোকে আগ্রহ করিয়া পুস্তক লইবে, কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে সবটা পড়িবে কি না সন্দেহ।

'A Simple means of mass Education.' বা সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের সরল উপায়। প্রকাশক সেবানন্দ স্বামী, কাশী সেবাশ্রম; বিনামূল্যে বিতরণীয়। পরলোকগত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী এই প্রবন্ধ দুইটি অমৃতবাজারাদি সংবাদপত্রে প্রথম মুদ্রিত করেন। পুস্তক তাহারই পুনর্মুদ্রাঙ্কন। বিশেষ কোন নূতন কথা নাই। পরিব্রাজক স্বামীর স্মৃতি রক্ষা ভিন্ন অপর কোন বিষয় যে পুস্তক দ্বারা সিদ্ধ হইবে, বোধ হয় না। তবে বিনা-মূল্যে 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া' বলিয়া লোকে লইতে ছাড়িবে না।

'Elevation of the masses and the Depressed Classes' বা সমাজের নিম্নস্তরাশ্রয়ী ইতর সাধারণের উন্নতি-সাধন—শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত এবং 'দেবালয়' পত্রের ক্রোড়পত্ররূপে পরি-গণিত। তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইহাতে দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে কি ভাবে ঐ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িলে, একজনের বিশিষ্ট উদ্যমেও যে অনেক কাজ হয়, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তবে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী হইলেও শশি-পদ বাবুর কোন কর্ম্মটিই স্থায়ী হইল না, ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। এক সময়ে অনেক বিষয়ে হাত দিয়া নিজ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত, একমুখী না করাই কি উহার কারণ? কে জানে? যাহাই হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার উদ্যমে এবার যে অসাম্প্রদায়িক কার্য্যটি আরম্ভ হইয়াছে তাহা স্থায়ী হইয়া শুভফল প্রসব করুক।

"ভগবন্মাহাত্ম্য",—শ্রীকাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। সমালোচ্য গ্রন্থখানি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবতী গীতা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী, এই তিনখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পয়ার-ছন্দে বঙ্গানুবাদ। পরিশেষে সত্যনারায়ণের ব্রতকথাও সন্নিবেশিত আছে। অনুবাদ যেমন ঠিক ঠিক হইয়াছে, উহার ভাষাও তদ্রূপ প্রাঞ্জল ও সুললিত হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক গ্রন্থখানি পাঠে বিশেষ উপকার ও আনন্দ পাইবেন। পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অনুবাদগ্রন্থ পড়িতেছি, ইহা

ভুলিয়া যাইতে হয়। গীতা ও চণ্ডীর এ প্রকার সহজ সুললিত পদ্যানুবাদ ইহার পূর্ব্বে আমাদের হস্তে আর পড়ে নাই। আশা করি, সর্ব্বসাধারণে ইহার আদর হইবে। কাগজ ও ছাপা আর একটু ভাল হইলে, হইত। আর নামটির নির্ব্বাচন সুন্দর হয় নাই ; উহা দ্বারা গ্রন্থমধ্যে কি বস্তু আছে, তাহার কিছুই বুঝা যায় না।

'মণিভদ্র'—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত। গ্রন্থখানি বৌদ্ধ-যুগের একখানি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস ; কারণ, পণ্ডিতজি পুস্তকের ভূমিকায় স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থনিবদ্ধ প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি তিনি অবদান ও জাতক নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থখানি পাঠে হৃদয়ে দেশের অতীত-গৌরব-স্মৃতিপূর্ণ যে উজ্জ্বল চিত্র জাগিয়া উঠে, পাশ্চাত্যের ভালটুকু ছাড়িয়া ঘৃণ্য জড়বাদ ও ভোগসুখ-সর্ব্বস্ব মতবাদ সহায়ে বর্ত্তমানে দেশে যে নিরঙ্কুশ অনাচার-ব্যভিচারের স্রোত বহিতেছে, তাহার বিশিষ্ট প্রতিযোগী ত্যাগমাত্রৈকসর্ব্বস্ব অমৃতত্বের নিদান-ভূত ব্রহ্মচর্য্যের এবং মানবজীবনের উচ্চ পবিত্র উদ্দেশ্যের যে বিচিত্র ছবি মনে চিরাঙ্কিত হয়, তজ্জন্য উহাকে আর ক্ষুদ্র বলা যায় না। গ্রন্থখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। রত্নমালা ও মণিভদ্রের মধ্যে শরীর-সম্পর্ক-শূন্য যে পবিত্র বিবাহবন্ধন ও দাম্পত্য প্রণয়ের চিত্র গ্রন্থকার বর্ণনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্যজগতে এরূপ চিত্র অঙ্কিত অতি বিরল লেখকই করিয়াছেন। আর সংসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঐরূপ উচ্চ লক্ষ্যে জীবন পরিচালিত করা একমাত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবই দেখাইয়া গিয়াছেন। লেখকের রচনাশিল্পও উচ্চদরের হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া সাঙ্গ করিবার পর পুস্তক-নিহিত স্ত্রীপুরুষচরিত্রগুলি অনেক কাল পর্য্যন্ত পাঠকের মনে দৃষ্ট পরিচিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের চিত্রটি কিছু একদেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উহাতে যেন পাশ্চাত্যের মার্টিন লুথারের গন্ধ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থে লোকজিৎ মারজিৎ ভগবানের অমিতাভ গুণরাশি পরিচিত্রণের অবকাশ না পাওয়াতেই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছে। পুস্তকখানির জন্য আমরা পণ্ডিতজীর নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি, উহা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার আদরের ধন হইবে। পুস্তকের উত্তম কাগজ, উত্তম ছাপা দেখিয়া ॥০ মূল্য অল্পই নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সংবাদপত্রের পাঠকগণ বিগত কয়েক বর্ষ হইতে নিউইয়র্ক-নিবাসী ভারতবন্ধু মাইরন্ এচ্ ফেল্প্স্ মহোদয়ের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছেন। ইনিই ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিতে আকৃষ্ট আর কয়েকটি বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, সমিতি গঠন করিয়া নিউইয়র্ক সহরে 'ইণ্ডিয়া হাউস্' নামক একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল—ভারত হইতে যে সকল ছাত্র আমেরিকাতে বিদ্যার্জ্জন করিতে যাইবে, তাহারা যাহাতে বিদেশে আসিয়া পাশ্চাত্যের বিষয়মোহে বিপথগামী না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে এবং কি করিলে, কি ভাবে থাকিলে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, পাঠোপযোগী সেই সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও যথাসাধ্য সহায়তা করিবে। ভারতবাসীর দুরদৃষ্টক্রমে ঐ সমিতি ও আশ্রম কয়েক বৎসর বেশ উৎসাহের সহিত নিজ কার্য্য করিয়া নানাকারণে সম্প্রতি বোধ হয় বন্ধ হইয়াছে, তাহাও পাঠকগণের অবিদিত নাই।

ফেল্প্স্ মহাশয় সম্প্রতি লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী কলম্বো সহরে আগমন করিয়াছিলেন এবং ভারতের বর্ত্তমান প্রয়োজন বিষয়ে সারগর্ভ সহানুভূতিপূর্ণ বক্তৃতাদি দানে সিলোনবাসী সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জাফ্না সহরের হিন্দুকলেজে তাঁহার ঐরূপ একটি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল—হিন্দুর জাতীয় আদর্শসমূহ এবং ঐ সকল রক্ষণের উপায়।

বক্তা, প্রথমেই হিন্দুদিগের সকল সম্প্রদায় যে সকল আদর্শ সম্বন্ধে একমতাবলম্বী, যথা—ত্যাগ, অনাসক্তি, সংযম, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে জীবনের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান, শান্তিকামনা, নারায়ণ জ্ঞানে নরনারীর সেবা ও প্রেম করা, দেশ কাল ও পাত্রভেদে নিঃস্বার্থ দান প্রভৃতির জ্বলন্ত ছবি চিত্রিত করিয়া, তাহার সহিত পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান আদর্শ সকলের—যথা অনন্ত বিষয় কামনা, ধন মান নাম যশাদি লাভই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করা, ধর্ম্মহীনতা, সকল বিষয়ে শান্তি অন্বেষণ না করিয়া যাহাতে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধ্যাদি নিয়ত উত্তেজিত হয় তদুদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান—তুলনায় আলোচনা করিয়া মনুষ্যজীবনের পবিত্র উদ্দেশ্য যে ঐ সকল পাশ্চাত্য আদর্শসহায়ে কখনই সাধিত হইবার নহে, তদ্বিষয়ে জীবন্ত ভাষায় অনেক কথা বলেন। পাশ্চাত্যমোহে ভুলিয়া হিন্দুদিগের ঐ সকল আদর্শ যে কখনই পরিত্যজ্য নহে এবং পরিত্যাগ করিলে শুধু যে 'সোণা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া' হইবে, তাহা নহে, কিন্তু সমূহ ক্ষতি ও পরিণামে সমগ্র জাতীয় ধ্বংসের সম্ভাবনা তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

আমাদিগের জাতীয় আদর্শসমূহের রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বক্তা কয়েকটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। উহা আমাদের সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। ১ম—পাশ্চাত্যের নিকট বিজ্ঞানপ্রসূত কল কারখানা বা ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে

যাইও, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও পাশ্চাত্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে যাইও না; কারণ, যে যাহাই বলুক না কেন, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্যের দিবার বিশেষ কিছুই নাই। ২য়—হিন্দুর জাতীয় আদর্শসমূহ যে এতদিন রক্ষিত হইয়াছে, তাহার এক প্রধান কারণ, এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা নিজের হস্তে তাহাদের বালকবালিকাগণের শিক্ষাভার রাখিয়া আসিয়াছে। বালকবালিকাগণই ভবিষ্যৎ সমাজের জাতিধর্ম্মরক্ষয়িতা। সেজন্য তাহাদের কোমল মনে ঐ সকল আদর্শের উচ্চ ভাব বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা কর্ত্তৃক সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বালকবালিকাগণের শিক্ষার ভার বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারক (মিসনারি)-গণের হস্তে নিশ্চিন্ত হইয়া অর্পণ করায় ঐ চিরপ্রথিত উচ্চাদর্শ সকল বাল্যেই বালকবালিকাগণের মনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে না। ইহাতে ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা—এমন কি, সমগ্র জাতটিই নিজেদের সর্ব্বস্ব হারাইয়া পাশ্চাত্য ভাবে ক্রমে ক্রমে ভাবিত হইয়া উৎসন্ন যাইতে পারে। বক্তা সেজন্য হিন্দুদিগকে সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন এবং হিন্দু-বিদ্যালয়-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বালকবালিকাগণের শিক্ষার ভার যতদূর সম্ভব নিজেদের হাতেই রাখিতে বলেন।

নিরপেক্ষ বিদেশীর মুখে সত্য কথা শুনিলে অনেক সময়ে হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া যায়; আমরা আশা করি, ফেল্প্‌স্ মহোদয়ের ঐ কথাগুলিও যেন আমাদের হৃদয়ে ঐরূপে মুদ্রিত হইয়া কার্য্যকরী হইয়া উঠে। ফেল্প্‌স্, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর মহতী ধর্ম্মসভাতেই তিনি স্বামীজির প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং ঐ দিনে স্বামীজি সেই বহুসহস্র শ্রোতাকে তাঁহার জলন্ত ভাব ও ভাষায় কিরূপে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতাকালে ফেল্প্‌স্ উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন স্বামীজি আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরীতে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তহরণ করিতেছিলেন, তখনও ফেল্প্‌স্ বহুবার তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করেন; এবং কিছুদিন তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া রাখিয়া তাঁহার সঙ্গসুখে কালযাপন করেন। ফেল্প্‌স্ বলেন ঐ সময়ে স্বামীজি "জগতের সমক্ষে ভারতের ঘোষণা" (India's Message to the World) নামে একখানি পুস্তক প্রণয়নে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাহার ভূমিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লিখিয়া শুনাইয়াছিলেন। ঐ ভূমিকাতে ভারতসম্বন্ধে স্বামীজি যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াই ফেল্প্‌স্ সেদিন তাঁহার জাফ্‌নার বক্তৃতা শেষ করেন। বারান্তরে উহা পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। বলা বাহুল্য যে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীজির উক্ত পুস্তকের ভূমিকা পর্য্যন্তই আমরা পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

ঠাকুরের গুরুভাব ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুল।

কলিকাতার জনসাধারণের ধারণা, ঠাকুর, কলিকাতার কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কতকগুলি ইংরাজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত, নব্য হিন্দুদলের লোকের ভিতরই ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বা তাঁহাদের ভিতরের পূর্ব্ব হইতে প্রদীপ্ত ধর্ম্মভাবকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার লোকেরা ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের কথা জানিতে পারিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ঠাকুরের নিকটে বাঙ্গালা এবং উত্তর ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ হইতে সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু, সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সকল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবন্ত ধর্ম্মাদর্শ ও গুরুভাব সহায়ে আপন আপন নির্জীব ধর্ম্মজীবনে প্রাণসঞ্চার লাভ করিয়া, অন্যত্র অনেকানেক লোকের ভিতর সেই নব ভাব, নব শক্তি সঞ্চারিত করিতে গমন করিয়াছিলেন—একথা কলিকাতার ইতর সাধারণে অবগত নহেন।

ঠাকুর বলিতেন—'ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে; তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। তোমার ভিতর ঈশ্বরভক্তি ও প্রেম যথার্থই বিকশিত হইলে, যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধানে, সত্য লাভের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক নিয়মের বশে তোমার নিকট আসিয়া জুটিবেনই জুটিবেন!' ঠাকুরের মতই ছিল সেজন্য, অগ্রে ঈশ্বরবস্তু লাভ কর, তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া যথার্থ লোকহিতের জন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতায় ভূষিত হও ও ঐ বিষয়ে তাঁহার আদেশ বা 'চাপ্‌রাস্‌' লাভ কর, তবে ধর্ম্মপ্রচার বা বহুজনহিতায় কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হও—নতুবা, ঠাকুর তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় যেমন বলিতেন, 'তোমার কথা লিবে কে? তুমি যা করতে বলবে, দশে তা লিবে কেন, শুন্‌বে কেন?'

বাস্তবিক এই, জন্ম-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল, দুঃখ-দারিদ্র্য-অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ

জগতে আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া যতই কেন আপনাদের অপরের অপেক্ষা বড় জ্ঞান করি না, অবস্থা আমাদের সকলেরই সমান! জড় বিজ্ঞানাদির উন্নতি করিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী জগজ্জননী মায়ার রাজ্যের দুই চারিটা দ্রব্যগুণাদি জানিয়া লইয়া যতই কেন আমরা কল কারখানার বিস্তার করি না, দুর্দ্দশা আমাদের প্রায় সমানই থাকে!—সেই ইন্দ্রিয়-তাড়না, সেই লোভ-লালসা, সেই নিরন্তর মৃত্যুভয়, সেই কে আমি, কেনই বা এখানে, পরেই বা কোথায় যাইব, পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি সহায়ে সত্য লাভের প্রয়াসী হইলেও ঐ সকলের দ্বারাই পদে পদে প্রতারিত ও বিপথগামী আমার এ খেলার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কখনও হইবে কি না, এ সকল বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় অজ্ঞানতা নিরন্তরই বিদ্যমান। এ চির-অভাব-গ্রস্ত সংসারে লইবার লোক ত সকলেই! কিন্তু তাহাদের দেয় কে? বাস্তবিক কাহারও যদি কিছু দান করিবার থাকে ত সে কত দিবে, দিক্ না। কিন্তু ভ্রান্ত—শত-ভ্রান্ত মানব সে-কথা বুঝে না। কিছু না থাকিলেও সে নাম-যশের বা অন্য কোন স্বার্থের প্ররোচনায়, অগ্রেই অপরকে যাহা তাহার নাই তাহা দিতে ছুটে বা সে যে তাহা দিতে পারে এইরূপ ভাণ করে এবং 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' আপনিও হায় হায় করিয়া পশ্চাত্তাপ করে এবং অপরকেও সেইরূপ করায়।

সেজন্যই ঠাকুর সংসারে সকলে যে পথে চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ণ মাত্রায় ত্যাগ-বৈরাগ্যসংযমাদির অভ্যাসে আপনাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের ঠিক ঠিক যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিলেন এবং বস্তুলাভ করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া একই স্থানে বসিয়া জীবন কাটাইয়া যথার্থ কার্য্যানুষ্ঠানের এক নূতন ধারা দেখাইয়া গেলেন। দেখাইলেন যে, বস্তুলাভ করিয়া, অপরকে দিবার যথার্থ কিছু সংগ্রহ করিয়া, যেমন তিনি উহা বিতরণের নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন, অমনি অনাহূত হইলেও কোথা হইতে পিপাসু লোক সকল আসিয়া জুটিতে লাগিল, এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি ও স্পর্শে পূত হইয়া নিজেরাই যে কেবল ধন্য হইয়া গেল তাহা নহে, কিন্তু সেই নব ভাব তাহারা যেখানেই যাইতে লাগিল, সেখানেই প্রসারিত করিয়া অপর সাধারণকে ধন্য করিতে লাগিল। কারণ, আমাদের ভিতরে যে ভাবরাশি থাকে তাহাই আমরা বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকি—তা আমরা যেখানেই কেন থাকি না। ঠাকুর তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায়

যেমন বলিতেন, 'যে যা খায় তার ঢেকুরে (উদ্গারে) সেই গন্ধই পাওয়া যায়—সশা খাও, সশার গন্ধ বেরুবে, মূলো খাও, মূলোর গন্ধ বেরুবে, এইরূপই হয়।'

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত সম্মিলন ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। দেখিতে পাই, ঐ সময় হইতেই তিনি শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৎপ্রদর্শিত সাধনমার্গে যেমন দৃঢ় ও দ্রুতপদে অগ্রসর, তেমনিই আবার তাঁহাতে গুরু-ভাবের বিশেষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ। কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিকাশ বাল্যাবধি সকল সময়েই স্বল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; এবং এমন কি, তাঁহার নিজ দীক্ষাগুরুগণও ঐ গুরুভাবের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের অভাব, ত্রুটি ও অবসাদ দূরীভূত করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তির অবসর পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ ও ব্যাকুলতাটা, উন্মত্ততা ও শারীরিক ব্যাধি বলিয়াই অনেকটা গণ্য হইয়া আসিতেছিল এবং উহার উপশমের জন্য চিকিৎসাও হইতেছিল। ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাটীতে পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক সাধক কবিরাজ চিকিৎসার জন্য আগত ঠাকুরকে দেখিয়াই ঐ সকল শারীরিক লক্ষণসমূহকে 'যোগজ-বিকার' বা যোগাভ্যাস করিতে করিতে শরীরে যে সকল অসাধারণ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই, বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, সে কথায় তখন কেহ একটা বড় আস্থা স্থাপন করেন নাই। মথুর প্রমুখ সকলেই স্থির করিতেছিলেন, উহা ঈশ্বরানুরাগের সহিত বায়ুরোগের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞা বিদুষী ব্রাহ্মণীই ঐ সকল শারীরিক বিকারকে, প্রথম, অসাধারণ ঈশ্বরভক্তি প্রসূত দেববাঞ্ছিত মানসিক পরিবর্ত্তনের অনুরূপ দিব্য শারীরিক পরিবর্ত্তন বলিয়া সকলের সমক্ষে নির্দ্দেশ করিলেন। শুধু নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা হইতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত যোগী আচার্য্যগণের জীবনেই যে অপূর্ব্ব মানসিক অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ঐরূপ অনুভূতি সমূহ সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেকথা যে ভক্তিগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাও তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া এবং ঠাকুরের ঐ সকল শারীরিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া নিজ বাক্য প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে কথায়, জননীর আশ্বাসে বালক যেমন

জোর পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, ঠাকুর ত তদ্রূপ করিতে লাগিলেনই; আবার মথুর প্রমুখ কালিবাটীর সকলেও বড় অল্প আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। আবার তাহার উপর যখন ব্রাহ্মণী মথুরকে বলিলেন, 'শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সকলকে আন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার একথা প্রমাণিত করিতে প্রস্তুত,' তখন আর তাঁহাদের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু আশ্চর্য্য হইলে কি হইবে?—ভিক্ষাব্রতাবলম্বিনী নগণ্যা একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথায় ও পাণ্ডিত্যে সহসা কে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে? কাজেই পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিরাজের কথার ন্যায়, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথাও মথুরানাথ প্রভৃতির হৃদয়ে, এক কাণ দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত নিশ্চয়, তবে ঠাকুরের আগ্রহ ও অনুরোধে ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বালকবৎ ঠাকুর, মথুর বাবুকে ধরিয়া বসিলেন, 'ভাল ভাল পণ্ডিত আনাইয়া ব্রাহ্মণী যাহা বলিতেছে, তাহা যাচাইতে হইবে।' ধনী মথুরও ভাবিলেন 'ছোট ভট্চাজের জন্য ঔষধে ও ডাক্তার খরচায় ত এত টাকা ব্যয় হইতেছে, তা ঐরূপ করিতে দোষ কি? পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রাহ্মণীর কথা কাটিয়া দিলে—এবং দিবেও নিশ্চিত—অন্ততঃ একটা লাভও হইবে। পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ছোট ভট্চাজের সরল বিশ্বাসী হৃদয়ে অন্ততঃ এ ধারণাটা হইবে যে, তাঁহার রোগবিশেষ হইয়াছে—তাহাতে তাঁহার নিজের মনের উপর একটা বাঁধ দিতেও ইচ্ছা হইতে পারে। পাগল ত লোকে এইরূপেই হয়—নিজে যাহা করিতেছি, বুঝিতেছি, তাহাই ঠিক, আর অপর দশ জনে যাহা বুঝিতেছে, করিতে বলিতেছে, তাহা ভুল, এইটি নিশ্চয় করিয়া নিজের মনের উপর, চিন্তার উপর, বাঁধ না দিয়া মনকে নিজের বশীভূত রাখিবার চেষ্টা না করিয়াই ত লোক পাগল হয়। আর পণ্ডিতদের না ডাকিয়া ভট্চাজকে ব্রাহ্মণীর কথায় অবাধে বিশ্বাস করিতে দিলে তাঁহার মানসিক বিকার বাড়িয়া শারীরিক রোগও যে বাড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপে কতক কৌতুহলে, কতক ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায়, এইরূপ কিছু একটা ভাবিয়াই যে মথুর, ঠাকুরের অনুরোধে পণ্ডিতদিগকে আনাইতে রাজী হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

কলিকাতার পণ্ডিতমহলে তখন বৈষ্ণবচরণের বেশ প্রতিপত্তি। আবার

অনেক স্থলে তিনি সকলের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠ করায় ইতর সাধারণের নিকটেও তাঁহার খুব- নামযশ। সেজন্য ঠাকুর, মথুর বাবু ও ব্রাহ্মণী সকলেই তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। মথুর তাঁহাকে আনাইতে মনোনীত করিলেন এবং বীরভূম অঞ্চলের ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকেও আনাইবার মানস করিলেন। এইরূপেই বৈষ্ণবচরণ ও ইঁদেশের গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন হয়। ঠাকুরের নিকট আমরা ইঁহাদের অনেক কথা অনেক সময় শুনিয়াছি। তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

বৈষ্ণবচরণ খালি যে পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু একজন ভক্ত সাধক বলিয়াও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে, বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে, সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁহাকে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের একজন নেতা করিয়া তুলিয়াছিল, বলা যাইতে পারে। বিদায় আদায় নিমন্ত্রণাদিতে বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে অগ্রেই সাদরে আহ্বান করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে সমাজ অনেক সময় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন ও তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। আবার সাধনপথের ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ পাইবার জন্য অনেক ভক্ত সাধকও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারই পরামর্শে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। কাজেই ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাদি হইতেছে, কিম্বা কোনরূপ শারীরিকব্যাধিগ্রস্ত হওয়াতে ঐরূপ হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে যে বৈষ্ণবচরণকে মথুর আনিতে সঙ্কল্প করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

ভৈরবী ব্রাহ্মণী আবার ইতিমধ্যে ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সত্য, তদ্বিষয়ে এক বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া নিজেও উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং অপরেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহা এই—ব্রাহ্মণীর আগমনকালের কিছু পূর্ব্ব হইতে ঠাকুর গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন। সে জ্বালা নিবারণের অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সূর্য্যোদয় হইতে যত বেলা হইত ততই সে জ্বালা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত। দুই প্রহরে এত অসহ্য হইয়া উঠিত যে, গঙ্গার জলে শরীর ডুবাইয়া, মাথায় একখানি ভিজা গামছা চাপা দিয়া

দুই তিন ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইত! আবার অত অধিক ক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিলে পাছে বিপরীত ঠাণ্ডা লাগিয়া অন্যরূপ অসুস্থতা উপস্থিত হয়, এজন্য ইচ্ছা না হইলেও জল হইতে উঠিয়া আসিয়া বাবুদের কুঠির ঘরের মর্ম্মর প্রস্তর বাঁধান মেজে ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া, ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া, সেই মেজেতে গড়াগড়ি দিতে হইত!

ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থার কথা শুনিয়াই অন্যরূপ ধারণা করিলেন। বলিলেন, উহা ব্যাধি নয়; উহাও ঠাকুরের মনের প্রবল আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরানুরাগের ফলেই উপস্থিত হইয়াছে। বলিলেন, ঈশ্বরদর্শনের অত্যুগ্র ব্যাকুলতায় শরীরে এইরূপ বিকার-লক্ষণ সকল শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অনেক সময় উপস্থিত হইত। এ রোগের ঔষধও অপূর্ব্ব—সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য ধারণ এবং সর্ব্বাঙ্গে সুবাসিত চন্দন লেপন!

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণীর ঐ প্রকার রোগনির্দ্দেশে বিশ্বাস দূরে থাকুক, মথুর প্রমুখ সকলে হাস্য সম্বরণ করিতেও পারেন নাই! ভাবিয়াছিলেন, কত ঔষধ সেবন, মধ্যমনারায়ণ বিষ্ণুতৈলাদি কত তৈল মর্দ্দন করিয়া যাহার কিছু মাত্র উপশম হইল না, তাহা কি না বলে 'রোগ নয়!' তবে ব্রাহ্মণী যে সহজ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার ব্যবহারে কাহারও কোনও আপত্তিই হইতে পারে না। দুই এক দিন লাগাইয়া কোন ফল না পাইলে রোগী আপনিই উহা ত্যাগ করিবে, ভাবিয়া ব্রাহ্মণীর কথামত ঠাকুরের শরীর চন্দনলেপ ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইল। কিন্তু তিন দিন ঐরূপ অনুষ্ঠানের পর দেখা গেল, ঠাকুরের সে গাত্রদাহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে! সকলে নির্ব্বাক্ আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী মন কি সহজে ছাড়ে? বলিল—ওটা কাকতালীয়ের ন্যায় হইয়াছে আর কি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ঐ শেষে যে বিষ্ণুতৈলটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ওটা একেবারে খাঁটি তেল ছিল; কবিরাজের কথার ভাবেই সেটা বুঝা গিয়াছিল। সেই তৈলটাতেই উপকার হয়ে আস্‌ছিল, আর দুই এক দিন ব্যবহার করিলেই সব জ্বালাটুকু দূর হইত, এমন সময় ভৈরবী চন্দন মাখাবার ব্যবস্থাটা করিয়াছে, তাই ঐ প্রকার হইয়াছে। ব্রাহ্মণী যাই বলুক, আর ব্যবস্থা করুক না কেন, ও তৈলটা বরাবর মাখান উচিত।

কিছু দিন পরে ঠাকুরের শরীরে আবার এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত

হয়। ব্রাহ্মণীর সহজ ব্যবস্থায় উহাও তিন দিনে নিবারিত হইয়াছিল—একথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, "এসময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরৃত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনি যেন কিছু খাই নাই, সমান খাবার ইচ্ছা! দিন রাত্তির কেবলই 'খাই খাই' ইচ্ছা—তার আর বিরাম নাই! ভাবলুম, এ আবার কি ব্যারাম হল? বামনীকে বল্লুম, সে বল্লে 'বাবা, ভয় নাই; ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখন কখন হয়ে থাকে, শাস্ত্রে এ কথা আছে; আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্চি।' এই ব'লে মথুরকে ব'লে ঘরের ভিতর চিঁড়ে মুড়কি থেকে অন্ন ব্যঞ্জন আর সন্দেশ রসগোল্লা লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখ্‌লে, আর বল্লে, 'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন রাত্তির থাক, আর যখন যা ইচ্ছা হবে, তখনই তা খাও।' সেই ঘরে থাকি, বেড়াই, সেই সব খাবার দেখি, নাড়ি চাড়ি; কখনও এটা থেকে কিছু খাই, কখনও ওটা থেকে কিছু খাই—এই রকমে তিন দিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল, তবে বাঁচি!"

যোগ বা ঈশ্বরে মনের তন্ময় ভাবে অবস্থানের অবস্থাটা সহজ হইয়া আসিবার পূর্ব্বে এবং কখন কখন পরেও এইরূপ বিপরীত ক্ষুধাদির উদ্রেকের কথা আমরা সাধকদিগের জীবনে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অবস্থার পরিচয় আমাদের সময়েও অনেক বার পাইয়া অবাক্ হইয়াছি! তবে আমরা যাহা দেখিয়াছি, সেটা একটু অন্য প্রকারের অবস্থা। উপরোক্ত সময়ের মত তখন ঠাকুর নিরন্তর ঐরূপ ক্ষুধায় পীড়িত থাকিতেন না। তবে সহজাবস্থায় সচরাচর ঠাকুরের যেরূপ আহার ছিল, তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক-পরিমাণ খাদ্য ভাবাবস্থায় উদরস্থ করিলেন, অথচ তজ্জন্য কোনই শারীরিক অসুস্থতা হইল না—এইরূপ হইতেই দেখিয়াছি। তাহার দুই একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক উহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বেই ঐ বিষয়ের কিছু আভাষ আমরা পাঠককে দিয়াছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে স্ত্রী-ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে একস্থলে বাগবাজারের কয়েকটি ভদ্র মহিলার ভোলা ময়রার দোকান হইতে একখানি বড় সর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে

গমনের কথা এবং তথায় তাঁহার দর্শন না পাইয়া কোনও প্রকারে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ, শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের, ঠাকুর যাঁহাকে 'মোটা বামুন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, সহসা তথায় আগমনে ঐ সকল মহিলাদের ঠাকুর যে তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিলেন, তাহারই তলে লুকাইয়া থাকা প্রভৃতি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সে রাত্রে ঠাকুর আহারাদির পর দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পুনরায় কিরূপে ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্ত্রী-ভক্তদিগের আনীত বড় সরখানির প্রায় সমস্ত খাইয়া ফেলেন, সেকথাও আমরা পাঠককে বলিয়াছি। এখন ঐরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আমরা এখানে করিব। কয়েকটি ঘটনার কথাই বলিব, কারণ, ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিত। অতএব তদ্বিষয়ের সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

ম্যালেরিয়ার প্রথমাগমন ও প্রকোপে 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ, বিশেষতঃ আবার রাঢ়ভূমি, বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইবার পূর্ব্বাবধি হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা সকলের স্বাস্থ্য যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সকলের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না, একথা এখনও প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, লোকে তখন বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইত। কামারপুকুর, বর্দ্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঐ স্থানের জলবায়ুও তখন বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। দ্বাদশ বৎসর অদৃষ্টপূর্ব্ব কঠোর তপস্যায় এবং পরেও নিরন্তর শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 'ভাবমুখে' থাকায় ঠাকুরের বজ্রসম দৃঢ় শরীরও যে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমে অপটু এবং কখন কখনও প্রবল রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেজন্যই ঠাকুর সাধনকালের অন্তে প্রতিবৎসর চাতুর্ম্মাস্যের সময়টা জন্মভূমি কামারপুকুর অঞ্চলেই কাটাইয়া আসিতেন। পরম অনুগত সেবক, ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত এবং মথুর বাবু, যাওয়া আসার সমস্ত খরচ খরচা ছাড়া, পাছে পল্লীগ্রামে তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব হয় বলিয়া সংসারের আবশ্যকীয় যত কিছু পদার্থ তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিতেন। শুনিয়াছি, লোকে নিজ কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয় পাঠাইবার কালে যেমন প্রদীপের সলতেটি ও আহারান্তে ব্যবহার্য্য খড়কে কাটিটি পর্য্যন্ত সঙ্গে দিয়া থাকে, মথুর বাবু ও তাঁহার পরম ভক্তিমতী গৃহিণী, শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কামারপুকুর পাঠাইবার কালে অনেক

সময় সেইরূপ ভাবে 'ঘর বসত' সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কারণ, মথুর বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর অবিদিত ছিল না যে, কামারপুকুরে ঠাকুরের সংসার যেন শিবের সংসার! সঞ্চয়ের নামগন্ধও ঠাকুরের পিতৃপিতামহের কাল হইতেই ছিল না। সৎপথে থাকিয়া যাহা জোটে, তাহাই খাওয়া—৺ রঘুবীরের নামে প্রদত্ত দশ কাঠা মাত্র জমীতে যে ধান্য হয়, তাহাতেই সমস্ত বৎসর সংসার চালান! আর পল্লীর মুদির দোকানই এ পবিত্র দেবসংসারের ভাণ্ডার! যদি বিদায় আদায়ে কিছু পয়সা কড়ি পাওয়া গেল, তবেই সে ভাণ্ডার হইতে সংসারের ব্যবহার্য্য তরি তরকারী তৈল লবণাদি বাহির হইল; নতুবা পুষ্করিণীর পাড়ের অযত্নলভ্য শাকান্নে আনন্দে জীবন ধারণ! আর সর্ব্বসময়ে সকল বিষয়ে যা করেন জীবন্ত জাগ্রত কুলদেবতা ৺ রঘুবীর! কাজেই মথুর বাবুর শ্রীশ্রীরঘুবীরের নামে কয়েক বিঘা ধান্যজমী ক্রয় করিয়া দিবার আগ্রহ এবং ঠাকুরকে দেশে পাঠাইবার কালে সংসারের আবশ্যকীয় সকল পদার্থ ঠাকুরের সঙ্গে পাঠান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর চাতুর্ম্মাস্যের সময় তখন তখন কামারপুকুরে আসিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরই আসিতেন। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় ঐরূপে এক বৎসর আসিয়া জ্বররোগে বিশেষ কষ্ট পান—তদবধি আর দেশে যাইবেন না, সংকল্প করেন। আর তথায় গমনও করেন নাই। সে যাহা হউক, এ বৎসর তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় কামারপুকুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য বাটীতে প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষের ভিড় লাগিয়াই আছে। আনন্দের হাট বাজার বসিয়াছে! বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার এবং তাঁহাকে দেখিতে সমাগত সকলের সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্তা আছেন। দিনের পর সুখের দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া যাইতেছে, তাহা কাহারও অনুভবই হইতেছে না। সে বাটীতে তখন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল দাদার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীই গৃহিণীস্বরূপে ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দিদি ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাস করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষেরা রাত্রের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করিয়াছেন। ঠাকুরের কয়েক দিন হইতে অগ্নিমান্দ্য ও পেটের অসুখ হইয়াছে, সেজন্য রাত্রে

সাগু, বার্লি ভিন্ন অন্য কিছুই খান না। আজও রাত্রে দুধ বার্লি খাইয়া শয়ন করিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহার আহার ও শয়নের পর নিজেরা আহারাদি করিলেন এবং রাত্রিতে করণীয় সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া এইবার শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সহসা ঠাকুর তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভাবাবেশে টলমল করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন এবং রামলাল দাদার মাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমরা সব শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে, শুলে যে?'

রামলালের মাতা—ওমা, সে কি গো? তুমি যে এই খেলে!

ঠাকুর—কৈ খেলুম? আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্‌চি—কৈ খাওয়ালে?

স্ত্রীলোকেরা সকলে অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন! কিন্তু বুঝিলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু, উপায়? ঘরে এখন আর কোনরূপ খাদ্য দ্রব্যই নাই, যাহা ঠাকুরকে খাইতে দিতে পারেন।—এখন উপায়? কাজেই রামলাল দাদার মাতাকে ভয়ে ভয়ে বলিতে হইল—'ঘরে এখন তো আর কিছু খাবার নাই, কেবল মুড়ি আছে। তা মুড়ি খাবে? দুটি খাওনা। তাতে পেটের অসুখ করবে না।' এই বলিয়া থালে করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর তাহা দেখিয়া বালকের ন্যায় রাগ করিয়া পেছন ফিরিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—'শুধু মুড়ি আমি খাব না।' অনেক বুঝান হইল—'তোমার পেটের অসুখ, অপর কিছু তো খাওয়া চলবে না, আর দোকান পসারও এ রাত্রে সব বন্ধ, সাগু বার্লি যে কিনে এনে করে দিব, তারও যো নাই। আজ এই দুটি খেয়ে থাক, কাল সকালে উঠেই ঝোল ভাত রেঁধে দিব'—ইত্যাদি; কিন্তু সে কথা শুনে কে? ঠাকুরের অভিমানী আবদেরে বালকের ন্যায় সেই একই কথা—'ও আমি খাব না।'

কাজেই রামলাল দাদা তখন বাহিরে যাইয়া ডাকাডাকি করিয়া দোকানীর ঘুম ভাঙ্গাইলেন এবং এক সের মেঠাই কিনিয়া আনিলেন। সেই এক সের মিষ্টান্ন এবং সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালে ঢালিয়া দেওয়া হইলে, তবে ঠাকুর আনন্দ করিয়া খাইতে বসিলেন এবং উহার সকলই নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলেন! তখন বাটীর সকলের ভয়

—এই পেটরোগা মানুষ, মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই সাগু বার্লি খেয়ে থাকা, আর এই রাত্রে এই সব খাওয়া! কাল একটা কাণ্ড হবে আর কি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেখা গেল, পরদিন ঠাকুরের শরীর বেশ আছে, রাত্রের খাবার জন্য কোনরূপ অসুস্থতাই নাই!

আর একবার ঐরূপে কামারপুকুর অঞ্চলে বাস করিবার কালে ঠাকুরকে তাঁহার শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রের আহারাদির পর শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বলিলেন—'বড় ক্ষুধা পেয়েছে।' বাটীর মেয়েরা ভাবিয়া আকুল—কি খাইতে দিবে, ঘরে কিছু নাই। কারণ, সে দিন বাটীতে পূর্ব্বপুরুষদিগের কাহারও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা ঐরূপ একটা কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়াছিল এবং সেজন্য বাটীতে অনেক লোকের আগমন হওয়ায় সকল প্রকার খাদ্যাদিই নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছিল। কেবল হাঁড়িতে কতকগুলা পান্তা ভাত ছিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা ঠাকুরকে ভয়ে ভয়ে ঐ কথা জানাইলে ঠাকুর বলিলেন 'তাই নিয়ে এস।' তাঁহারা বলিলেন—'কিন্তু তরকারি তো নাই।'

ঠাকুর—দেখনা খুঁজে পেতে, তোমরা 'মাছ চাটুই' (ঝাল হলুদে মাছ) করেছিলে তো? দেখনা, তার একটু আছে কি না।

তাঁহারা অনুসন্ধানে দেখিলেন, সে পাত্রে একটি ক্ষুদ্র মৌরলা মাছ ও একটু কাই কাই রস লাগিয়া আছে। অগত্যা তাহাই আনিলেন। দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ! সেই রাত্রে সেই পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন, এবং ঐ একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের সহায়ে এক রেক চালের ভাত খাইয়া শান্ত হইলেন!

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। একদিন ঐরূপে প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠিয়া ঠাকুর রামলাল দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন,'ওরে ভারি ক্ষুধা পেয়েছে, কি হবে?' ঘরে অন্য দিন কত মিষ্টান্নাদি মজুত থাকে, সেদিন খুঁজিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই! অগত্যা রামলাল দাদা নহবৎ খানার নিকটে যাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা শশব্যস্তে উঠিয়া খড় কুটো দিয়া উনুন্ জ্বালিয়া একটি বড় পাথরবাটির পুরোপুরি এক বাটি প্রায় এক সের আন্দাজ, হালুয়া তৈয়ার করিয়া ঠাকুরের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। জনৈকা স্ত্রী-ভক্তই উহা লইয়া আসিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি ঘরে প্রবেশ করিয়াই চমকিত হইয়া দেখিলেন, ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে,

ঠাকুর ঘরের ভিতর ভাবাবিষ্ট হইয়া পায়চারি করিতেছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল নিকটে বসিয়া আছে। সেই ধীর স্থির নীরব নিশীথে ঠাকুরের গম্ভীর ভাবোজ্জ্বল বদন, সেই উন্মাদবৎ মাতোয়ারা নগ্নবেশ ও বিশাল নয়নে স্থির অন্তর্মুখী দৃষ্টি—যাহার সমক্ষে সমগ্র বিশ্বসংসার ইচ্ছামাত্রেই সমাধিতে লুপ্ত হইয়া আবার ইচ্ছামাত্রেই প্রকাশিত হইত, সেই অনন্যমনে গুরুগম্ভীর পাদবিক্ষেপ ও উদ্দেশ্যবিহীন সানন্দ বিচরণ—দেখিয়াই স্ত্রী-ভক্তটির হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরের শরীর যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়িয়া কত বড় হইয়াছে! তিনি যেন এ পৃথিবীর লোক নহেন। যেন ত্রিদিবের কোন দেবতা নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ-হাহাকার-পূর্ণ নরলোকে রাত্রির তিমিরাবরণে গুপ্ত লুক্কায়িত ভাবে নির্ভীক পদসঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন এবং কেমন করিয়া এ শ্মশানভূমিকে দেবভূমিতে পরিণত করিবেন, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে তদুপায় নির্দ্ধারণে অনন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা যে ঠাকুরকে সর্ব্বদা দেখেন, ইনি যেন তিনি নহেন! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং নিকটে যাইতে একটা অব্যক্ত ভয় হইতে লাগিল।

ঠাকুরের বসিবার জন্য রামলাল পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি কোনরূপে যাইয়া সেই আসনের সম্মুখে হালুয়ার বাটিটী রাখিলেন, ঠাকুরও খাইতে বসিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভাবের ঘোরে সে সমস্ত হালুয়াই খাইয়া ফেলিলেন! ঠাকুর কি স্ত্রী-ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন? কে জানে! কিন্তু খাইতে খাইতে, স্ত্রী-ভক্তটী নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল দেখি, কে খাচ্চে? আমি খাচ্চি না আর কেউ খাচ্চে?'

স্ত্রীভক্ত—আমার মনে হচ্চে, আপনার ভিতরে যেন আর একজন কে রহিয়াছেন, তিনিই খাচ্চেন।

ঠাকুর—'ঠিক বলেছ', বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, প্রবল মানসিক ভাবতরঙ্গে ঐ সকল সময়ে ঠাকুরের শরীরে এতদূর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইত যে, তাঁহাকে তখন যেন আর এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহার চাল চলন আহার বিহার ব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়ই যেন অন্য প্রকারের হইয়া যাইত! অথচ ঐরূপ বিপরীত আচরণে

ভাবভঙ্গের পরেও শরীরে কোনরূপ বিকার লক্ষিত হইত না! ভিতরে অবস্থিত মনই যে আমাদের স্থূল শরীরটাকে সর্ব্বক্ষণ ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতেছে এ বিষয়টি আমরা জানিয়াও জানি না, শুনিয়াও বিশ্বাস করি না। কিন্তু বাস্তবিকই যে ঐরূপ হইতেছে, তাহার প্রমাণ আমরা এ অদ্ভুত ঠাকুরের জীবনের এই সকল সামান্য ঘটনা সকলের আলোচনা হইতেও বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু থাক্ এখন ও কথা, আমরা পূর্ব্ব কথারই অনুসরণ করি।

কেহ কেহ বলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মুখেই বৈষ্ণবচরণের কথা মথুর বাবু প্রথম জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থা সকল শারীরিক ব্যাধিবিশেষের সহিত যে সম্মিলিত নহে, তাহা তাঁহার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার মানস করেন। কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকট ঐরূপ শুনি নাই। যাহাই হউক, কিছুদিন পরেই বৈষ্ণবচরণ নিমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। একটি ছোট খাট পণ্ডিতসভার মত যে ঐদিনে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে কতকগুলি ভক্ত সাধক ও পণ্ডিত নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন; তাহার উপর বিদুষী ব্রাহ্মণী ও মথুর বাবুর দলবল, সকলে ঠাকুরের জন্য একত্র সম্মিলিত; সেজন্যই সভা বলিতেছি।

এইবার ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। ব্রাহ্মণী ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লোকমুখে শুনিয়াছেন, এবং যাহা স্বয়ং চক্ষে দেখিয়াছেন, সে সমস্তের উল্লেখ করিয়া, ভক্তিপথের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ আচার্য্য সকলের জীবনে যে সকল অনুভব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ভক্তিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঐ সকল কথার সহিত ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া, উহা একজাতীয় অবস্থা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনি যদি এ বিষয়ে অন্যরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কেন করিতেছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।' মাতা যেমন নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতে বীর দর্পে দণ্ডায়মানা হন, ব্রাহ্মণীও যেন আজ সেইরূপ কোন দৈববলে বলীয়ান হইয়া ঠাকুরের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর। আর ঠাকুর—যাঁহার জন্য এত কাণ্ড হইতেছে? আমরা যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, ঠাকুর বাদানুবাদে নিবিষ্ট ঐ সকল লোকের ভিতর আলুথালুভাবে বসিয়া 'আপনাতে আপনি' আনন্দানুভব ও হাস্য করিতেছেন, আবার

কখন বা বেটুয়াটি হইতে দুটি মউরি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা এমন ভাবে শুনিতেছেন, যেন ঐ সকল কথা অপর কাহারও সম্বন্ধে হইতেছে! আবার কখন বা নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন কথা "ও গো এই রকমটা হয়" বলিয়া বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবচরণ সাধনপ্রসূত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহায়ে ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পারুন আর নাই পারুন, এ ক্ষেত্রে সকল কথা শুনিয়া ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি ব্রাহ্মণীর সকল কথাই হৃদয়ের সহিত যে অনুমোদন করেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শুধু তাহাই নহে—বলিয়াছিলেন যে, যে প্রধান প্রধান উনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবল একমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য, তাহার সকল লক্ষণগুলিই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইঁহাতে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হইতেছে! জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখন জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভিতর বড় জোর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং শাস্ত্র বলেন, পরেও ধারণে কখনও সমর্থ হইবে না। মথুর প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বৈষ্ণবচরণের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্! ঠাকুরও স্বয়ং বালকের ন্যায় বিস্ময় ও আনন্দে মথুরকে বলিলেন, 'ওগো, বলে কি? যা হোক্ বাবু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্চে।'

ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ বৈষ্ণবচরণ যে একটা কথার কথা মাত্র ভাবে করেন নাই, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার অদ্য হইতে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আধিক্য হইতেই পাইয়া থাকি। এখন হইতে তিনি ঠাকুরের দিব্য সঙ্গসুখের জন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে থাকেন, নিজের গোপনীয় রহস্য সাধনসমূহের কথা ঠাকুরকে বলিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করেন এবং কখন কখন আপনার সাধনপথের সহচর ভক্ত সাধক সকলেও যাহাতে ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার ন্যায় কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটেও তাঁহাকে বেড়াইতে

লইয়া যান। পবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমা-সদৃশ, দেবস্বভাব ঠাকুর, ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া এবং ইঁহাদের জীবন ও গুপ্ত সাধনপ্রণালীসমূহ অবগত হইয়াই, সাধারণ দৃষ্টিতে দূষণীয় এবং নিন্দার্হ অনুষ্ঠান সকলও যদি কেহ 'ভগবান্ লাভের জন্য করিতেছি,' ঠিক ঠিক এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধিতে সাধন বলিয়া অনুষ্ঠান করে, তবে ঐ সকল হইতেও অধঃপাতে না গিয়া কালে ক্রমশঃ ত্যাগ ও সংযমের অধিকারী হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করে—এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তবে প্রথম প্রথম ঐ সকল অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এবং কিছু কিছু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ঠাকুরের মনে, 'ইহারা সব বড় বড় কথা বলে, অথচ এমন সব হীন কাজ করে কেন?'—এরূপ ভাবেরও যে উদয় হইয়াছিল, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক সময় শুনিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে ইঁহাদের ভিতরে যাঁহারা যথার্থ সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে দেখিয়া ঠাকুরের মত পরিবর্ত্তনের কথাও আমরা তাঁহারই নিকট শুনিয়াছি। ঠাকুরের শেষোক্ত ধারণা—তিনি কখন কখন, ঐ সকল সাধনপথাবলম্বীদিগের উপর আমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি দূর করিবার জন্য, আমাদের নিকট এই ভাবে প্রকাশ করিতেন—'ওরে দ্বেষ বুদ্ধি করবি কেন? জান্‌বি ওটাও একটা পথ ; তবে অশুদ্ধ পথ। একটা বাড়ীতে ঢোক্‌বার যেমন নানা দরজা থাকে—সদর ফটক থাকে, খিড়কির দরজা থাকে, আবার বাড়ীর ময়লা সাফ্ করবার জন্য বাড়ীর ভিতর মেথর ঢোক্‌বারও একটা দরজা থাকে—এও জান্‌বি তেমনি একটা পথ। যে যেদিক দিয়াই ঢুকুক্ না কেন, বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লে সকলে একস্থানেই পৌঁছায়। তা বলে কি তোদের ঐরূপ করতে হবে? না, ওদের সঙ্গে মেশামিশি করতে হবে? তবে দ্বেষ কর্‌বি না।'

প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবগণ কি সহজে নিবৃত্তিপথে উপস্থিত হয়? সহজে কি সে শুদ্ধ সরলভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে অগ্রসর হয়? শুদ্ধতার ভিতরে সে কিছু কিছু অশুদ্ধতা স্বেচ্ছায় ধরিয়া রাখিতে চায়, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াও উহার একটু আধটু গন্ধ প্রিয় বোধ করে, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া শুদ্ধভাবে জগদম্বার পূজা করিয়াই আবার পরক্ষণে তাঁহার সন্তোষার্থ বিপরীত কামভাবসূচক সঙ্গীত গাহিবার বিধান পূজাপদ্ধতির ভিতর ঢুকাইয়া রাখে। ইহাতে বিস্মিত হইবার বা নিন্দা

করিবার কিছুই নাই। তবে ইহাই বুঝা যায় যে, অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-নায়িকা মহামায়ার প্রবল প্রতাপে দুর্ব্বল মানব কামকাঞ্চনের কি বজ্র বন্ধনেই আবদ্ধ রহিয়াছে! বুঝা যায় যে, তিনি এ বন্ধন কৃপা করিয়া না ঘুচাইলে জীবের মুক্তিলাভ একান্ত অসাধ্য। বুঝা যায়, যে তিনি কাহাকে কোন্ পথ দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। আর স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আপনার অন্তরের কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া ধরিয়া এ অদ্ভূত ঠাকুরের জীবন-রহস্য তুলনায় পাঠ করিতে বসিলে ইনি এক অপূর্ব্ব অমানব পুরুষোত্তম পুরুষ, স্বেচ্ছায়, লীলায় বা আমাদের প্রতি করুণায় আমাদের এ হীন সংসারে কিছু কালের জন্য, বহির্দৃষ্টে দীনের দীন ভাবে হইলেও জ্ঞান দৃষ্টে মহৎ রাজরাজেশ্বরের ভাবে বাস করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডে যোগের সহিত ভোগের মিলন ছিল; রূপরসাদি সকল বিষয়ের নিয়মিত ভোগ দেবতার উপাসনা করিয়া লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবমন যখন অনেকটা বাসনাবর্জ্জিত হইয়া আসিত, তখনই সে উপনিষদোক্ত শুদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে চেষ্টা হইল অন্য প্রকারের। অরণ্যবাসী বাসনাশূন্য সাধকদিগের শুদ্ধভাবের উপাসনা, ভোগবাসনাপূর্ণ সংসারী মানবকে নির্ব্বিশেষে দিবার বন্দোবস্ত হইল। তাৎকালিক রাজশাসনও বৌদ্ধ যতীদিগের ঐ চেষ্টায় সহায়তা করিতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, যাহা প্রবৃত্তিমার্গেস্থিত মানবমনকে নিয়মিত ভোগাদি প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে যোগের নিবৃত্তিমার্গে উপনীত করিতেছিল, তাহার বাহিরে উচ্ছেদ—কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীরব নিশীথে জনশূন্য বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানাদি চত্বরে অনুষ্ঠেয় তন্ত্রোক্ত গুপ্ত সাধনপ্রণালীরূপে প্রকাশ! তন্ত্রে প্রকাশ,মহাযোগী মহেশ্বর বৈদিক অনুষ্ঠান সকল নির্জীব হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে পুনরায় সজীব করিয়া ভিন্নাকারে তন্ত্ররূপে প্রকাশিত করিলেন। এই প্রবাদে বাস্তবিকই মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। কারণ, তন্ত্রে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ন্যায় যোগের সহিত ভোগের সম্মিলন ত লক্ষিত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসমূহ যেমন উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে সুদূরে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছিল, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকল তেমন ভাবে না থাকিয়া প্রতি ক্রিয়াটিই অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ

ভাবে জড়িত রাখিয়াছিল। দেখ না, তুমি কোন দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রেই তোমার কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈত ভাবে অবস্থানের চিন্তা করিতে হইবে; পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বর-জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমারই ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে—ইহাই চিন্তা করিতে হইবে। মানবজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য, প্রেমে ঈশ্বরের সহিত একাকার হইয়া যাইবার কি সুন্দর চেষ্টাই না ঐ ক্রিয়ায় লক্ষিত হইয়া থাকে! অবশ্য সহস্রের ভিতর হয়ত একজন উন্নত উপাসক ঐ ক্রিয়াটি ঠিক ঠিক করিতে পারেন, কিন্তু সকলেই ঐরূপ করিবার এতটুকু চেষ্টাও ত করে, তাহাতেই যে বিশেষ লাভ—কারণ, ঐরূপ করিতে করিতেই যে তাহারা ধীরে ধীরে উন্নত হইবে। তন্ত্রের প্রতি ক্রিয়ার সহিতই এইরূপে জ্ঞানের ভাব সম্মিলিত থাকিয়া সাধককে চরম লক্ষ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে নূতনত্ব এবং এই জন্যই তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীর ভারতের জনসাধারণের মনে এতদূর প্রভুত্ব-বিস্তার।

তন্ত্রের আর এক নূতনত্ব—জগৎকারণ মহামায়ার মাতৃত্ব-ভাবের প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তির উপর একটা শুদ্ধ পবিত্র ভাব আনয়ন। বেদ পুরাণ ঘাঁটিয়া দেখ, এ ভাবটি আর কোথাও নাই। উহা তন্ত্রের একেবারে নিজস্ব। বেদের সংহিতা ভাগে স্ত্রী-শরীরের উপাসনার একটু আধটু বীজ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, বিবাহকালে কন্যার ইন্দ্রিয়কে 'প্রজাপতের্দ্বিতীয়ং মুখং' বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করিবার দ্বিতীয় মুখ অভিধান দিয়া উহা যাহাতে সুন্দর তেজস্বী গর্ভ ধারণ করে এজন্য, "গর্ভং ধেহি সিনীবালি" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতা সকলের উপাসনা এবং ঐ ইন্দ্রিয়ের পবিত্র ভাবে উপাসনার বিশেষ বিধান আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, বৈদিক সময় হইতে যোনিলিঙ্গের উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। বাবিল নিবাসী সুমের জাতি এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই স্থূলভাবে ঐ উপাসনা যে প্রথম প্রচলিত ছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতীয় তন্ত্র, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভাব যেমন আপন শরীরে প্রত্যেক

অনুষ্ঠানের সহিত একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল, তেমনি আবার অধিকারী বিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঐ উপাসনার ভিতর দিয়াই সহজে হইবে দেখিয়া দ্রাবিড় জাতির ভিতরে নিবদ্ধ স্ত্রীশরীরের উপাসনাটির অনেকটা স্থূলভাব উল্টাইয়া দিয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বৈদিক যুগের উপাসনার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটি সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ বিকশিত করিল এবং উহাও নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লইল। তন্ত্রে বীরাচারের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্ত্রকার কুলাচার্য্যগণ ঠিকই বুঝিয়াছিলেন প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থূল রূপরসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবেই করিবে; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহার প্রিয় ভোগ্য বস্তুর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দিতে পারেন, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না—ঐ তীব্র শ্রদ্ধাবলে স্বল্প কালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইবে, নিশ্চয়। সেজন্যই তন্ত্রকার প্রচার করিলেন—নারীশরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ, নারীতে মনুষ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেবী-বুদ্ধি সর্ব্বদা রাখিবে এবং জগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, নারীর পাদোদক ভক্তিপরায়ণ হইয়া পান করিবে এবং ভ্রমেও কখন নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার করিবে না। যথা—

যস্যাঃ অঙ্গে মহেশানি সর্ব্বতীর্থানি সন্তিবৈ। পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র—১৪ পটল।
শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে।
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ॥ উত্তর তন্ত্র—২য় পটল।
শক্ত্যাঃ পাদোদকং যস্তু পিবেদ্ভক্তিপরায়ণঃ।
উচ্ছিষ্টং বাপি ভুঞ্জীত তস্য সিদ্ধিরখণ্ডিতা॥ নিগমকল্পদ্রুম।
স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণং।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাসু নিন্দাং প্রহারকং। মুণ্ডমালা তন্ত্র—৫ম পটল।

কিন্তু হইলে কি হইবে? কালে তান্ত্রিক সাধকদিগের ভিতরেও এমন একটা যুগ আসিয়াছিল, যখন ঈশ্বর ও জ্ঞানলাভ ছাড়িয়া তাঁহারা সামান্য সামান্য মানসিক শক্তি বা সিদ্ধাই সকল লাভেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই নানাপ্রকার অস্বাভাবিক সাধনপ্রণালী ও ভূতপ্রেতাদির উপাসনা তন্ত্রশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে বর্ত্তমানাকার ধারণ করাইয়াছিল। প্রতি তন্ত্রের ভিতরেই সেজন্য উত্তম ও অধম, উচ্চ ও হীন এই দুই স্তরের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উচ্চাঙ্গের ঈশ্বরোপাসনার সহিত

হীনাঙ্গের সাধন সকলও সন্নিবেশিত দেখা যায়। আর যাহার যেমন প্রকৃতি, সে উহার ভিতর হইতে সেই মতটি বাছিয়া লয়।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রাদুর্ভাবে আবার একটি নূতন পরিবর্ত্তন তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি এবং তৎপরবর্ত্তি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণে দ্বৈতভাবের বিস্তারেই মঙ্গল, ধারণা করিয়া তান্ত্রিক সাধনপ্রণালীর ভিতর হইতে অদ্বৈতভাবের ক্রিয়াগুলি অনেকাংশে বাদ দিয়া, কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রশাস্ত্র ও বাহ্যিক উপাসনাটি জনসাধারণে প্রচলিত করিলেন। ঐ উপাসনা ও পূজাদিতেও তাঁহারা নবীন ভাব প্রবেশ করাইয়া আত্মবৎ দেবতার সেবা করার উপদেশ দিলেন। তান্ত্রিক দেবতাকুল, নিবেদিত ফলমূল আহার্য্যাদি দৃষ্টি মাত্রেই সাধকেব নিমিত্ত পূত করিয়া দেন এবং উহার গ্রহণে সাধকের কামক্রোধাদি পশুভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নবপ্রবর্ত্তিত প্রণালীতে দেবতাগণ ঐ সকল আহার্য্যের সূক্ষ্মাংশ এবং সাধকের ভক্তির আতিশয্য ও নিগ্রহ নিবন্ধনে কখন কখন স্থূলাংশও গ্রহণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইল। উপাসনাপ্রণালীতে এইরূপে আরও অনেক পরিবর্ত্তন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সংসাধিত হয়; তন্মধ্যে প্রধান এইটিই বলিয়া বোধ হয়—তাঁহারা যতদূর সম্ভব তন্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বাহ্যিক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আহারে শৌচ, বিহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচি শুদ্ধ থাকিয়া "জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ"—নামব্রহ্মজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, ইহাই তাঁহাদের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ করিলে কি হইবে? তাঁহাদের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধমার্গেও কলুষিত ভাব সকল প্রবেশ করাইয়া ফেলিল! সূক্ষ্মভাবটুকু ছাড়িয়া স্থূলবিষয় গ্রহণ করিয়া বসিল—পরকীয়া নায়িকার উপপতির প্রতি আন্তরিক টানটুকু গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে উহার আরোপ না করিয়া পরকীয়া স্ত্রীই গ্রহণ করিয়া বসিল! এবং এইরূপে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-যোগ-মার্গের ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের প্রবৃত্তির মত করিয়া লইল; আর না করিয়াই বা সে করে কি? সে যে অত শুদ্ধভাবে চলিতে অক্ষম। সে যে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত ভাবই গ্রহণ করিতে পারে। সে ধর্ম্মলাভ চায়;

কিন্তু তৎসঙ্গে একটু আধটু রূপরসাদি ভোগেরও লালসা রাখে। সেজন্যই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতর কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্ত সাধনপ্রণালী সকলের উৎপত্তি। ঐ সকলের মূলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বহুপ্রাচীন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রবাহ, সেই যোগ ও ভোগের সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তান্ত্রিক কুলাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত প্রতি ক্রিয়ার সম্মিলনের কিছু কিছু ভাব।

কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, মুক্তি, সংযম, ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি কথার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঠাকুর ঐ সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় এগুলি আমাদের বলিতেন। সরল গ্রাম্য ভাষায় ও ছন্দোবন্দে লিপিবদ্ধ হইয়া উহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সকল উচ্চ ভাব গ্রহণের কতদূর সহায়তা করে, তাহা পাঠক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকে ঈশ্বরকে 'আলেক্‌লতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'অলক্ষ্য' কথাটি হইতেই 'আলেক্‌' কথাটির উৎপত্তি। ঐ 'আলেক্‌' শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনে প্রবিষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া 'কর্ত্তা' বা গুরুরূপে আবির্ভূত হন। ঐরূপ মানবকে ইঁহারা 'সহজ' উপাধি দিয়া থাকেন। যথার্থ গুরুভাবে ভাবিত মানবই এ সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহার নাম 'কর্ত্তাভজা' হইয়াছে। 'আলেক্ লতার' স্বরূপ ও বিশুদ্ধ মানবে আবেশ সম্বন্ধে ইহারা এইরূপ বলেন—

আলেকে আসে, আলেকে যায়,
আলেকের দেখা কেউ না পায়,
আলেক্‌কে চিনেছে যেই,
তিন লোকের ঠাকুর সেই॥

'সহজ' মানুষের লক্ষণ, তিনি 'অটুট' হইয়া থাকেন—অর্থাৎ রমণীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলেও তাঁহার কখনও কামভাবে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। এই সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন—

রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।

সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর অনাসক্ত ভাবে না থাকিলে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সেজন্য সাধকদিগের প্রতি উপদেশ—

রাঁধুনি হইবি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।
অমিয় সাগরে সিনান্ করিবি, কেশ না ভিজিবে তায়।

তন্ত্রের ভিতর সাধকদিগকে যেমন পশু বীর ও দিব্য ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা আছে, ইঁহাদের ভিতরেও সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে—

'আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই—সাঁইয়ের পরে আর নাই।'

অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে তবে মানব 'সাঁই' হইয়া থাকে।

ঠাকুর বলিতেন, ইঁহারা সকলে ঈশ্বরের 'অরূপরূপের' ভজনা করে এবং ঐ সম্প্রদায়ের কয়েকটি গানও আমাদের নিকট অনেক সময় গাহিতেন। যথা—

বাউলের সুর।

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন।
(ওরে) খোঁজ খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
(আবার) দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গি, চালায় আবার সে কোন জন
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

এইরূপে গুরুর উপাসনা ও সকলে একত্রিত হইয়া ভজনাদিতে নিবিষ্ট থাকা—ইহাই ইঁহাদের প্রধান সাধন। ইঁহারা দেবদেবীর মূর্ত্ত্যাদির অস্বীকার না করিলেও উপাসনা বড় একটা করেন না। ভারতে গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা অতীব প্রাচীন; উপনিষদের কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ, উপনিষদেই রহিয়াছে 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।' তখন দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত আদৌ হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। সেই আচার্য্যোপাসনা কালে ভারতে কতরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়!

এতদ্ভিন্ন শুচি অশুচি, ভাল মন্দ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে ত্যাগ করিবার জন্য নানাপ্রকারের অনুষ্ঠানও সাধককে করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, সে সকল, সাধকেরা গুরুপরম্পরায় অবগত হইয়া থাকেন। ঠাকুর তাহারও কিছু কিছু কখন কখন উল্লেখ করিতেন।

ঠাকুরকে অনেক সময় বলিতে শুনা যাইত, 'বেদ পুরাণ কাণে শুন্‌তে

হয়, আর তন্ত্রের সাধন সকল কাজে কর্‌তে হয়, হাতে নাতে করতে হয়।' দেখিতেও পাওয়া যায়,' ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্মৃতির অনুগামী সকলে কোনও না কোনওরূপ তান্ত্রিকী সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ন্যায়-বেদান্তের পণ্ডিত সকলে, অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক। বৈষ্ণবসম্প্রদায় সকলের ভিতরেও সেইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের পণ্ডিত সকলে কর্ত্তাভজাদি সম্প্রদায় সকলের গুপ্ত সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। পণ্ডিত বৈষ্ণব-চরণও এই দলভুক্ত ছিলেন। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে কাছি বাগানে ঐ সম্প্রদায়ের আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঐ স্থলে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ঠাকুরকে বৈষ্ণবচরণ এখানে কয়েক বার লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখানকার কতকগুলি স্ত্রীলোক ঠাকুরকে এক সময়ে ইন্দ্রিয়জয়িত্ব বিষয়ে পরীক্ষাও করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সদা-সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিতে এবং ভগবৎপ্রেমে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্বভাবাদি দেখিয়া তাঁহাকে 'অটুট সহজ' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য বালকস্বভাব ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে ও অনুরোধে তথায় সরল ভাবেই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উহারা যে তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করিবে, তাহা কিছুই জানিতেন না। যাহাই হউক, তদবধি তিনি আর ঐ স্থানে গমন করেন নাই।

ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্রবল, পবিত্রতা ও ভাবসমাধি দেখিয়া তাঁহার উপর বৈষ্ণবচরণের ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পরিশেষে তিনি ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের নিকট কিছুদিন যাতায়াত করিতে না করিতেই ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী পণ্ডিত একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তিনি পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া একটি মজার ঘটনা ঘটে। ঠাকুরের নিকটেই উহা আমরা শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, গৌরীর একটি সিদ্ধাই বা তপস্যালব্ধ ক্ষমতা ছিল। শাস্ত্রীয় তর্কবিচারে আহূত হইয়া যেখানে তিনি যাইতেন, সেই বাটীতে প্রবেশকালে এবং যেখানে বিচার হইবে সেই

সভাস্থলে প্রবেশকালে তিনি উচ্চরবে কয়েকবার 'হা রে রে রে, নিরালম্বো লম্বোদরজননী কং যামি শরণং'—এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তবে সে বাটীতে ও সভাস্থলে প্রবেশ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, জলদগম্ভীর স্বরে তাঁহার সেই বীরভাবদ্যোতক "হা রে রে রে" শব্দ এবং আচার্য্যকৃত দেবী-স্তোত্রের ঐ এক পাদ তাঁহার মুখ হইতে শুনিলে সকলের হৃদয় কি একটা অব্যক্ত ত্রাসে চমকিত হইয়া উঠিত! উহাতে দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইত। প্রথম, ঐ শব্দে গৌরীর ভিতরের শক্তি সম্যক্ জাগরিতা হইয়া উঠিত; এবং দ্বিতীয়, তিনি উহার দ্বারা শত্রুপক্ষকে চমকিত ও মুগ্ধ করিয়া তাহাদের বলহরণ করিতেন। ঐরূপ শব্দ করিয়া এবং কুস্তিগীর পাহালোয়ানেরা যেরূপে বাহুতে তাল ঠোকে সেইরূপ তাল ঠুকিতে ঠুকিতে গৌরী সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন, ও বাদসাহী দরবারে সভ্যেরা যে ভাবে উপবেশন করিত, পদদ্বয় মুড়িয়া তাহার উপর সেই ভাবে সভাস্থলে বসিয়া তিনি তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তখন গৌরীকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না।

গৌরীর ঐ সিদ্ধাইয়ের কথা ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পদার্পণ করিয়া যেমন গৌরী উচ্চরবে "হা রে রে রে" শব্দ করিলেন, অমনি ঠাকুরের ভিতরে কে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গৌরীর অপেক্ষা উচ্চরবে ঐ শব্দ করাইতে লাগিল! ঠাকুরের মুখনিঃসৃত ঐ শব্দে গৌরী উচ্চতর রবে ঐ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আবার তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তদপেক্ষা উচ্চতর রবে "হা রে রে রে" করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বারম্বার সেই দুই পক্ষের "হা রে রে রে" রবে যেন ডাকাত পড়ার মত এক ভীষণ আওয়াজ উঠিল। কালীবাটীর দরোয়ানেরা যে যেখানে ছিল, শশব্যস্ত হইয়া লাঠি সোটা লইয়া তদভিমুখে ছুটিল। অন্য সকলে ভয়ে অস্থির! যাহা হউক, গৌরী এক্ষেত্রে ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর রবে আর ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া শান্ত হইলেন এবং একটু যেন বিষণ্ণ ভাবে ধীরে ধীরে কালীবাটীতে প্রবেশ করিলেন। অপর সকলেও, ঠাকুর এবং নবাগত পণ্ডিতজীই ঐরূপ করিতেছিলেন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে যে যার স্থানে চলিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, 'তার পর মা জানাইয়া দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাইয়ে লোককে মোহিত ও বলহরণ ক'রে নিজে অজেয় থাক্‌ত, সেই শক্তির এখানে

পরাজয় হওয়াতে তার আর ঐ সিদ্ধাই থাক্‌ল না। মা তার কল্যাণের জন্য গৌরীর শক্তিটা (নিজেকে দেখাইয়া) এর ভিতর টেনে নিলেন।' বাস্তবিকও দেখা গিয়াছিল, গৌরী দিন দিন ঠাকুরের ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌরী পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, গৌরী প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় জগদম্বার পূজার যথাযথ সমস্ত আয়োজন করিতেন এবং বসনালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া আলপনা দেওয়া পীঠে বসাইয়া, নিজের গৃহিণীকেই শ্রীশ্রীজগদম্বা জ্ঞানে তিন দিন ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। তন্ত্রের শিক্ষা, যত স্ত্রী-মূর্ত্তি, সকলই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি—সকলেই, জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। সেজন্য স্ত্রীমূর্ত্তিমাত্রকেই মানবের পবিত্রভাবে পূজা করা উচিত। স্ত্রীমূর্ত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, একথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তুবিশেষ বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দেখিলে উহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতারই অবমাননা করা হয়; এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। চণ্ডীতে দেবতাগণও দেবীকে স্তব করিতে করিতে ঐ কথা বলিতেছেন—

> বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ,
> স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
> ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
> কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তি॥

হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণি! জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার বিদ্যা আছে—যাহা হইতে লোকের অশেষপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে—সে সকল তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা! তুমিই স্বয়ং জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে বিদ্যমান! তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান! তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা—স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে! ভারতের সর্ব্বত্র আমরা নিত্যই ঐ স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু হায়! কয়জন কতক্ষণ দেবীবুদ্ধিতে স্ত্রীশরীর অবলোকন করিয়া যথাযথ সম্মান দিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম করিয়া থাকি? শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধার-স্বরূপিনী স্ত্রীমূর্ত্তিকে হীন বুদ্ধিতে কলুষিত নয়নে দেখিয়া

কে না দিনের ভিতর শতবার সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকি? হায় ভারত, ঐরূপ পশুবুদ্ধিতে স্ত্রীশরীরের অবমাননা করা এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে ভুলিয়াই তোমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা! কবে জগদম্বা আবার কৃপা করিয়া তোমার এ পশুবুদ্ধি দূর করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

গৌরী পণ্ডিতের আর একটি অদ্ভুত শক্তির কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকেরা জগন্মাতার নিত্যপূজান্তে হোম করিয়া থাকেন। গৌরীও সকল দিন না হউক, অনেক সময় হোম করিতেন। কিন্তু তাঁহার হোমের প্রণালী অতি অদ্ভুত ছিল। অপরসাধারণে যেমন জমীর উপর মৃত্তিকা বা বালুকা দ্বারা বেদি রচনা করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সজাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং আহুতি দিয়া থাকেন, তিনি সেরূপ করিতেন না। তিনি স্বীয় বামহস্ত শূন্যে প্রসারিত করিয়া, হস্তের উপরেই এক কালে এক মন কাঠ সাজাইতেন এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ অগ্নিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেন! হোম করিতে কিছু অল্প সময় লাগে না, ততক্ষণ হস্ত শূন্যে প্রসারিত রাখিয়া ঐ এক মন কাষ্ঠের গুরু ভার ধারণ করিয়া থাকা এবং তদুপরি হস্তে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়া মন স্থির রাখা ও যাথযথভাবে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আহুতি প্রদান করা—আমাদের নিকট একেবারে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সেজন্য আমাদের অনেকে ঠাকুরের মুখে শুনিয়াও ঐ কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেন, 'আমি নিজের চক্ষে তাকে ঐরূপ করতে দেখেছি রে। ওটাও তার একটা সিদ্ধাই ছিল।'

গৌরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কয়েক দিন পরেই মথুর বাবু বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ কয়েক জন সাধক পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া একটি সভার অধিবেশন করিলেন। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বের ন্যায় ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে নবাগত পণ্ডিতজীর সহিত আলোচনা ও নির্দ্ধারণ করা। প্রাতেই সভা আহূত হয়। স্থান, শ্রীশ্রীকালিকা মাতার মন্দিরের সম্মুখে, নাট-মন্দিরে। বৈষ্ণবচরণের কলিকাতা হইতে আসিয়া জুটিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর গৌরীকে সঙ্গে করিয়া অগ্রেই সভাস্থলে চলিলেন, এবং সভাপ্রবেশের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীচরণ বন্দনাদি করিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে যেমন মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে বৈষ্ণবচরণ তাঁহার

পদপ্রান্তে প্রণত হইতেছেন। দেখিয়াই ঠাকুর অপূর্ব্বভাবে প্রেমে বৈষ্ণব-চরণের স্কন্ধদেশে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং বৈষ্ণবচরণও উহাতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া তদ্দণ্ডেই রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন! ঠাকুরের সেই সমাধিস্থ প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্ত্তি, এবং বৈষ্ণবচরণের তদ্রূপে আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সুললিত স্তবপাঠ, দেখিয়া শুনিয়া মথুর প্রমুখ উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! কতকক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন ধীরে ধীরে সকলে তাঁহার সহিত সভাস্থলে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এই বার সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরী প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, (ঠাকুরকে দেখাইয়া) 'উনি যখন পণ্ডিতজীকে এরূপ কৃপা করিলেন, তখন আজ আর আমি উঁহার (বৈষ্ণবচরণের) সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইব না; *হইলেও আমাকে নিশ্চয় পরাজিত হইতে হইবে*, কারণ উনি (বৈষ্ণবচরণ) আজ দৈব বলে বলীয়ান্! বিশেষতঃ উনি ত (বৈষ্ণবচরণ) দেখিতেছি, আমারই মতের লোক—ঠাকুরের সম্বন্ধে উঁহারও যাহা ধারণা, আমার তাহাই; অতএব এস্থলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।' অতঃপর শাস্ত্রীয় অন্যান্য কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

গৌরী যে বৈষ্ণবচরণের পাণ্ডিত্যে ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত অদ্য তর্কযুদ্ধে নিরস্ত হইলেন, তাহা নহে। ঠাকুরের চাল চলন আচার ব্যবহার এবং অন্যান্য লক্ষণাদি দেখিয়া এই অল্প দিনেই গৌরী তপস্যাপ্রসূত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহায়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন—ইনি সামান্য নহেন, ইনি মহাপুরুষ! কারণ, ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর এক দিন গৌরীর মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে। এটা কি হতে পারে? তোমার কি বোধ হয়, বল দেখি?'

গৌরী তাহাতে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—'বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে ত ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোক-কল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য্য সাধন করেন, আপনি তিনি!' ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'ও বাবা, তুমি যে আবার তাকেও (বৈষ্ণব-

চরণকেও) ছাড়িয়ে যাও! কেন বল দেখি? আমাতে কি দেখেছ, বল দেখি?' গৌরী বলিলেন, 'শাস্ত্রপ্রমাণে এবং নিজের প্রাণের অনুভব হইতেই বলিতেছি। এ বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।'

ঠাকুর বালকের ন্যায় বলিলেন, 'তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি ত কিছু জানি না!'

গৌরী বলিলেন, 'ঠিক কথা। শাস্ত্রও ঐ কথা বলেন—আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কি করে জানবে বলুন!'

পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

দিন দিন গৌরী ঠাকুরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনের ফল এত দিনে ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া সংসারে তীব্র বৈরাগ্যরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিন দিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোকমান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে গুটাইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর গৌরীর সে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নাই, সে দাম্ভিকতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে তর্কপ্রিয়তা এককালে নীরব হইয়াছে। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, ঈশ্বরপাদপদ্ম লাভের একান্ত চেষ্টা না করিয়া এত দিন বৃথা কাল কাটাইয়াছেন—আর ওরূপে কালক্ষেপ উচিত নহে। তাঁহার মনে এখন সংকল্প স্থির—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিয়া দিন কয়টা কাটাইয়া দিবেন; এইরূপে যদি তাঁর কৃপা ও দর্শন লাভ করিতে পারেন!'

এইরূপে ঠাকুরের সঙ্গসুখে ও ঈশ্বরচিন্তায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন বাটী হইতে অন্তরে আছেন বলিয়া ফিরিবার জন্য পণ্ডিতজীর স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ বারম্বার পত্র লিখিতে লাগিল। কারণ, তাহারা লোকমুখে আভাষ পাইতেছিল, দক্ষিণেশ্বরের কোন এক উন্মত্ত সাধুর সহিত মিলিত হইয়া পণ্ডিতজীর মনের অবস্থা কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে!

পাছে তাহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে টানাটানি করিয়া সংসারে পুনরায় লিপ্ত করে, পণ্ডিতজীর মনে সে একটা ভাবনাও তাহাদের চিঠির আভাষে ক্রমে প্রবল প্রবলতর হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গৌরী

উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং শুভ মুহূর্ত্তের উদয় জানিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করিয়া সজল নয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'সে কি গৌরী, সহসা বিদায় কেন? কোথায় যাবে?'

গৌরী করজোড়ে উত্তর করিলেন—'আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ঈশ্বরবস্তু লাভ না করিয়া আর সংসারে ফিরিব না।' তদবধি সংসারে আর কখনও কেহ বহু অনুসন্ধানেও গৌরী পণ্ডিতের দেখা পাইলেন না!

এইরূপে ঠাকুর বৈষ্ণবচরণ এবং গৌরীর জীবনের নানা কথা আমাদিগের নিকট অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। আবার কখন বা কোন বিষয়ের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলেন, সে বিষয়েরও উল্লেখ করিতেন। আমাদের মনে আছে, একদিন জনৈক ভক্ত সাধককে উপদেশ দিতে দিতে ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন, 'মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবান্ লাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বলতো—'নরলীলায় বিশ্বাস হইলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয়।'

কখন বা কোন ভক্তের 'কালী' ও 'কৃষ্ণে' বিশেষ ভেদবুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে বলিতেন—'ও কি হীন বুদ্ধি তোর? জান্‌বি যে, তোর ইষ্টই কালী কৃষ্ণ গৌর সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বল্‌ছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি। দেখ্ না, গেরস্তর বৌ, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দ্যাওর ভাসুর সকলকে মান্য করে, ভক্তি করে, সকলের সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা, আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে,স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জান্‌বি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা—এইটে জান্‌বি। আর জেনে, দ্বেষবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি। গৌরী বলতো—কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে বুঝবো যে, ঠিক জ্ঞান হল।'

আবার কখন বা ঠাকুর, কোন ভক্তের মন সংসারে কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় ভগবানে স্থির হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে তাহার ভালবাসার পাত্রকেই ভগবানের মূর্ত্তিজ্ঞানে সেবা করিতে, ভালবাসিতে

বলিতেন। লীলাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, কেমন করিয়া ঠাকুর জনৈকা স্ত্রী ভক্তের মন তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অত্যন্ত আসক্ত দেখিয়া তাঁহাকে ঐ বালককেই গোপাল বা বালকৃষ্ণ জ্ঞানে সেবা করিতে—ভালবাসিতে বলিতেছেন; এবং ঐরূপ অনুষ্ঠানের ফলে ঐ স্ত্রীভক্তের স্বল্পকালেই ভাবসমাধি উদয়ের কথারও উল্লেখ করিয়াছি। ভালবাসার পাত্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করার কথা বলিতে বলিতে কখন কখন ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের ঐ বিষয়ক মতের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'বৈষ্ণবচরণ বলতো, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জান্‌লে ভগবানে শীঘ্র মন যায়।' বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন—সে ঐ কথা তাদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের করিতেই বলিত; তজ্জন্য দুষ্য হইত না—তাহাদের সব পরকীয়া নায়িকার ভাব কিনা? পরকীয়া নায়িকার উপপতির উপর যেমন মনের টান, সেই টানটা ঈশ্বরে আরোপ করিতেই তাহারা চাহিত। ওটা কিন্তু সাধারণে শিক্ষা দিবার যে কথা নহে, তাহাও ঠাকুর বলিতেন। বলিতেন, 'তাতে ব্যভিচার বাড়বে।' তবে নিজের পতি পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয়কে ঈশ্বরের মূর্ত্তি জ্ঞানে সেবা করিতে—ভালবাসিতে ঠাকুরের অমত ছিল না, এবং তাঁহার পদাশ্রিত অনেক ভক্তকে যে তিনি ঐরূপ করিতে শিক্ষাও দিতেন, তাহা আমাদের জানা আছে।

ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক উহা যে অশাস্ত্রীয় নবীন মত নহে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্‌কার ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন—'পতির ভিতর তিনি রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়; স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' এইরূপে,—ব্রাহ্মণের ভিতর, ক্ষত্রিয়ের ভিতর, ধনের ভিতর, পৃথিবীর যে সমস্ত বস্তু প্রিয়বুদ্ধির উদয় করিয়া মানব-মন আকর্ষণ করে, সে সমস্তের ভিতরেই প্রিয়স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের অংশের বিদ্যমানতা দেখিয়া ভালবাসিবার উপদেশ ভারতের উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বহু প্রাচীন যুগ হইতেই আমাদের শিক্ষা দিতেছেন। দেবর্ষি নারদাদি ভক্তিসূত্রের আচার্য্যগণও জীবকে ঈশ্বরের দিকে কামক্রোধাদি রিপু সকলের মোড় ফিরাইয়া দিতে বলিয়া এবং সখ্য বাৎসল্য মধুর রসাদি আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার উপদেশ করিয়া উপনিষদ্‌কার ঋষিদিগেরই যে পদানুসরণ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব ঠাকুরের ঐ বিষয়ক মত যে শাস্ত্রানুগত, তাহা

বেশ বুঝা যাইতেছে। ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র সকলের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিধানের অবিরোধী কোন নূতন পথের সংবাদই যে ধর্ম্মজগতে আনিয়া দেন, একথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে কোন অবতার পুরুষের জীবনালোচনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও যে ঐ বিষয়ের অক্ষুণ্ণ পরিচয় আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পাইয়াছি, একথাই আমরা পাঠককে লীলাপ্রসঙ্গে বুঝাইতে প্রয়াসী। যদি না পারি, তবে পাঠক যেন বুঝেন, উহা আমাদের একদেশী বুদ্ধির দোষেই হইতেছে, যে ঠাকুর 'যত মত তত পথ'-রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য আধ্যাত্মিক জগতে প্রথম প্রকাশ করিয়া জন-সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রুটি বা দোষে নহে। পাশ্চাত্য নীতি—যাহার প্রয়োগ সুচতুর দুনিয়াদার পাশ্চাত্য কেবল অপর ব্যক্তি ও জাতির কার্য্যাকার্য্য বিচারণের সময়েই বিশেষ ভাবে করিয়া থাকেন, নিজের কার্য্য-কলাপ বিচার করিতে যাইয়া প্রায়ই পাল্টাইয়া দেন,—সেই পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ করিয়া আমরা যাহাকে 'জঘন্য কর্ত্তাভজাদি মত' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি, সেই কর্ত্তাভজাদি মত হইতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তমত পর্য্যন্ত সকল মতই এ দেবমানব ঠাকুরের নিকট সসম্মানে ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়া স্থানপ্রাপ্ত হইত এবং অধিকারি-বিশেষে অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্টও হইত! আমাদের অনেকে দ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ঠাকুরকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছি—'মহাশয় অত বড় উচ্চদরের সাধিকা ব্রাহ্মণী পঞ্চমকার লইয়া সাধন করিতেন—এটা কিরূপ?' অথবা 'অত বড় উচ্চদরের ভক্ত সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ পরকীয়া গ্রহণে বিরত হন নাই—এ ত বড় খারাপ?'

ঠাকুরও বারম্বার আমাদের বলিয়াছেন—'ওতে ওদের দোষ নেই রে!' ওরা ষোল আনা মন দিয়ে বিশ্বাস করতো, ঐটেই ঈশ্বর-লাভের পথ। ঈশ্বর-লাভ হবে বলে, যে যেটা সরল ভাবে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে, অনুষ্ঠান করে,সেটাকে খারাপ বলতে নাই, নিন্দা করতে নাই। কারও ভাব নষ্ট করতে নাই। কেন না—যে কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধরে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডেকে যা। আর, কারো ভাবের নিন্দা করিস্ নি, বা অপরের ভাবটা নিজের বলে ধরতে, নিতে যাস্ নি।' এই বলিয়াই সদানন্দময় ঠাকুর অনেক সময় গাহিতেন—

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সে পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন কত মণি পড়ে আছে, সে চিন্তামণির নাচ্‌দুয়ারে॥
তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হয়োনা রে,
তুমি আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
তুমি বাজিকরে চিন্‌লেনাকো, যে এই ঘটের ভিতর বিরাজ করে॥

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

বিলাত থেকে এসে স্বামীজি আজ কয় দিন যাবৎ বাগ্‌বাজার ৺ বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংস দেবের গৃহী ভক্তদিগকে স্বামীজি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান করায়, ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়ীতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজির উদ্দেশ্য একটী সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজি বাঙ্গালায় এইরূপ বলিতে লাগিলেন ঃ—

"নানাদেশ ঘু'রে আমার এইটি ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়িরি করা, বা সাধারণের সম্মতি বা ভোট্ নিয়ে প্রথমেই কাজ করাটা তত সুবিধাজনক ব'লে মনে হয় না। ও সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত Jealous (দ্বেষপরায়ণ) নহে। তারা গুণের সম্মান করিতে শিখিয়াছে। এই দেখুন না কেন, আমি এক জন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত যত্ন আদর করেছে। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে—যখন, মত ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত কত্তে শিখ্‌বে, তখন সাধারণতন্ত্র মতে সঙ্ঘের কার্য্য চল্‌তে পা্‌রবে। সেই জন্য এই সঙ্ঘের একজন Religious

Dictator (প্রধান পরিচালক) হওয়া চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চল্‌তে হবে। তার পর কালে সকলের মত লইয়া কার্য্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হইয়াছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ করিয়া সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রহিয়াছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হইয়াছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারি নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হো'ন।"

গিরিশ বাবু প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভাবী কার্য্য প্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। তখন ৮।১০টী নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। তাহার স্থুল মর্ম্ম এইঃ—"এই সমিতি "রামকৃষ্ণ মিসন্" নামে অভিহিত হইবে। এই সঙ্ঘের কার্য্য হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবনের উচ্চাদর্শ ও ভাব সকল প্রচার করা। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ বেদান্তমত সর্ব্বদেশে প্রচারিত করা। গরীব দুঃখীদিগকে সর্ব্বথা সাহায্য করা। অন্নদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান করিতে বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করা। এই সঙ্ঘ সমিতি হতে Absoluteiy Religious Institution (কেবল মাত্র ধর্ম্মবিষয়িণী ভাবসমূহই) প্রচারিত হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতির সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকিবে না। Philanthropy (ইতর সাধারণের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অভাবের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি বিধানের চেষ্টা) ঐ প্রচারের প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইবে। সমিতি দ্বারা Mass (ইতর সাধারণ) ও মেয়েদের ভেতর বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা হবে। যখন রামকৃষ্ণ-সমিতি প্রথমে গঠিত হয়, তখন এই নিয়মগুলিই বিধিবদ্ধ হয়।

সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই নিয়মগুলি গৃহীত হইবার পর স্বামীজি, যোগানন্দ স্বামী মহারাজকে এই রামকৃষ্ণ-সমিতির President (সম্পাদক) নিযুক্ত করিলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার অণ্ডার সেক্রেটারী, এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠক আচার্য্যরূপে নিযুক্ত হইল; এবং এই নিয়মটীও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর ৺ বলরাম বাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। এই সভার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিসন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺ বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য,

যে, স্বামীজি যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন তিনি প্রায় প্রতি অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ দিতেন; কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন "এইরূপে কার্য্য ত আরম্ভ করা গেল; এখন দ্যাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।" শিষ্য তখন স্বামীজির নিকটেই উপস্থিত ছিল।

যোগানন্দ—তোমার এ সব বিদেশী ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এইরূপ ছিল?

স্বামীজি—তুই কি ক'রে জান্‌লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখ্‌তে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা পাঠ প্রবর্ত্তনা কত্তে কখনো উপদেশ দেন নাই। তিনি যে সকল সাধন ভজন ধ্যান ধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটা নূতন সম্প্রদায় গঠিত ক'রে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী একথার প্রতিবাদ না করায় স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন:—"প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ সব কার্য্য করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাক্‌তুম্, যখন কৌপীন আঁটিবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পৃথিবী ভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্ব-বিষয়ে সহায়তা পেয়েছি! আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে সিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তা অক্লেশে হজম্ করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বত্র বিজয়। এবার এদেশে কিছু কার্য্য করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখ্‌বি, তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

যোগানন্দ—তুমি যা ইচ্ছে কর্‌বে, তাই হবে। আমরা ত চিরদিন

তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভেতর প্রবেশ করেছেন, তা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবু জান—মধ্যে মধ্যে মনে কেমন খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্য্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না? তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছি না ত?—তাই তোমায় বলি।

স্বামীজি—কি জানিস্? তুই যতটুকু ঠাকুরকে বুঝেছিস্, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এক্ষুণি তৈয়িরি হতে পারে। তবে তিনি তা না করে, ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এইরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি কর্‌বো, বল?

এই বলিয়া স্বামীজি অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন "আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুন্‌লি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈয়িরি হতে পারে। কি গুরুভক্তি!!! আমাদের এর শতাংশের একাংশ ভক্তি হতো তো ধন্য হতুম্"।

শিষ্য—মহাশয়, স্বামীজির সম্বন্ধে ঠাকুর কি বল্‌তেন?

যোগানন্দ—তিনি বল্‌তেন, এমন আধার জগতে কখনো আসেনি, আস্‌বে না। কখনো বল্‌তেন, নরেন পুরুষ—তিনি প্রকৃতি—নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর। কখনো বল্‌তেন, অখণ্ডের থাক। কখনো বল্‌তেন, সপ্তঋষির প্রধান ঋষি। কখনো বল্‌তেন, শুকদেবের মত, মায়া স্পর্শ কর্‌তে পারেনি!

শিষ্য—এগুলি কি সত্যি? না—ভাবমুখে এক সময় একরূপ বল্‌তেন?

যোগানন্দ—ওরে তাঁর কথা সব সত্যি। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুতো না।

শিষ্য—তা হলে সময় সময় ভিন্নরূপ বল্‌তেন কেন?

যোগানন্দ—তুই বুঝতে পারিস্‌নি। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করেই ঠাকুর মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। ওগুলি সব সত্যি। বুঝ্‌লি?

শিষ্য শুনিয়া নির্ব্বাক্ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে স্বামীজি ফিরে এসে বল্‌লেন "কিরে? তোদের কি কথা হচ্ছিল?" যোগানন্দ বল্‌লেন "এই সব আমাদের নানা কথা হচ্ছিল।"

স্বামীজি—(শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ; তোদের ওদেশে ঠাকুরের নাম টাম্ লোকে জানে কি ?

শিষ্য—মশায়, এক নাগ মহাশয়ই ওদেশ থেকে ঠাকুরের কাছে এসে-ছিলেন ; তাঁর কাছে শুনে এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয়ে জান্‌তে Curiousity (কৌতূহল) হয়েছে! কিন্তু ঠাকুর যে 'অবতার' একথা ওদেশের লোকে এখনো বুঝতে পারে নাই।

স্বামীজি—ওরে, ও কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়ে চেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে শুন্‌লুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস কর্‌লুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা।

শিষ্য—মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে কখনো বলেছিলেন কি ?

স্বামীজি—কতবার বলেছেন। আমাদের সব্বাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায়—তখন আমি তাঁর বিছা-নার পাশে এক দিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বল্‌তে পার, "আমি ভগবান্", তবে বিশ্বাস কর্‌বো, তুমি সত্যি সত্যি 'ভগবান্'। তখন শরীর যাবার দুই দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "ওরে নরেন! তোর এখনো বিশ্বাস হলোনা? যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" আমি ত শুনে অবাক্ হয়ে রইলুম! প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হলোনা—সন্দেহ নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—ত অপরের কথা আর কি বল্‌বো ?

শিষ্য—মহাশয়, দেহবান্ জীবে ঈশ্বরত্ব নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এ সব ব'লে ভাবা চলে।

স্বামীজি—তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না, মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্ ; তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই! সংসারের ঘোর অন্ধ-কারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিস্তম্ভস্বরূপ! এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে!

শিষ্য—আমার মনে হয়, কিছু না দেখ্‌লে শুন্‌লে তেমন পাকা বিশ্বাস

হয় না। শুনেছি, মথুর বাবু কত কি দেখেছিলেন। তাই ঠাকুরে তাঁর অত বিশ্বাস হয়েছিল।

স্বামীজি—যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না, মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্নবৎ। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হলো। দুর্য্যোধন ভেল্কী বাজী ভাব্‌লে। তিনি না বুঝালে কিছু বল্‌বার বা বুঝবার যো নাই। কারো না দেখে, না শুনে ষোল আনা বিশ্বাস হয়; কেউ বারো বৎসর সাম্‌নে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্চে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাক্‌তে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য—কৃপার কি কোন condition (নিয়ম) আছে?

স্বামীজি—হাঁ ও বটে , নাও বটে।

শিষ্য—কিরূপ?

স্বামীজি—যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের প্রবল অনুরাগ, যারা সদসৎ বিচারবান্, ধ্যান ধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান্ প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে কি না—কোন নিয়ম নীতির তিনি বশীভূত নন। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, তাঁর ছেলের স্বভাব। কেউ কোটি জন্ম ডেকে ডেকেও সাড়া পায় না! আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, চাই কি মুহূর্ত্তে তার চিৎ-প্রকাশ হয়ে গেল। তাকে ভগবান্ অযাচিত কৃপা করে বস্‌লেন। যদি বলিস্—এতে তার আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, তা বল্‌তে পারিস্; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনো বল্‌তেন, তাঁর প্রতি নির্ভর কর—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা; আবার কখন বল্‌তেন, তাঁর কৃপা-বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা।

শিষ্য—মহাশয়, এ তো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তির এখানে থাই নাই।

স্বামীজি—ওরে যুক্তি তর্ক ত মায়াধিকৃত জগতে। দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)এর বাইরেও বটে। প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন, আবার সে সকলের বাহিরেও রয়েছেন। যাকে তিনি কৃপা করেন, সেই তন্মুহূর্ত্তে নিয়মের গণ্ডির বাহিরে (Beyond law) চলে যায়। সেই

জন্য কৃপার কোন condition (নিশ্চয় নিয়ম) নাই। তাঁর খেয়াল কি না। এই জগৎসৃষ্টিটা সবই তাঁর খেয়াল "লোক বত্তু লীলাকৈবল্যং"। যে খেয়াল করে এমন জগৎ গড়্‌তে ভাঙ্‌তে পারে, সে কি আর কৃপা করে মুক্তি দিতে পারে না? তবে কারোকে সাধন ভজন করিয়ে নেন, কারোকে করান না। সে তাঁর খেয়াল। তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য—মহাশয়, বুঝতে পাচ্ছিনে।

স্বামীজি—বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস্, তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। এই জগৎভেল্কী আপনি আপনি ভেঙ্গে যাবে। তবে লেগে থাক্‌তে হবে। এই কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। সদসৎ বিচার সর্ব্বদা কত্তে হবে। আমি দেহ নই—এই বিদেহ ভাবে অবস্থান কত্তে হবে। আমি সর্ব্বগ আত্মা—এইটী অনুভব কত্তে হবে। এই লেগে থাকার নামই পুরুষকার। তাতে নির্ভরতাই পঞ্চম পুরুষার্থ।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন "তাঁর কৃপা নইলে এখানে আস্‌বি কেন? আমি জানি, যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আস্‌বেই। যেখানে সেখানে থাক্, যা করুক্, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে। যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক্ বুঝেছেন, সেই নাগ মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি যে সে লোকের হয় রে? "অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং"। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাক্‌লে অমন মহাপুরুষের দর্শন লাভ হয়।

শিষ্য—মশায়, ঢাকা থাক্‌তেই তাঁর দর্শন পেয়েছি। তিনি এ দাসকে প্রথম দর্শনের দিন থেকেই ভালবেসেছেন।

স্বামীজি—শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ মহাশয়ের সেগুলি ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে "তৃণাদপি সুনীচেন" তা একমাত্র নাগ মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙ্গাল দেশ ধন্য—নাগ মহাশয়ের পদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।

(পাঠকগণ এখানে স্মরণ রাখিবেন, নাগ মহাশয় তখনো জীবিত।)

বলিতে বলিতে স্বামীজি গিরিশবাবুর বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন "দেখ, জি, সি, মনে আজ কাল কেবল

উঠছে 'এ করি' 'সে করি'। তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দেই ; আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সাম্‌লে চল্‌তে হয়। কখনো ভাবি—সম্প্রদায় হয় হোক্। আবার ভাবি—তিনি কারো ভাব কদাচ নষ্ট করেন নাই ; সমদর্শীতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল ?

গিরিশবাবু—আমি আর কি বোল্‌বো ? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে কত্তে হবে। আমি অতশত বুঝিনা। আমি দেখ্‌ছি, প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কার্য্য করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখ্‌ছি।

স্বামীজি—আমি দেখ্‌ছি, আমরা নিজের খেয়ালে কার্য্য করে যাচ্ছি। তবে বিপদে আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে, তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, Guide করেন—ঐটী দেখ্‌তে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উ্‌ঠতে পারলুম না হে।

গিরিশবাবু—তিনি বলেছিলেন "সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে কর্‌বে, কারেই বা করাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর এমেরিকার প্রসঙ্গ হতে লাগ্‌লো। গিরিশ বাবু ইচ্ছা করেই যেন স্বামীজির মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। কারণ, গিরিশ বাবু জানিতেন, ঠাকুরের বেশী কথা কহিতে কহিতে স্বামীজির সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে, যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়—তিনি যে কে এ কথা জানতে পারেন—তবে আর এক মুহূর্ত্তও স্বামীজির দেহ থাক্‌বে না। স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণও একথা জান্‌তেন। তাই দেখিয়াছি, স্বামীজি চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা সকলেই স্বামীজিকে প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করাইতেন। উপস্থিত এমেরিকার প্রসঙ্গ হতে হতে স্বামীজি তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের কত সুখ্যাতি—কত ভোগবিলাস বর্ণন করিতে লাগিলেন। খানিক পরে উঠিয়া স্বামীজি শিষ্য সমভিব্যাহারে ৺বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(২)

ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থপরিচয় ও পদার্থবিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে; এই বার একে একে সেই সকল পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা এস্থলে যে কার্য্য স্বভাববশেই করিয়া থাকি, গ্রন্থকারও তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কোন জিনিষের পরিচয় দিতে হইলে যেমন তাহার লক্ষণ বলিয়া থাকি, গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন। বস্তুতঃই লক্ষণ না বলিতে পারিলে পরিচয় দেওয়া হয় না। তাহার পর আবার উক্ত লক্ষণ যদি পরীক্ষিত লক্ষণ না হয়, তাহা হইলেও সে পরিচয় নির্ভুল হইতে পারে না। এজন্য গ্রন্থকার উক্ত পদার্থসমূহের যখনই লক্ষণ নির্ণয় করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরীক্ষা করিতে থাকিবেন। বস্তুতঃই গ্রন্থকার এস্থলে মানবপ্রকৃতি স্বভাব অনুকরণ করিয়াই যেন গ্রন্থখানি রচনা করিতে বসিয়াছেন। ইহা সত্য সত্যই তাঁহার খুব বিচক্ষণতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর এই লক্ষণ ও পরীক্ষা যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও প্রণালীবদ্ধ। তিনি যেমন পদার্থকে প্রমাণ ও প্রমেয় প্রথমে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তেমনি প্রথমে তিনি প্রমাণেরই লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার এই অংশের যথাযথ অনুবাদ প্রদান করিলাম।—

"এইরূপে উপদিষ্ট পদার্থসমূহের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রমাকরণই প্রমাণ। "প্রমাণ" এস্থলে লক্ষ্য এবং প্রমাকরণ এস্থলে তাহার লক্ষণ। যথাবস্থিত ব্যবহারানুগুণ জ্ঞানই প্রমা। এস্থলে প্রমা লক্ষ্য এবং "যথাবস্থিত ব্যবহারানুগুণ জ্ঞান" এই অংশটুকু তাহার লক্ষণ। জ্ঞানকেই প্রমা বলিলে শুক্তিকাতে এই রজত এই জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইত, এই জন্য "ব্যবহারানুগুণ জ্ঞান" এই বিশেষণটুকু দিতে হইতেছে। ঐরূপ উক্ত দৃষ্টান্তেই আবার অতিব্যাপ্তি হইত, কারণ, ভ্রমকালে এই রজত এই প্রকার ব্যবহারযোগ্যতা দেখা যায়। এজন্য উক্ত লক্ষণে "যথাবস্থিত" এই পদটী ব্যবহার করিতে হইল। যথাবস্থিত পদ দ্বারা সংশয়, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানকে

পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর গ্রহণকালে পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক "বিশেষ" স্মরণ হইলে তাহা সংশয়জ্ঞান-পদবাচ্য হয়; যেমন উচু জিনিষ দেখিয়া তাহাকে পুরুষ বা স্থাণু মনে করা। অন্যথাজ্ঞান মানে ধর্ম্ম বিপর্য্যাস। যেমন কর্ত্তৃরূপে ভাসমান আত্মাতে কুযুক্তি দ্বারা সেই কর্ত্তৃত্বকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করা। বিপরীত জ্ঞান মানে ধর্ম্মীর বিপর্য্যাস। যেমন একটা বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভাবা।

লক্ষণের তিনটী দোষ আছে। যথা;—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। লক্ষ্যের একদেশে যদি লক্ষণ বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে অব্যাপ্তি বলা হয়। গরুর লক্ষণ যদি কপিলবর্ণবত্তা করা হয়, তাহা হইলে সাদা গরুতে অব্যাপ্তি হইবে। লক্ষণ যদি লক্ষ্য ছাড়াইয়া অন্যত্র বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি বলা হয়। আর লক্ষ্যে কোথাও লক্ষণ না থাকিলে অসম্ভব হয়। যথা জীব চক্ষুর বিষয় বলিলে তাহা যেমন অসম্ভব কথা হয়।

এস্থলে উক্ত দোষ তিনটীর অভাব বশতঃ প্রমা লক্ষণ নির্দ্দোষ হইল।

যাহা সাধকতম, তাহাই করণ। যাহা অতিশয়িত সাধক, তাহাই সাধকতম। যাহা থাকিলে অবিলম্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে অতিশয়িত বলা হয়। অতএব প্রমাকরণই প্রমা ইহা সিদ্ধ হইল। অনধিগত অর্থবোধকই প্রমাণ। এই সকল কথা অন্যান্য বাদিগণ কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে, এজন্য তাহা আদরণীয় নহে।"

উপরের অংশ হইতে আমরা এই কয়টী কথা শিখিতে পারি যথা:—

১। কোন কিছুর লক্ষণ করিতে হইলে তাহা ত্রিবিধ-দোষশূন্য হওয়া চাই। এই দোষ তিনটী যথা—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। লক্ষণের দ্বারা যদি লক্ষ্য সবটা না বুঝায়, তাহা হইলে তাহা অব্যাপ্তি নামক দোষ। লক্ষণের দ্বারা যদি লক্ষ্য ছাড়া অন্য কিছুও বুঝাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অতিব্যাপ্তি নামক দোষ এবং লক্ষণের দ্বারা যদি লক্ষ্য একটুও না বুঝায়, তাহা হইলে উহা অসম্ভব নামক দোষ হয়।

২। প্রমার যাহা করণ তাহাই প্রমাণ। সাধকসমূহের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম সাধক, তাহাই করণ। অর্থাৎ যেটী থাকিলে কোন বিষয়ের অবিলম্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম জ্ঞানসাধক। সুতরাং যে সমস্ত (লক্ষণ) থাকিলে প্রমা সম্বন্ধে অবিলম্বে জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ।

৩। প্রমা বলিতে যে জ্ঞান যথাবস্থিত ব্যবহারানুকূল হইবে তাহাই

বুঝিতে হইবে। ঝিনুকে রূপা জ্ঞান প্রমা নহে, কিন্তু ঝিনুকে ঝিনুক জ্ঞানটী প্রমা। কারণ ঝিনুকে রূপা জ্ঞান ব্যবহারানুকূল জ্ঞান নহে। তুমি যদি ঝিনুককে রূপা বলিয়া বিক্রয় করিতে যাও, তবে লোকে তোমায় পাগল বলিবে। উহাকে রূপা বলিয়া ব্যবহার করা চলে না। তাহার পর তাহা যথাবস্থিতও নহে। কারণ ভ্রমকালে যদিচ ঝিনুককে রূপা বলিয়া তুমি তাহাকে কুড়াইয়া লইলে অর্থাৎ রৌপ্য পাইলে লোকে যেমন ব্যবহার করে তদ্রূপ ব্যবহার করিলে এবং তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহারানুকূলতা সিদ্ধ হইল, কিন্তু তথাপি তাহা যথার্থ বা যথাবস্থিত জ্ঞান বলা চলে না। কারণ, ঝিনুকটী ঝিনুকরূপেই অবস্থিত আছে, তুমি তাহাকে রূপা বলায় সেত রূপা হয় নাই। সুতরাং ঝিনুকে রূপা জ্ঞান প্রমা নহে। যাহা প্রমা জ্ঞান, তাহা ব্যবহারানুকূল ও যথাবস্থিত হওয়া চাই।

৪। যথাবস্থিত জ্ঞানে সংশয়, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান এই তিনটী বাদ পড়া চাই। নচেৎ তাহা যথাবস্থিত জ্ঞান হয় না। সংশয় বলিতে একটা বস্তু দেখিয়া অন্য তুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কথা মনে পড়া। দেখিলে একটা উচু জিনিষ—কিন্তু মনে করিতেছ, এটা মানুষ কি মুড়া গাছ। মানুষের ধর্ম্ম ও মুড়া গাছের ধর্ম্ম কিন্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ। এ তুইটা কখনই সেই উচু জিনিষে একত্রে থাকিতে পারে না। অন্যথা জ্ঞান—যেমন শঙ্খকে হলুদে রংএর বলিয়া মনে করা, অবশ্য তাহাতে শঙ্খই উল্টাইয়া যায় না, ধর্ম্মটা উল্টাইয়া গেল মাত্র। বিপরীত জ্ঞানে—যেমন শুক্তিকাকে রূপা মনে করায় ধর্ম্মী বা বস্তুটাই উল্টাইয়া যায়।

উপরে আমরা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় কয়টা বোধ হয় ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু এস্থলে গ্রন্থকার যেন একটু উল্টাপাল্টা করিয়াছেন। কারণ, প্রমাণের লক্ষণ করিতে বসিয়া, লক্ষণ ও করণ কাহাকে বলে, তাহা তিনি শেষে বলিলেন। উচিত ছিল, লক্ষণ ও করণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা বলিয়া পরে প্রমাণের লক্ষণ করা। যাহা লইয়া আমি কোন কার্য্য করিব, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি অগ্রে না জানি তাহা হইলে আমার সে কার্য্য কি সুসম্পন্ন হইতে পারে? কখনই নহে। ছুরি দিয়া কলম কাটিতে যাইতেছি, যদি ছুরিতে ধার আছে কি না অগ্রে না দেখিয়া লই, তাহা হইলে কলম কাটা কি ভাল হয়? ফলে যাহা হউক তিনি তাঁহার যাহা বলিবার, তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন।

এস্থলে পাঠক একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন যে, প্রমার যে লক্ষণ করা হইল, তাহাতে একটু 'বেশ বিশেষত্ব আছে। ন্যায়ের মতে উহার লক্ষণ এই ঃ—যাহা যথার্থ জ্ঞান, তাহাই প্রমা। ব্যবহারানুকূল পদটী তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এস্থলে এই পদটী কেন প্রয়োগ করা হইল, তাহা বুঝিতে পারিলে এ সম্প্রদায়ের যেটুকু বিশেষত্ব, তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রন্থের টীকাকার এক জন ইদানিন্তনীয় বিচক্ষণ ব্যক্তি; তিনিও এস্থলে কোন কথা কহেন নাই। সুতরাং এস্থলে একটু আভাস দিলে বোধ হয় ভালই হইবে।

সকলেই জানেন, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর হইতে সর্ব্ব দর্শনের মধ্যে বেদান্তেরই শ্রেষ্ঠতা লোকমধ্যে প্রচারিত হয়। ইতিহাস দেখিলে বেশ বুঝা যায়,যেন সকল দর্শনই এক এক বার নিজের নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কখন যেন ন্যায় বৈশেষিকের প্রাধান্য, কখন সাংখ্য পাতঞ্জলের এবং কখন যেন পূর্ব্বমীমাংসার প্রাধান্য হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের পর আর যেন কেহ তাহা অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হন নাই। এই জন্য রামানুজাচার্য্য নিজমত স্থাপন করিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রধান প্রতিপক্ষ এই শঙ্করমতেই দেখিতে পান; কারণ, তাঁহার মত কতকটা যেন সাংখ্য-ঘেসা অদ্বৈতবাদ। ইহার যত কিছু সাবধানতা যত চেষ্টা, তাহার অধিকাংশই অদ্বৈতবাদীদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। উপরে যে প্রমা-লক্ষণে ব্যবহারানুকূল পদটী প্রযুক্ত দেখা যাইতেছে, তাহা আমার মনে হয়, উক্ত অদ্বৈতবাদীদিগের জন্য। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে প্রমাজ্ঞানমাত্রেই যে তাহা লোকতঃ ব্যবহারের যোগ্য হওয়া চাই, তাহা নহে। তাহা ব্যবহারযোগ্য হউক আর না হউক, যথার্থ জ্ঞান হইলেই হইল, তাহা ভ্রম না হইলেই হইল। বস্তুতঃ ইহাদের ব্রহ্মজ্ঞানও প্রমাজ্ঞান, এবং তাহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। ইহাদের মতে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, সুতরাং সে ব্রহ্ম লইয়াত ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। কোন জিনিষকে লইয়া ব্যবহার করিতে হইলে,সে জিনিষের সহিত ব্যবহারকর্ত্তার পার্থক্য থাকা চাই। যাহার ব্যবহার করিব, তাহা যদি 'আমি' হইয়া যাই, তাহা হইলে কে তাহার ব্যবহার করিবে? সুতরাং অদ্বৈতমতে প্রমাজ্ঞানে ওভাবটীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু রামানুজমতে তাহা আছে। তাঁহাদের মতে, জীব ঈশ্বর পৃথক্, বস্তু অংশে এক হইলেও পার্থক্য

আছে। তাঁহারা চরমে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ ধামে যাইয়া ভগবানের সেবা করিতে চাহেন। তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন ভগবত্তত্ত্বে সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে চাহেন না। সুতরাং তাঁহদের মধ্যে ভগবৎজ্ঞানের ব্যবহার আছে; এবং এই ভগবৎ জ্ঞানকে প্রমা বলিলে আর কোন দোষও থাকিবে না। এই জন্য গ্রন্থকার প্রথম হইতেই সাবধান হইলেন। যে 'সত্যজ্ঞান' দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি, সেই স্থলেই সাবধানতা গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈতবাদী যদি তাঁহার অভিন্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানকে প্রমা বলিতে চাহেন, ইহারা অমনি বলিবেন—'আমরা উহাকে প্রমা বলি না—উহা ভ্রমজ্ঞান।' সাবহিত গ্রন্থকার এতটা ভাবিয়া পথ চলিতেছেন—বাস্তবিক ইহা দেখিতেও আনন্দ হয়। পাঠক দেখুন, ইহা ইঁহার কত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। উক্ত বিশেষণের দ্বারা ন্যায়াদি কোন দর্শনের সহিত বিরোধ হইল না, কিন্তু কৌশলে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। জাগতিক জ্ঞান শঙ্করমতে সবই ব্যবহারিক জ্ঞান, সুতরাং সে স্থলেও এ লক্ষণে কোন গোলযোগ ঘটিল না।

পরিশেষে গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদসম্মত প্রমা-লক্ষণের উপর একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে প্রমার লক্ষণ একটু অন্যরূপ। সেটুকু ইঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রমা বলিতে অনধিগত ও অবাধিত জ্ঞান বুঝায়। অদ্বৈতমতের প্রথম পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে একথা বেদান্তপরিভাষা নামক গ্রন্থে বিশদ ভাবে বিচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, যাহা জানা নাই, ও যাহা কখন অন্যথা প্রমাণিত হইবে না, তাহাই প্রমা। অনধিগত শব্দে যাহা ইতিপূর্ব্বে জানা হয় নাই, এবং অবাধিত মানে যাহা কখন অন্যথা প্রমাণিত হয় না। গ্রন্থকার এস্থলে অনধিগত শব্দটীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, এই লক্ষণটী নৈয়ায়িকগণ খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার খণ্ডন করিবার আর প্রয়োজন নাই। টীকাকার এস্থলে এবিষয় একটু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু কোন্ গ্রন্থে কোন্ ব্যক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ ইনি ইদানীন্তনীয় ব্যক্তি হইলেও সেই প্রাচীন রীতিতেই টীকা রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এ খণ্ডনটী প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদীদিগের খণ্ডন নহে, কারণ, বেদান্তপরিভাষায় দেখা যায়, গ্রন্থকার ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, তর্কের খাতিরে যে সব কথা তুলিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই খণ্ডনের কথা উক্ত হইয়াছে, আসল সিদ্ধান্ত বাক্যের সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই।

আচার্য্য শঙ্কর ও উগ্রভৈরব।

[শ্রীমতী—]

আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন সঙ্গে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাদেশে বেদান্তমত প্রচার করিয়া দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম তীর্থ 'শ্রীশৈল' নামক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এ সময় শৈব ও শক্তি প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায় বড়ই প্রবল। বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিকমতাবলম্বিগণ বেদের নামে জগতে জঘন্য মতের পতাকা তুলিয়া এখানে বাস করিত। ইহাদিগকে সৎপথে আনিতে আচার্য্য আজ সাশিষ্যে এখানে উপস্থিত। মাহিষ্মতী হইতে এই পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে আচার্য্যদেবের সঙ্গে অগণ্য শিষ্যসেবক সমবেত হইয়াছে। ইহাদের হৃদয় আজ কি এক নব জ্যোতিঃতে আলোকিত। ইহাদের অন্তর আজ কি যেন এক অপার আনন্দ ও উৎসাহে উৎসাহিত। কত লোক উন্মত্তের ন্যায় আচার্য্য-চরণকমলে মধুপের ন্যায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোকই—যাহারা একবার আচার্য্যকে দেখিতেছে, তাহারাই আচার্য্যসঙ্গলাভে লালায়িত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আচার্য্য-সঙ্গে চলিয়াছে। অনেকেই আবার বিষয়াসক্তির বিষে জর্জ্জরিত প্রাণতায় গৃহে ফিরিতেছে। এইরূপে শত শত ব্যক্তি সকলেই আজ অদ্বৈত পতাকাতলে স্থান গ্রহণ করিতে সমুৎসুক। শয্যাশায়ী রোগী, অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী আজ আচার্য্য দর্শনের জন্য গৃহত্যাগী। শ্রীশৈলে আজ মহা ধূমধাম। আচার্য্য দেখিলেন, শ্রীশৈল পর্ব্বত বড় মনোরম। সম্মুখে একটী নদী কল কল নাদে প্রবাহিতা। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বন্যফলপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজ। বন্যপুষ্পগন্ধে স্থানটী আমোদিত। তিনি শিষ্যগণের আগ্রহে এই স্থানে কিছু দিন বাস করিলেন। এখানে আচার্য্য সাশিষ্য নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া পর্ব্বতোপরি নিত্য মল্লিকার্জ্জুন শিবলিঙ্গ দর্শন করিতেন। এইস্থানে আচার্য্য একদিন বিল্ব-বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। শিষ্যগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া বেদান্ত চর্চ্চা ও সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে উপদেশাদি দানে ব্যাপৃত। এই সময় এক কাপালিক ছদ্মবেশে আচার্য্য-চরণান্তিকে আসিয়া প্রণাম করিল। আচার্য্য আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস, তোমার কি প্রয়োজন?" ছদ্মবেশী কাপালিক বলিল "ভগবন্, আপনার চরণতলে বাস করিয়া আপনার অমূল্য উপদেশাদি শ্রবণ করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

উদারহৃদয় আচার্য্য শঠের শঠতা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাহাকে তাঁহার সমীপে থাকিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি সেই কাপালিক সকল শিষ্যগণের অগ্রগামী হইয়া আচার্য্যের সেবা ও আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা চেষ্টা করিত এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিত। ক্রমে সে আচার্য্যসমীপে দীক্ষিত হইল। শিষ্যগণের মধ্যে যদি কেহ তাহার প্রতি কখন ঈর্ষা করিত, তখনই সে তাহার সেবা করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিত। এইরূপে সে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তাহার আচার ব্যবহারে অন্য কাহারও কোন সন্দেহ হইল না বটে, কিন্তু পদ্মপাদ একটু সন্দিহান হইলেন ; তিনি এজন্য সর্ব্বদা তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন।

যাহা হউক, কাপালিক দিন দিন আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। সে সর্ব্বদাই আচার্য্যসমীপে উপস্থিত থাকিত, আচার্য্য নিদ্রিত বা সমাধিস্থ হইলে যখন সকলে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিত, ছদ্মবেশী কাপালিক তখন আচার্য্যপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিত। একদিন আচার্য্য নির্জ্জনে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, প্রিয় শিষ্যগণ নিজ কর্ত্তব্য পালনে ব্যাপৃত। নিকটে কেহই নাই। এমন সময় দুষ্ট ভাবিল আমার মনোবাসনা প্রকাশ করিবার এইত উত্তম সুযোগ। এই ভাবিয়া সে অতি বিনীতভাবে পুনঃ পুনঃ গুরুপদে প্রণাম করিতে লাগিল। আচার্য্য বলিলেন "কি বৎস! তোমার কি কিছু বলিবার আছে? থাকে ত বল?" কাপালিক বলিল "ভগবন্, আপনার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। যদি অভয় দেন ত বলি।" আচার্য্য বলিলেন "সে কি? প্রার্থনা জ্ঞাপনে আবার ভয় কি? তুমি নির্ভয়ে বল।" কাপালিক আচার্য্যের অভয় বাণী শুনিয়া বলিল "প্রভু, আমি ছদ্মবেশী কাপালিক, আমার নাম উগ্রভৈরব, আপনার চরণে আমার একটী বিনীত প্রার্থনা আছে। আচার্য্য একটু বিস্মিত হইলেন এবং তৎপরেই বলিলেন "সে কি? তুমি না সেদিন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ?" কাপালিক বলিল "ভগবন্, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা আমারই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। আমি আপনার নিকট গোপনে আমার প্রার্থনা জানাইব বলিয়াই আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি।" আচার্য্য আরও বিস্মিত হইলেন, এবং বলিলেন "তোমার প্রার্থনা আমরা কিরূপে পূর্ণ করিতে পারি? বরং

তুমি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর, নচেৎ আমার শিষ্যগণ জানিতে পারিলে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা।” কাপালিক বলিল “ভগবন্, আপনি যদি অভয় দেন তাহা হইলে আমার কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। আপনি তাহা-দিগকে না বলিলে তাহারা কিরূপে জানিতে পারিবে?” আচার্য্য বলিলেন “আচ্ছা বেশ, আমি তাহাদের বলিব না, কিন্তু আমরা কোন্ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি? যদি তুমি তোমার দুষ্টমত পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমার এস্থলে থাকিবার প্রয়োজন কি?” কাপালিক বলিল “ভগবন্, আপনি দয়াময়, কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনাটী পূর্ণ করুন। আপনি ব্যতীত আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কেহ সক্ষম নহে। আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমায় চরণে ঠেলিবেন না।” কাপালিকের কাতরতা দেখিয়া আচার্য্যের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল,তিনি বলিলেন “আচ্ছা, বল, তোমার কি প্রার্থনা।” কাপালিক তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল “ভগবন্, আমি বহু বৎসর সর্ব্বসিদ্ধির আশায় মহাভৈরবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, পরে ভগবান্ ভৈরব আমায় এই বর প্রদান করিলেন যে, যদি কোন রাজমুণ্ড বা সর্ব্বজ্ঞ-যোগি মুণ্ড হোমে আহুতি দান করিতে পারি, তবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইব। আমি তদবধি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি ও বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সকলই নিষ্ফল। রাজমুণ্ড দুষ্প্রাপ্য, সর্ব্বজ্ঞমুণ্ড অপ্রাপ্য। এক্ষণে আপনার নাম শুনিয়া আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত। আপনার অসীম দয়া, পরহিতার্থই আপনার জন্ম, আপনি সর্ব্বত্যাগী এবং সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসী, আপনি দয়া করিলে এ হতভাগ্যের বহুদিনের বাসনা সফল হয়। পুরাণে দধীচি জীমূতবাহনের কথা শুনিয়াছি, আপনিও তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন। আপনার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্ণজ্ঞানজ্যোতিঃ আপনার হৃদয়ে সম্যক্ সমুদ্ভাসিত। পরোপকারার্থই আপনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করি-তেছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার এই বহুদিনের বাসনাটী পূর্ণ হয়। আমি আপনার শরণাগত, আমার প্রার্থনাটী কৃপা করিয়া পূর্ণ করুন।” কাপা-লিকের কথায় আচার্য্য-হৃদয় বিচলিত হইল; তিনি তখন বলিতে লাগিলেন “বৎস, অনিত্য সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কেন তুমি ব্যাকুল হইতেছ? তুমি যে মন্ত্র লাভ করিয়াছ, তাহা সাধনা করিলে চরমে পরম পদ লাভ করিবে। অত-এব শুন,আমার কথা শুন—কেন বৃথা কর্ম্মে দুর্লভ মানবজীবন ক্ষয় করিবে? কেন ঘোর নৃশংস্ কর্ম্ম করিয়া সামান্য ক্ষমতার জন্য নিজেকে অধঃপাতিত

করিবে? দেখ, তোমার সাধনবল ক্ষয় হইলে তোমার উক্ত নৃশংস কর্ম্মের ফল ফলিতে থাকিবে। তখন তুমি নরকযন্ত্রণায় অস্থির হইবে। সে যন্ত্রণা তুমি এখন কল্পনাতেও আনিতে অক্ষম। দেখ, এক অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের উদ্ধার নাই; কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। সুতরাং তুমি ও দুষ্ট ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ কর এবং অস্মৎপ্রদর্শিত পথে অবস্থান কর।" আচার্য্যের সদুপদেশ কাপালিকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে ভাবিল, তাইত কি করি? কি করিয়া ইঁহাকে সম্মত করি, ইঁহাকে সম্মত না করিতে পারিলে ত এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে ইঁহার যেরূপ উদার হৃদয়, তাহাতে একেবারে আমার হতাশ হওয়া উচিত নহে! কাপালিক আচার্য্যের কথা শুনিয়া স্থির হইয়া মনে মনে এই সব কথা ভাবিতেছে, এমন সময় পদ্মপাদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য ও কাপালিক যেন কথা কহিবার প্রবৃত্তিটা সহসা চাপিয়া ফেলেন, কিন্তু পদ্মপাদ তাঁহাদের মুখ দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন— তিনি বেশ বুঝিলেন যে, ইঁহারা কি কথা কহিতে ছিলেন, হঠাৎ আমায় দেখিয়া নিস্তব্ধ হইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি বেশ করিয়া উভয়ের মুখের দিকে দুই চারিবার চাহিয়া আচার্য্যের নিকট উপবেশন করিলেন ও একটা বিচারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

কয়েকদিন গত হইলে সে আবার একদিন সুযোগ পাইল। সেদিন অমাবস্যা; বৈকালে আচার্য্য নদীতীরে একাকী উপবিষ্ট। সহসা কাপালিক তথায় আসিয়া আচার্য্যের চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। আচার্য্য বলিলেন "কিহে বাপু, ব্যাপার কি বল? চরণ ছাড়িয়া দাও, কি চাও বল?" কাপালিকের রোদন কিছুতেই থামে না, অনেকক্ষণ পরে সে বলিল "ভগবন্, আপনার অমূল্য উপদেশ আমার ধারণা হইতেছে না। সেই সিদ্ধি-বাসনা আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আমি কিছুতেই মনকে ফিরাইতে পারিতেছি না; আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনাটী পূর্ণ করুন। আমি বেশ বুঝিয়াছি, আপনার জীবনে তিলমাত্র মমতা নাই, অধিকন্তু আপনি দয়ার সাগর, আপনি ভিন্ন আমার গতি নাই। গুরো! আমার এ বাসনা এতই প্রবল যে, ইহা যতদিন না সিদ্ধ হইবে,ততদিন আমাকে পুনঃ পুনঃ বোধ হয় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" কাপালিকের কথা শুনিয়া আচার্য্য ভাবিলেন, এ নির্ব্বোধকে বুঝাইয়া ফল নাই; কি হইবে এই

নশ্বর শরীরে? ইহার বাসনা যদি পূর্ণ হয়, হউক। এ দেহ সমাহিত করিলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে পচিয়া গলিয়া যাইবে, জলে ভাসাইয়া দিলে জলচর জন্তুতে খাইবে, তা না হয় এই মূর্খটার কিছু কাজে লাগিবে। এই ভাবিয়া আচার্য্য আর কোন কথা না কহিয়াই একেবারে বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তাহাই হইবে। তুমি গোপনে তোমার সব বন্দোবস্ত কর, আমায় যেরূপ করিতে বলিবে, আমি সেইরূপ করিব।" কাপালিক আনন্দে অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ গুরুচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিল। পরক্ষণেই মনে হইল, তাইত, যদি কেহ দেখিতে পাইয়া থাকে? সুতরাং সে আচার্য্যচরণ ছাড়িয়া ভীত-চকিত-নেত্রে এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। যাহা হউক, কোথায়ও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল এবং পুনরায় আচার্য্যের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিল "ভগবন্, তাহা হইলে অদ্যই মধ্যরাত্রে ঐ অরণ্যমধ্যে আমি সমুদয় আয়োজন করিয়া রাখিব, আপনি ঠিক মধ্যরাত্রে এই পথ ধরিয়া ঐদিকে যাইবেন, আমি পথিমধ্যে আপনাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইব।" আচার্য্য বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তাহাই হইবে।" কাপালিক ভাবিল, তাহা হইলে আমার এখনই প্রস্থান করা উচিত, নচেৎ এত শীঘ্র সকল আয়োজন হওয়া সম্ভব নহে। শিষ্যগণও নিকটে নাই যে, তাহারা সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিবে, আমাকেই ত সব করিতে হইবে। এই ভাবিয়া কাপালিক আচার্য্যের নিকট বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গোপনে অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল—মনে কেবল ভয়, যদি কেহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে। যাহা হউক, কাপালিকের ভাগ্যে কেহই জানিল না। কাপালিক আজ শিবাবতার লোকশঙ্কর শঙ্করের মস্তক বলি দিবার আয়োজন করিতে ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্যও আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ক্রমে দিনাবসান হইলে আচার্য্যের শিষ্যগণ সকলে একত্রিত হইয়া গুরু-চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদন করিয়া গুরুদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ কিন্তু কাপালিককে না দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যপার আছে। আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ক্রমে শিষ্যগণ একে একে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে নিরত হইলেন। কাপালিকের ভীষণ অভিসন্ধির বিষয় সকলেরই অজ্ঞাত রহিল। আচার্য্যও কাহারও সহিত বড় বেশী কথাবার্ত্তা কহিলেন না,

সর্ব্বদাই সমাধিমুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে নৈশ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল। রাত্রি গভীর হইলে শিষ্যগণ সকলেই নিদ্রিত হইলেন। আচার্য্য কিন্তু নিজস্থানে বসিয়াই রহিলেন।

অমানিশার গাঢ় তিমিরে নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্ররাজি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মধ্যরাত্রির শীতল পার্ব্বত্য সমীরণ বন্যকুসুমের সৌরভ-রাশি বহন করিয়া চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে নিশাচর পশুপক্ষীর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে; সমুদয় জগৎ যেন কি এক মহান্ ভাবে পরিপূর্ণ। একদিকে প্রকৃতির মাধুর্য্য, অপরদিকে অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে সমগ্র মেদিনী দেহ আবৃত করিয়া সুষুপ্ত, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা মস্তক উন্নত করিয়া ভীষণ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কচিৎ ২।১ প্রাণীর বিকট শব্দে প্রকৃতির সেই মাধুর্য্য মহা গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইতেছে। এই সময়ে আচার্য্য ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিলেন এবং কাপালিকের নির্দ্দিষ্ট অরণ্যোদ্দেশে পদবিক্ষেপ করিলেন। হায়! কোথায় শঙ্করের প্রিয় শিষ্য সুরেশ্বর, কোথায় বা সেই গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ, আজ তোমরা কোথায়! দেখ, আজ এক চোরে তোমাদের মহারত্ন চুরি করিতেছে।

ক্রমে ক্রমে আচার্য্য অরণ্যমধ্যে আসিলেন। দেখিলেন, কাপালিক পথিমধ্যে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সে তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল; কারণ, এখন আর কোন বিঘ্ন নাই, এইবার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। সে অতি আগ্রহ সহকারে আচার্য্যকে লইয়া গিয়া যথাস্থানে বসিবার আসন প্রদান করিল। আচার্য্য প্রসন্নবদনে তাহাতে উপবেশন করিয়া কাপালিককে বলিলেন "দেখ বৎস, আমি সমাধিস্থ হইতেছি, তুমি সেই সময় যাহা করিবার, করিও।" এই বলিয়া দয়ার সাগর শঙ্কর ক্ষণমধ্যে সমাধিস্থ হইলেন। কাপালিকও পূজার আয়োজনে ব্যস্ত, সে অতি ত্বরা পূর্ব্বক সকল কার্য্য সারিতে লাগিল, কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র বিধান! সে এই ত্বরা করিতে গিয়া পূজায় ভুল করিয়া বসিল। সকাম কর্ম্মে অঙ্গহানি হইলে কর্ম্মকর্ত্তারই সর্ব্বনাশ হয়। এস্থলে ঘটিলও তাহাই। অবশ্য এরূপ ঘটিবে নাই বা কেন? আশাতীত আনন্দ কি কেহ সহজে হজম করিতে পারে? যাহার সুখে দুঃখে সমান জ্ঞান নাই, অভাবনীয় আহ্লাদের উপলক্ষ উপস্থিত হইলে সে অধীর ও বিহ্বল হইয়া পড়ে। আজ কাপালিকেরও সেই অবস্থা,

সুতরাং ভুল হইবে না কেন? মহাতপস্বী মহর্ষি ব্যাসদেব আচার্য্যকে আয়ু দান করিয়াছিলেন, তাহা কি কাপালিকের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য? যে ভগবান্ ব্যাসদেবের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেবকে ঐ ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনিই ত কাপালিকের অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন, সুতরাং তাঁহার নিকট কি অবিচার হইতে পারে? তাই কাপালিক আজ ভুলিয়া মরিল। সে যতই চিত্ত স্থির করিতে যায়, ততই আশানন্দ আসিয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া দিতে লাগিল। ফলে যে কার্য্য যত শীঘ্র হওয়া উচিত, তাহাতে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগিতে লাগিল।

ভগবান্ কি শুধু কাপালিককে ভুলাইয়া নিশ্চিন্ত? তিনি যেন আজ মহা-বিপদ্‌গ্রস্ত,তিনি যেন আজ ভাবিতেছেন,কি করিয়া কাহাকে দিয়া আচার্য্যের জীবন রক্ষা করি। একদিকে সমাধিস্থ নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট শঙ্কর, অপরদিকে ঘোরকর্ম্মা ঘাতক কাপালিক। কি করিয়া তিনি আজ এ কার্য্যে বাধাদান করেন? যে কার্য্য যেমন, তাহার ব্যবস্থাও তদ্রূপ করিতে হইবে; দক্ষযজ্ঞ-নাশে ত শিবের কর্ণে সংবাদ দিতে হইবে! উপযুক্ত ব্যক্তি না হইলে কি উপযুক্ত কর্ম্ম করিতে পারে? সুতরাং তিনি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া পদ্মপাদকে একার্য্যের উপযুক্ত স্থির করিলেন। তিনি আজ নিদ্রিত পদ্মপাদের হৃদয়ের কলকাটীটী নাড়িয়া দিলেন, সূত্রধরের ন্যায় কলের পুতুলের সূতাটুকু একটু টানিয়া দিলেন। পদ্মপাদ অমনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আচার্য্যদেব অদূরে অরণ্যমধ্যে সমাধিস্থ, সম্মুখস্থ ভৈরব সকাশে বলি দিবে বলিয়া সেই নবাগত শিষ্য কাপালিক-বেশে পূজায় নিমগ্ন। প্রাণের আঘাত বড় আঘাত। পদ্মপাদ সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন, নিদ্রার ঘোর আবরণ কোথায় ছিন্নভিন্ন হইল, নিদাঘের তপনতাপে ছিন্নাভ্র-সদৃশ কোথায় বিলীন হইল। তিনি চকিত নয়নে আচার্য্যের আসনের দিকে চাহিয়া দেখেন,—আচার্য্যের আসন শূন্য! পরমুহূর্ত্তেই সেই নবাগত শিষ্যের শয্যার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখেন তাহাও শূন্য! আর কোথায় যায়, স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্য। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিলেন, সুরেশ্বর ও অন্যান্য শিষ্যগণকে ডাকিয়া তুলিলেন, সকলকেই স্বপ্নকথা বলি-লেন। সকলেই দীপহস্তে সেই অমানিশার ঘোর অন্ধকারে ব্যাকুলিত ভাবে চারিদিক্ দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোথায়ও আচার্য্যের কোন চিহ্ন নাই। পদ্মপাদ শিরে করাঘাত করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন, সকল চেষ্টা পরি-

ত্যাগ করিয়া তিনি হতাশা-সাগরে ডুবিয়া গেলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল। কিন্তু এভাব পদ্মপাদের অধিকক্ষণ থাকিল না। তিনি দুঃশাসনের হস্তে দ্রৌপদীর ন্যায় এবার তাঁহার প্রাণের প্রাণ সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেন। আকাশে যত জোরে ঢিল ছোঁড়া যায়, পড়িবার সময় সে তত জোরে পড়িয়া থাকে। আজ পদ্মপাদের হতাশার মাত্রা যেমন, ভগবচ্ছরণের মাত্রাও তত অধিক হইল। তিনি প্রাণমনকে পাগল করিয়া সজোরে অন্তর্য্যামীর চরণযুগল বক্ষোমধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, যেন তাঁহাকে বলিবার সাবকাশ নাই, যেন তাঁহাকে নিবেদনের ভাষা নাই, কাতরতা বা ভাবভঙ্গী যেন তাঁহার ভাবপ্রকাশের অন্তরায়। বাস্তবিক এভাবের জন্য ভাবময়কে বলিতে হয় না, এ ভাবের জন্য ভাষার আবশ্যক নাই, সর্ব্বান্তরস্থলশায়ী এ ভাবটী এমনই বুঝেন, কোন কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। ওদিকে সেই ব্যাসের আরাধ্য, অন্তর্য্যামী, সেই সর্ব্বজগন্নিয়ন্তৃ ভগবান্ সেই কাপালিকের ভ্রমের হেতু বুঝিলেন; এই পাত্রই আমার উপযুক্ত, এই আধারই আমার কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনি তখন পদ্মপাদের পূর্ব্ব আরাধিত নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া পদ্মপাদ-শরীরে আবির্ভূত হইলেন। পদ্মপাদ আর পদ্মপাদ নাই, তিনি অঙ্গ স্ফীত করিয়া সিংহসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নক্ষত্রবেগে অদূরে অরণ্যাভিমুখে ছুটিলেন। সুরেশ্বর প্রভৃতি তখনও আচার্য্যানুসন্ধানে তৎপর, তাঁহারা তখন চারিদিকের তরুতল, শিলান্তরাল, নদীতীর প্রভৃতি নানাদিকে নানাস্থানগুলি আতিপাতি করিয়া খুঁজিতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে সিংহনাদসম শব্দ শুনিয়া সকলেই মূর্চ্ছিত পদ্মপাদের দিকে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একজন দেখিলেন, উন্মত্ত পদ্মপাদ নিকট দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া গেলেন। তিনি কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রমে যে স্থলে শব্দ শুনিয়াছিলেন, তথায় আসিলেন; দেখেন, সুরেশ্বর প্রভৃতি মূর্চ্ছিত পদ্মপাদকে দেখিতে না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তখন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ব্যাপার কি? এই ত এখানে পদ্মপাদের চীৎকারধ্বনি শুনিলাম। সে ত এখানে ছিল, কোথায় গেল, ব্যাপার কি?" তিনি বলিলেন "আমি যখন ঐদিকে আচার্য্যকে খুঁজিতেছিলাম, দেখিলাম, যেন অন্ধকারের ভিতর দিয়া ঐ অরণ্যাভিমুখে পদ্মপাদের মত কে ছুটিয়া গেল।" তাঁহার কথা শুনিয়া

সকলে ভাবিলেন, তবে বোধ হয় পদ্মপাদ এইদিকে গিয়াছে, দেখ, সে না আবার অন্ধকারে পাথরে আঘাত পায়। কি দুর্দৈব! বোধ হয় সে এইদিকে আচার্য্যের সন্ধান পাইয়া ছুটিয়াছে। চল, আমরাও এইদিকেই যাই। এই বলিয়া তাঁহারা এইবার আচার্য্যকে ছাড়িয়া পদ্মপাদকেই খুঁজিতে খুঁজিতে অরণ্যাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইঁহাদের কোলাহলে অপরাপর শিষ্যসেবকগণ জাগরিত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে দীপহস্তে আচার্য্যস্থানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন ও মশাল প্রভৃতি বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নানা জনে নানা চেষ্টা ও নানা মতলব আঁটিতে লাগিলেন।

এদিকে পদ্মপাদ নৃসিংহদেবাবিষ্ট হইয়া সেই ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়া সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাময় আরণ্য পথ ধরিয়া যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত। ওদিকে কাপালিকও পূজান্তে খড়্গ মন্ত্রপূত করিয়া আচার্য্যমস্তক ছেদনোদ্দেশ্যে খড়্গখানি লইয়া আচার্য্যের পশ্চাদ্দিকে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া কোপের সুবিধা দেখিতেছে। এমন সময় হঠাৎ পদ্মপাদকে দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইল। পদ্মপাদ কোন কথা না কহিয়া কোনদিকে না চাহিয়া চকিতের ন্যায় ভৈরবের সম্মুখস্থ প্রোথিত ত্রিশূলটী বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া সিংহনাদ সহকারে কাপালিকবক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিলেন, ভীমহস্তে কীচকের ন্যায় শক্তিশূন্য কাপালিক 'হা ভৈরব' বলিয়া বিকট চীৎকার করতঃ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান, ভগবানের কি অপূর্ব্ব লীলা! কোথায় কাপালিক আজ এক সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর মস্তক আহুতি দিয়া সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে, না, কোথায় বিফলকাম কাপালিক আজ নিহত!

এদিকে পদ্মপাদরূপী নৃসিংহদেবের ঘন ঘন হুহুঙ্কারে সিদ্ধ যোগীর সমাধিভঙ্গ হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখেন, সম্মুখে পদ্মপাদ-শরীরে জ্যোতির্ম্ময় নরহরি-মূর্ত্তি। দেখিবামাত্র আচার্য্যের ভক্তিসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সমাধির স্থিরভাব নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি করযোড়ে নতজানু হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে নৃসিংহদেব অন্তর্দ্ধান হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপাদও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। আচার্য্য তখন ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখেন পশ্চাতে ত্রিশূলবিদ্ধ কাপালিকের মৃতদেহ রক্তস্রোতে ভাসিতেছে। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া একবার পদ্মপাদের মুখের দিকে চাহেন, একবার নিহত কাপালিকের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া দেখেন, একবার বা

সমাগত নিস্পন্দ শিষ্যমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখেন। শিষ্যগণ ইতিমধ্যে কোলাহলস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ ভীত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। এক্ষণে নৃসিংহদেবের অন্তর্ধানে তাহারা প্রকৃতিস্থ হইলেন ; এবং শশব্যস্তে পদ্মপাদের সংজ্ঞা সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন। নিকটেই কলসমধ্যে কাপালিক-আনীত জল ছিল, তাঁহারা তাড়াতাড়ি পদ্মপাদের মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন, কিছু পরে পদ্মপাদ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে গুরুদেবকে অক্ষত শরীরে জীবিত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং উঠিয়াই আচার্য্যচরণে নিপতিত হইলেন।

আচার্য্য সস্নেহে পদ্মপাদকে উঠাইয়া বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ, এ কি, ব্যাপার কি ? এই কাপালিককে কে নিহত করিল ? এ সময় তোমরাই বা এখানে কিরূপে আসিলে ? তোমাতে নৃসিংহাবির্ভাব দেখিলাম, ইহারই বা অর্থ কি ? তুমি কি নৃসিংহ-সিদ্ধি লাভ করিয়াছ ? কই, এত দিন ত আমি এ কথা জানিতাম না। বৎস, তুমি সমুদয় বিবরণ আমাকে বল।"

পদ্মপাদ বলিতে লাগিলেন "গুরুদেব ; আমি নিদ্রিত ছিলাম হঠাৎ এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ভীষণ অরণ্য মধ্যে আপনি সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন এবং আপনার সেই নবাগত শিষ্য ভয়ঙ্কর কাপালিক-মূর্ত্তিতে শাণিত খড়্গ হস্তে আপনার পশ্চাদ্দেশে দাড়াইয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিবামাত্র আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসি এবং আপনার আসনের দিকে চাহিয়া দেখি ও আপনার আসন শূন্য দেখিয়া ভাবি, বুঝি স্বপ্ন সত্যই বা হয়। তাহার পর সেই নবাগত শিষ্যের শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখি—দেখি, তাহাও শূন্য। তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। আমি তখন সকলকে উঠাইয়া চারিদিকে আপনার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায়ও কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া আমি হতাশ হইয়া কাতর প্রাণে নৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি। তাহার পর কি হইল, ভগবন্, আমি আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আপনাকে সুস্থ শরীরে দেখিয়া আমার———। আচার্য্য বলিলেন, "বৎস! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিই নৃসিংহদেবের প্রসাদে এই কার্য্য করিয়াছ।"

তখন সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণ পদ্মপাদের মূর্চ্ছিত অবস্থার সমুদয় বিবরণ আচার্য্যচরণে নিবেদন করিলেন। ইহার পর আচার্য্য পদ্মপাদকে তাঁহার নৃসিংহসিদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, শিষ্যগণও ইহা শুনিবার জন্য ব্যগ্র

পার নাই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর পদ্মপাদ সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।—

"বহুদিন পূর্ব্বে আমি নৃসিংহসিদ্ধির বাসনায় 'বল' নামক পর্ব্বতে নৃসিংহদেবের আরাধনা করি। কিন্তু বহুদিন তপস্যা করিয়াও আমার সিদ্ধিলাভ ঘটিল না; তজ্জন্য আমি যার পর নাই মনোদুঃখে তথায় বাস করিতে থাকি। কিছুদিন অতীত হইলে একদিন সেই পর্ব্বতে এক ব্যাধকে দেখিতে পাই। পরে সে আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিল; এবং আমি একাকী কেন সেই নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছি, জানিতে চাহিল। ব্যাধের পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় আমি তাহাকে আমার দুঃখের কথা সমুদায় বলিলাম। ব্যাধ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিল "ভাই, তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, আমি তোমায় নৃসিংহ দর্শন করাইতে পারি; তুমি যদি আমার সহিত আইস, তাহা হইলে আমি তোমাকে নৃসিংহদেব দর্শন করাইয়া দিব।" তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত চলিলাম। কিছু দূর গমন করিলে পর ব্যাধ আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া নিকটস্থ এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে লতাপাতা-বাঁধা একটী সিংহাকৃতি পশু আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং বলিল "এই দেখ ভাই, তোমার আরাধ্য নৃসিংহদেব; যাও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইল।" নৃসিংহাকৃতি পশু দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু ব্যাধের কথায় আমার সন্দেহ হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার সন্দেহ দেখিয়া সেই অভিনব পশু আমায় নিজমূর্ত্তি দেখাইলেন। পরে ব্যাধের ঐকান্তিক সাধনার কথা বলিয়া ব্যাধের পরিচয় দিলেন। পরিচয় শুনিয়া জানিলাম, ব্যাধ একজন সামান্য মানব ছিলেন না। যাহা হউক, আমার বহুদিনের বাসনা সিদ্ধ হইল দেখিয়া আমার অপার আনন্দ হইল; এবং একপ্রকার আত্মহারা হইয়া আমি নৃসিংহদেবের চরণে নিপতিত হইলাম। নৃসিংহদেব তখন আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি তখন এই বর চাহিলাম যে, যখনই আমি তাঁহাকে স্মরণ করিব, তখনই যেন তাঁহার দর্শন পাই। বলিতে কি, ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শিষ্যগণ বুঝিলেন, নৃসিংহদেবের বরপ্রভাবে পদ্মপাদ আজি গুরুদেবের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সকলেই তখন পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কিন্তু ধীর গম্ভীর বচনে পদ্মপাদকে বলিলেন

"বৎস, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য কেন তুমি নরহত্যার কারণ হইলে? কেন কাপালিকের সিদ্ধির অন্তরায় হইলে?" পদ্মপাদ বলিলেন "ভগবন্, আপনার জীবন কি তুচ্ছ জীবন? মহর্ষি ব্যাসদেব যে জীবনের জন্য আয়ু দান করিয়াছিলেন, তাহা কি এই দুষ্ট কাপালিকের বাসনাসিদ্ধির জন্য? যে জীবন লক্ষ লক্ষ মানবের ধর্ম্মজীবন রক্ষণে নিযুক্ত, জগতে অধর্ম্ম বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনই যে জীবনের উদ্দেশ্য তাহা কি এই পাপিষ্ঠের পাপ বাসনায় অবসান হইবে? ভগবন্, এখনও ত দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয় নাই, ভারতের সমগ্র নরনারী এখনও ত আপনার চরণতলে আশ্রয় পায় নাই, ব্যাসদেবের বরদান এখনও সার্থক হয় নাই, বিশ্বনাথের আদেশ ত এখনও পালন করা হয় নাই।"

পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য সহাস্যবদনে বলিলেন "বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ। কিন্তু বল দেখি বৎস, তুমিই বা কে, আমিই বা কে, আর এই কাপালিকই বা কে? কেন বৎস, আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইতেছ? কে কাহাকে বধ করিবে, কে কাহাকে রক্ষা করিবে? সকলই ইচ্ছাময়ের লীলা, তবে এই কর্ত্তৃত্বাভিমান কেন? অধর্ম্ম বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপন কাহার লীলা? স্মরণ কর বৎস, অষ্টম বৎসরে কুম্ভীর আক্রমণ, ষোড়শবর্ষে ভগবান্ ব্যাসদেব সম্মুখে মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ-বাসনা-ফলে আরও ষোড়শবর্ষ পরমায়ুবৃদ্ধি, এ সমুদায় কাহার লীলা? আমি কে, আমরা কি পুতুলনাচের পুতুলের মত নহি? তিনি যাহা করাইতেছেন, আমরা ভাবি, তাহাই আমরা করিতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের আদেশে দিগ্বিজয়ে গমন, অদ্বৈত মতস্থাপনে চেষ্টা; জান না কি বৎস, জ্ঞানী সন্ন্যাসীর জীবন পরেচ্ছায় পরিচালিত হয়? বৎস, গুরুবধ আশঙ্কায় তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখিতেছি; চল বৎস, প্রভাতকাল সমাগত। স্নানান্তে আত্মস্বরূপ চিন্তনে নিমগ্ন হও।"

তখন পদ্মপাদ লজ্জিত হইয়া গুরুচরণে প্রণাম পূর্ব্বক গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্য্যের অনুগামী নাগরিক ব্যক্তিগণ আচার্য্যকে দেখিয়া আনন্দে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

প্রেম ও শান্তি।

[শ্রীশশিমোহন বসাক এম্, এ।]

ঈশ্বরাবগাহী মনের বিশ্বতোমুখী বৃত্তির নাম প্রেম। শান্তি প্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি। প্রেমের তন্ময়ী জীবসেবায় শান্তির সুখদ বিলাস। প্রেমের অপরিচ্ছিন্ন অব্যয় বৈচিত্র্যে শান্তির অখণ্ড আনন্দস্ফুরণ। প্রেমে আনন্দ—আনন্দে শান্তি। প্রেমের সার্ব্বজনীন আকর্ষণে জীবহৃদয়ের কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস! প্রেমের আনন্দদায়িনী শক্তিতেই জগতের অভিব্যক্তি। প্রেমনিষ্ঠ আত্মাহুতির ফলে অভিব্যক্ত জগতের স্থিতি। প্রেমেই আবার জগতের আত্যন্তিক প্রলয়। আত্মোৎসর্জ্জনের লীলাভিব্যক্তি হইতেই ভোগ-বিদূষিতা তৃষ্ণার পর্য্যবসান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উপশান্তি। যে স্থানে কলুষপঙ্কিল জড় মোহের উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম সংক্ষোভ নাই, সেই নিবাত নির্ম্মল স্থানেই শান্তির পরমার্থ-লীলা। যতদিন ভোগ-তৃষ্ণার স্বৈরানুবর্ত্তনে জীব বিবশ ও বিহ্বল না হইবে, তত দিন কেমন করিয়া ও কিরূপে মনুষ্য শান্তির সঞ্জীবনী সুধা পান করিতে সমর্থ হইবে; এবং ভোগমোহের পূর্ণোৎসাদন না করিয়া কিরূপেই বা অনন্তের মহারাজ্যে আপনার স্বরূপ দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ করিবে? প্রেমের মহাকর্ষণে আত্মসুখ-তৃষ্ণার পূর্ণ বিলয়। ভোগ-বিলয়ে জীব প্রেমের অনন্ত উচ্ছ্বাস দর্শন করিতে সমর্থ হয়; এবং তখনই মনুষ্য দেশকালনিরুদ্ধ অখণ্ড সত্তায় আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া পরা শান্তি লাভে সমর্থ হয়।

পৃথিবীতে ভ্রান্তির অনর্থকরী ছলনায় অনেকেই প্রেমের নামে অধঃপাতের ঘোর তমিস্রাময়ী পূজায় প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; তাঁহারা সুখের জন্য উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ অনির্দ্দিষ্টভাবে সঞ্চরণ করিয়া কোন সময় আনন্দে হাসিয়াছেন, কোন সময় বিষাদের ভৈরব শাসনে বিকল ও অবশাঙ্গ হইয়াছেন, কখনও বা উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়াছেন, কখনও বা নৈরাশ্যের প্রাণভীতিকর দৃশ্য সন্দর্শনে একেবারেই অধীরভাবে দুর্ব্বহ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন! মানবজাতির বহু-বৈচিত্র্য-বিলসিত ইতিহাস-চিত্রে এবম্বিধ দৃশ্যের অভাব নাই। সেই জন্যই, ইতিহাসের অতি দূরবর্ত্তী সময় হইতেই মনুষ্য সংসারের বিকট আলেখ্য অবলোকন করিয়া, অনর্থসঙ্কুল ধরণীপৃষ্ঠে নিরাশহৃদয়ে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু এই ঘোর তমোবিলসিত সংসারান্ধকারেও বিদ্যুদ্বন্মে-

ষণের ন্যায় কোন কোন মহাপুরুষে প্রেমের বিকাশ দৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষের জীবনই আলোকস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সাধারণ জীবগণকে প্রেমের পথ প্রদর্শন করিতেছে।

প্রেমের বিকাশকল্পেই প্রথমতঃ কবিতার মঙ্গলময়ী অবতারণা। কবি প্রেমের চিরন্তন উপাসক, প্রেমারাধনায় কবি ধ্যানপরায়ণ। প্রেমের মাঙ্গলিক সঙ্গীত কবিতার প্রাণ। কিন্তু জগতে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ কয়জন অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?—কয়জন প্রেমের মহীয়সী উদ্দীপনায় আত্মহারা হইতে পারিয়াছেন? সেই জন্যই জগতে প্রাণস্পর্শী কবিতার এত অধিক অভাব,—সেই জন্যই প্রকৃত কবি এত বিরল। ভোগতৃষ্ণার আবেগে অনেকে নিতান্ত উন্মত্তভাবে, আপন আপন সুখদুঃখের কথা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত কবিত্বে অজস্র কলঙ্কারোপণ করিয়াছেন; কেহ বা ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের দুঃসহ সঙ্ক্ষোভে বিচলিত হইয়াছেন; কেহ বা সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রবল তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জগতে অনর্থকর কুৎসিত ভাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই প্রেমের সেই জগৎপাবনী মূর্ত্তির সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। সাময়িক আবেগে কেহ কাঁদিয়াছেন, ইন্দ্রিয়তাড়নায় কেহ বিলোড়িত হইয়াছেন এবং দ্বন্দ্বভাবের নিরর্থ সঙ্গীতেই উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের উপসংহার করিয়াছেন।

প্রাচীন পাশ্চাত্য জগতে হোমার একজন প্রধান কবি। তিনি প্রেমের মহাগীতির পরিকীর্ত্তনে অনেকবার বিবশ ও আকুল হইয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রাণতার ইয়ত্তা নাই; তাঁহার হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের অবধি নাই এবং তাঁহার প্রেমপূজারও পরিশেষ নাই। প্রেমের তাদৃশী একনিষ্ঠা অর্চ্চনায় হোমার আত্মবিস্মৃত ছিলেন; সৌন্দর্য্যোপাসনায় তাঁহাকে সিদ্ধযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সেই প্রেমোপাসনা অতীব উচ্চ হইলেও তিনি শান্তির চরম স্তরে উপনীত হইতে কোন ক্রমেই সমর্থ হয়েন নাই। হোমার প্রেম-সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হইলেও শান্তিরাজ্যে পঁহুছিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেম উন্নত; তথাপি শান্তি-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত। ভোগ-বিলাসময়ী উদ্‌ভ্রান্তা হেলেন ইলিয়ডের নায়িকা, হেলেনের উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা, মোহের দুর্ব্বার পরিণতি। প্রাচীন সভ্যতার সেই বিষাদালেখ্য সংসার ভাবদুষ্ট। প্রাকৃত জগতে সেই আদর্শ কোন ক্রমেই মনুষ্যের অনুসরণীয় নহে। এই ভীষণ চিত্রে সন্দর্শন করিয়া, প্রেমোন্মত্ত মহাকবি বোধ হয় শান্তিলাভ

করিতে পারেন নাই। হেলেন বিকৃত মোহের উদ্ভ্রান্ত উত্তেজনায় পারমার্থিক প্রেমকে অনায়াসে পদবিদলিত করিয়া মনুষ্যপ্রাণে ঘোরতর আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছে। তৃষ্ণার পরিতর্পণ পার্থিব জগতে অসম্ভব; ভোগলালসায় মানবের অনন্ত অধঃপাত। সেই জন্যই হেলেন আসুরী বৃত্তির সাময়িক পূজায় আপনাকে অশান্তি-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া কতকাল হাহাকার করিয়াছে। অতি পুরাতন দুই সুসভ্য জাতি উত্তপ্ত রুধির প্রদানে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ভুবনবিশ্রুত হেকটারের অবিনাশী শৌর্য্য হেলেনের পাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছে! হেলেন পাশবী প্রবৃত্তির প্রেরণায় প্রেমবিগ্রহকে যেন শতধা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে; হোমারের সমস্ত ইলিয়ড কলঙ্ককালিমায় বিকৃত। সৌন্দর্য্যের চিরন্তন উপাসক প্রেমের পরমার্থদর্শী মহাপ্রাণ হোমার কেমন করিয়া তাদৃশ শোচনীয় আলেখ্যাঙ্কনে উৎসুক হইয়াছিলেন—বুঝিতে পারা যায় না। হোমার কি মুহূর্ত্তের জন্যও সেই হতভাগ্যা হেলেনের চরিত্র পরিকীর্ত্তনে সুখী হইতে পারিয়াছেন? সেই জন্যই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির নিগূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মহাপ্রাণতার অক্ষয় নিধি, জ্ঞান-বৃদ্ধ হোমার প্রেমোপাসনায় যতই কেন অগ্রসর ও সমুন্নত হউন না, তিনি কোন ক্রমেই আদর্শের পূর্ণানুশীলনে আপনাকে শান্তির অমৃত ফলে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই।

প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ বাল্মীকি যেমন শান্তি লাভ করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। রামায়ণী কাহিনী প্রেমের উদার সঙ্গীত। বাল্মীকিহৃদয় প্রেমের কি অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র! বাল্মীকির সাধনা অনন্ত—সিদ্ধি অসীম—শান্তি অনুপমা! রামায়ণের কেন্দ্রস্বরূপিণী বৈদেহীর অনন্ত প্রেমপ্রবাহস্পর্শে আমরা সর্ব্বদাই প্রীতিবিবশ ও ভাববিহ্বল। কেন না, আমরা যতবার এই প্রেমপ্রতিমার অর্চ্চনা করিয়াছি, ততবারই অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি,—প্রেম অনাদি ও অনন্ত; স্থান ও কাল দ্বারা উহা কদাপি ব্যাহত বা পরিচ্ছিন্ন হয় না। বৈদেহীপ্রেমে আমরা বুঝিয়াছি,—প্রেম সাময়িক আবেগের পরিচয় নহে, উহা ইন্দ্রিয়বিকারের বিজৃম্ভণ নহে। সময়াতিবর্ত্তনে প্রকৃত প্রেম অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ, এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে উহা সর্ব্বতোভাবেই অবিকৃত। উহার গতি আছে, পরিশেষ নাই,—প্রবাহ আছে, পরিচ্ছেদ নাই,—উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ নাই, এবং উন্নতি আছে, ভয় নাই। প্রেমে অনন্ত উন্নতি—অনন্ত কল্যাণ—অনন্ত শান্তি। জানকীপ্রেমে সেই মহাসত্য বুঝিতে পারা

যায়। মনুষ্য-নিবাসে হেলেন্ দানবী, আর মৈথিলী মহাদেবী। সেই জন্যই ইলিয়ড্ পাঠে ভয় ও নৈরাশ্য, রামায়ণ পাঠে আশা ও শান্তি। হেলেনের আসুরচিত্রে অবনীর হাহাকার সহস্রপথে ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সীতার প্রেমপূজায় মেদিনী অনন্তকালের জন্য আনন্দে বিহ্বল রহিয়াছে। বাল্মীকি যে সৌভাগ্যে কৃতার্থ, হোমার কোন ক্রমেই সেই অনুপম সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য-কবিকুল-গৌরব হোমার জ্ঞান-বিজ্ঞাননিষ্ঠ আর্য্য কবির অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী; এবং সেই মহামনাঃ মহর্ষি আপনার অনুপম মহিমা প্রচার করিয়া, প্রেমের বিজয়-সঙ্গীত প্রকীর্ত্তিত করিয়াছেন।

আবার, নরকুলপ্রদীপ রামায়ণ-নায়ক রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রেমারাধনায় এতাদৃশী তন্ময়ী আত্মবিস্মৃতি আর কোথাও অবলোকন করা যায় না। দাশরথির প্রেম অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন, সুখ-মোহের বিকৃত ভাব সেই অনাবিল অমল প্রেমকে কদাপি কলুষিত করিতে পারে নাই; এবং দুঃখ দুর্দ্দশা কোন ক্রমে সেই অনুপম প্রেমপ্রবাহকে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্য-কুল-গৌরব ভরত ও লক্ষ্মণও প্রেমারাধনায় সিদ্ধ যোগী। তাঁহারাও আত্মবিসর্জ্জনের পরম পবিত্র উপহারে চিরকাল প্রেমের হিরণ্য-বিগ্রহের সমার্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। রামময় প্রাণ ভরত আত্মবিসর্জ্জনে মহাপ্রেম-প্রদীপ্ত এবং আশার অদম্য আবেগে সমুদ্ভাসিত। লোভের দুরতিক্রম আকর্ষণ সেই অপ্রমেয় প্রেমের কোনরূপ ব্যাঘাত শংসাধন করিতে পারে নাই; কৈকেয়ীর স্বার্থপরায়ণা উত্তেজনা কদাপি উহার বিক্ষোভ সংঘটিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সৌমিত্রি-হৃদয়ের প্রেমসম্ভারের কে ইয়ত্তা করিবে? এমন স্বভাবসুন্দর, স্বতঃসিদ্ধ এবং ভুবনোজ্জ্বল প্রেম কোথাও প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেই দুরবগাহ প্রেমপ্রবাহে পুরুষকার-সম্ভূত প্রযত্ন নাই। লক্ষ্মণের প্রেমও অনন্ত-পথ-ব্যাপী; উহাতেও সাধনা অনন্ত এবং শান্তি অতুলিতা।

পক্ষান্তরে শকুন্তলার প্রেম রূপজ মোহ; উহার উৎপত্তি ঐন্দ্রিয়িক আকর্ষণে। শকুন্তলা বিরহে একেবারেই উন্মত্তা। আবেগে শকুন্তলার হৃদয়োচ্ছ্বাস—বিরহে অনন্ত হৃদয়ক্লেশ। সেই জন্যই, শকুন্তলা-ভাগ্যে অবিমিশ্র শান্তি সংঘটিত হইতে পারে নাই।

প্রেমের বর্ণনায়, মহাকবি সেক্ষপীয়র অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেও, নানাবিধ কারণে তিনি চরম আদর্শের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। তাহা না হইলে,

রোমিও ও জুলিয়েটের ভাগ্য পরিচিন্তনে আমরা এইরূপ বিকল ও অভিভূত হইয়া পড়ি কেন? হ্যাম্‌লেটের শোচনীয় ও লোমহর্ষণ পরিণাম দর্শনে, একেবারেই হতাশ ও আকুল হই কেন? ইঁহারা সকলেই প্রেমের নামে ইন্দ্রিয়ের শাসনে বিবশ হইয়াছেন! ইঁহারা কেহই আত্মনিগ্রহের পবিত্র উপচারে প্রেমের পূজায় সমর্থ হয়েন নাই। প্রেমোপাসনার অতুল অমৃতফল অপূর্ব্ব শান্তি,—ইঁহাদের জীবনে শান্তির ক্ষীণতম রেখাও নয়নগোচর হয় না।

বায়রন, শেলী প্রভৃতিও প্রেমের গভীরার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহাদের দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়াবেগ হাহাকার ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই কোন না কোন ক্রমে অশান্তির হলাহল উদ্গিরণ করিয়াছেন। সেই জন্যই, আশাবিহ্বল মনুষ্য কদাপি ইঁহাদের আলেখ্যে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রেমারাধনায় ভবভূতি অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিয়াছেন। ভবভূতি মহাপ্রাণতার সজীব হিরণ্ময় বিগ্রহ, প্রেম তাঁহার হৃদয়ারাধ্য, এবং শান্তি তাঁহার চির উপাস্য। ফলতঃ, প্রকৃতির মর্ম্মার্থদ্রষ্টা মহাকবি কালিদাস প্রেমের সুখচিত্রাঙ্কনে ভবভূতির বরং নিম্নবর্ত্তী। স্বভাবের চিরন্তণ উপাসক ভবভূতি অসংযত ভাব-বিক্ষোভে কদাপি বিলোড়িত হয়েন নাই; এবং তিনি প্রেমের হৃদয়-হারিণী আরাধনায় শান্তিলাভে কদাপি বঞ্চিত হন নাই। পরম-তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা প্লেটোও প্রেমপূজায় চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এতাদৃশ ভুবনোজ্জ্বল প্রেম-চিত্র অবনীর অনন্ত সম্পদ্। জ্ঞানপ্রদীপ্ত স্পিনোজাও প্রেমার্চ্চনায় শান্তিরূপ মহাসিদ্ধির সাক্ষাৎকারে যার পর নাই কৃতার্থ হইয়াছেন। সেই প্রাণারাধ্য প্রেম-মহার্ণবের অনন্ত সত্তায় আপনার সান্ত সত্তা বিসর্জ্জন করিয়া, দেশ ও কালের অতিদূরপ্রদেশে অবস্থিত রহিয়া পরম শান্তির শীতল ছায়ায় ধন্য হইয়াছেন।

প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, জ্ঞানোদ্ভাসিত বুদ্ধ এবং দেবতাত্মা খ্রীষ্ট প্রভৃতির প্রাণময়ী প্রেমোপাসনার অমৃতাক্ষরা কাহিনী, ভাগবত প্রভৃতি মহাশাস্ত্রের সুখভাষ্য। পৃথিবীতে সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা শুনি না, ইঁহাদের বিশ্ব-বিমোহন চরিত্রে সেই সুখ-সঙ্গীত সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া আমরা যার পর নাই কৃতার্থ হই; ইঁহাদের প্রেমসঙ্গীত জগতের প্রাণ। পত্নীর বিলাপ,সন্তানের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,জননীর আর্ত্তনাদ,জনকের হাহাকার,সংসারের কঠোর বন্ধন, কিছুই সেই বিশ্বপ্রেমিকগণকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

মহাভাগ পার্থ প্রেমারাধনায় যে অনন্ত শান্তিলাভে আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, জগতে তাহার অন্য উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেই প্রেমে ত্যাগ আছে, অহঙ্কার নাই; বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় নাই; ভাব আছে,আক্ষেপ নাই, আত্ম বিস্মৃতি আছে, মৃত্যু নাই। সেই প্রেম ভীষ্ম-শোকে কুণ্ঠিত হয় না—আত্মীয়-বিনাশে বিকল হয় না—সুভদ্রার প্রতপ্ত নিঃশ্বাসে দগ্ধ হয় না · বিজয়োল্লাসে আত্মহারা হয় না—আত্ম-সুখ-পরায়ণতায় মলিন হয় না। অনন্ত-প্রেম-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার পরম পুণ্য উপদেশ অর্জ্জুনের প্রেমপথের সমুজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র। তাঁহারই করুণায় পার্থ চরমে প্রেমের পরম প্রকর্ষ লাভ করিয়া, অহঙ্কারের আমূল নিরসনে, অনন্ত রাজ্যে আপনাকে অবলোকন করিয়া, শান্তির সুধা সমুদ্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

যে শিব-শক্তির কল্পনায় প্রেমের স্ফুরণ, কাব্যের সৌন্দর্য্য, সাধকের সাধনা, যোগীর যোগ, জ্ঞানীর জ্ঞান, সেই মহাপ্রেমের সঞ্জীবনী প্রণোদনায়, মনুষ্য অহঙ্কারের অতিদূরভূমিতে উপনীত হয়; সেই রাজ্যে বিষয়-শাসন নাই, ইন্দ্রিয়ের অত্যাচার নাই, ভোগমোহের বিভীষিকা নাই, অহঙ্কারের তাণ্ডব তাড়না নাই। সেই মহারাজ্যে যত কিছু ক্রিয়া, যত কিছু লীলা, যত কিছু দৃশ্য, সর্ব্বত্রই এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আনন্দ ও শান্তির বিলসন। আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে প্রেমোপাসনা হয় না। উপাসনায় সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মাহুতি। আত্মাহুতিতেই অতুল শান্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসুখ পিপাসার অস্পষ্ট বিন্দুও বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ কোন ক্রমেই প্রেমোপাসনার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য যখন প্রেমের উদ্দীপনায় অনন্ত রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার হৃদয় শান্তির অমৃতসমুদ্রে পরিণত হয়। কেননা, প্রেমের মহাফলে সকল দুঃখের বীজ অহঙ্কারাত্মিকা বুদ্ধি একেবারেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। প্রেমের বিচিত্র লীলায় জল ও অনল, আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য সমীকৃত হয়; সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ একীভূত হয় এবং জগতে যাবতীয় বিরুদ্ধ পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য সুখাবহ সামঞ্জস্য হয়। তখন ভূধরের উচ্চতা সমুদ্রের গভীরতা, আকাশের বিশালতা কি এক অভূতপূর্ব্ব দুর্জ্জেয় ভাবে মিশিয়া যায়।

এই মহাপ্রেমাবেশেই একদিন আর্য্যাবর্ত্তের আদিম হিন্দুগণ অধীর প্রাণে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যের উপাসনায় আপনাদিগকে সমাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উপনিষদের সুখ-স্তোত্র পরিকীর্ত্তনে শান্তির অতল

সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রেমের এই ভুবন-বিমোহিনী উদ্দীপনায় ঋষি-হৃদয়-নিবাসিনী অনাদি সত্য বাণী, মনুষ্যদিগকে দেবত্বের অধিকারী করিয়াছে। ইহারই সঞ্জীবন সুধাস্বাদে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিপ্লাবিত পুণ্যক্ষেত্রে কত কত নর নারী আকুল হইয়া শান্তির সাক্ষাৎকারে জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন। ইহারই সর্ব্বাভিভাবিনী মহীয়সী প্রণোদনায়, ধ্রুব নিশ্চিন্ত রহিয়া প্রেমের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন; প্রহ্লাদ হস্তিপদতলে বিদলিত হইয়াও স্থির ও ধীর,—সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত হইয়াও অচল ও নির্ব্বিকার এবং সর্ব্বদাহী প্রজ্জলিত অনল মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কি এক অপূর্ব্ব শক্তিতে একেবারেই আত্ম-বিস্মৃত! শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমোচ্ছ্বাস—গোপীতপ্তশ্বাস—বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীশুকদেব যে প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণনে অক্ষম, মাদৃশ জনের তাহা বর্ণনা করিতে যাওয়া প্রগল্‌ভতার বিষয়। কামগন্ধশূন্য শ্রীরাধার প্রেম জয়দেবাদি সিদ্ধ প্রেমিকের আলোচ্য বিষয়। শ্রীবৃন্দাবনের গোপীপ্রেমে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ—ইহা রসজ্ঞ জনের অবিদিত নাই।

আবার, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ভোগাবসাদে সমগ্র মেদিনী মূর্চ্ছাভিভূতা, সেই সময় স্বভাবের সুচারু শিশু, সংসার-কল্মষ-পরিমুক্ত, সহজ ভাবের বিগ্রহ এক প্রেমিক সন্ন্যাসী প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রেমের বিজয়-বার্ত্তা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন! অবনী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আশার প্রাণসঞ্চার অনুভব করিয়াছে; অভিনব ভাবে প্রবোধিত হইয়াছে; এবং মৃত্যু হইতে অনন্ত অমৃতত্বের পথে অগ্রসর হইতেছে! জগতের কল্যাণের জন্য এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর শুভ আবির্ভাব! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সে প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাণ থাকে ত সেই প্রেমস্পন্দন অনুভব করিয়া ধন্য হও।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক

ভুবনেশ্বরে অগ্নিদাহক্লিষ্ট জনসমূহের সাহায্য-কার্য্য-বিবরণী

ও

স্থায়ী সাহায্য-ফণ্ডের জন্য আবেদন।

উপরি উক্ত বিবরণীখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, গত মার্চ্চ মাসে অগ্নিদাহ-নিবন্ধন

পুরী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ভুবনেশ্বর ও তৎসমীপবর্ত্তী চারিখানি গ্রামের অধিবাসিগণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠে। এই সংবাদ পাইবামাত্র দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুইজন ব্রহ্মচারী তথায় প্রেরিত হ'ন। ইঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ভুবনেশ্বর সহরটী সম্পূর্ণভাবে এবং নিকটবর্ত্তী চারিখানি গ্রামের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩০০৩ খানি ঘর পুড়িয়া ভস্মসাৎ হয় এবং সেজন্য ৮৭২টী পরিবার আশ্রয়বিহীন অবস্থায় শীতাতপে ও নানাবিধ রোগে বিশেষ কষ্ট পায়। অতঃপর তাঁহারা গৃহনির্ম্মাণ, অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে বিপন্ন লোকদের দুঃখ দূরীকরণে প্রবৃত্ত হ'ন। ইঁহাদের সাহায্যে ৫৫৮ খানি গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং তদ্দ্বারা ৩৮৪টী পরিবার আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়; ৮৯ জন লোককে অন্ন বিতরণ করা হয় এবং ৯০৯ খানি নূতন ও ১৫০ খানি পুরাতন বস্ত্র বিতরিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৩টী দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারকে অর্থসাহায্য প্রদান করা হয়। অগ্নিদাহক্লিষ্ট যে কয়টী ব্যক্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহা যথার্থই হৃদয়স্পর্শী এবং উহা পাঠ করিয়া মানবমাত্রেরই বিচলিত হইবার কথা।

এই সাহায্য-কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৬৫৸৴১৫ খরচ হইয়াছে; কিন্তু সাধারণের দানে ২৭২৮৸৶১৫ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দাহক্লিষ্ট জনসমূহের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা এ কার্য্যে ২৩৭৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। এই অতিরিক্ত অর্থ মিশনের পুরী-দুর্ভিক্ষ-মোচন ও ঘাটাল-বন্যাকার্য্যের জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্তাংশ হইতে ব্যয়িত হইয়াছে। মিশনের অধ্যক্ষগণ এই রিপোর্টে একটী স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের জন্য আবেদন প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, বন্যা প্রভৃতির বিপদসমূহ এক্ষণে ভারতে একপ্রকার স্থায়ী ভাব ধারণ করিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহাদের প্রতীকার বিধানের জন্য একটী স্থায়ী অর্থভাণ্ডার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য Provi-dential Relief Fund নামে একটী অর্থভাণ্ডার বৎসরের সকল সময়ে খুলিয়া রাখিতে মিশনের অধ্যক্ষগণ মনস্থ করিয়াছেন; এবং যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে Poor Fund নামে অপর একটী অর্থভাণ্ডার খুলিতেও ইঁহারা অভিলাষী আছেন। শেষোক্ত ভাণ্ডারটীর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত দুঃখের

প্রতীকার বিধান। যেমন, প্রকৃত সাহায্যের পাত্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের ভরণপোষণ, দরিদ্র ছাত্রগণকে পুস্তক ও বেতনাদি দানে সাহায্য করা ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে, রামকৃষ্ণ-মিশন-পরিচালিত স্থায়ী সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম প্রভৃতির সাহায্যে উপরি উক্ত ভাণ্ডারদ্বয়ের অর্থ ব্যয়িত হইবে না। মিশন-পরিচালিত স্থায়ী অনুষ্ঠানসমূহের অর্থ-ভাণ্ডারের ন্যায় এই সাধারণ ও বিশেষ অর্থভাণ্ডারগুলি সর্ব্ব সময়ে খুলিয়া রাখিলে সহৃদয় জনসাধারণ ইচ্ছা ও সুবিধামত—যথা জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে—সাহায্য প্রেরণে সমর্থ হইবেন। হিন্দুপরিবারমধ্যে এই সকল উৎসবাদি ও ঘটনাবলী বিরল নহে; সেজন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মিশনের এই সানুরোধ আবেদন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে সাধ্যমত সাহায্যদানে মিশনের সদস্যগণকে তাঁহাদের এই সাধু সংকল্পের সফলতা সংসাধনে উৎসাহদান করিবেন। মিশন পূর্ব্বাবধি যেরূপ করিয়া আসিতেছেন, তদ্রূপ যে কার্য্যের জন্য যাহা প্রদত্ত হইবে, সেই উদ্দেশ্যেই তাহা ব্যয়িত হইবে। কোনজাতি যতদিন না আপনার অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র দুঃস্থ জনসাধারণের অবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহাদের দুঃখবিমোচনে অগ্রসর হয়, ততদিন উহা কখন মহত্ত্বপদবীতে আরূঢ় হইতে পারে না। সুতরাং যে দিবস হইতে আমরা ঐ ভাবটী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া হৃদয়ে ধারণ ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব, সে দিবস হইতে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে; এবং যতদিন না আমরা সমবেত চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ দুঃখ ও ক্লেশের হস্ত হইতে আমাদের দেশবাসিগণকে মুক্তি প্রদান করিতে এবং ভারতের অতীত সুখশান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হই, ততদিন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবার অধিকার আমাদের আদৌ নাই। এই কথা যেন আমরা জীবনে কখন বিস্মৃত না হই।"

আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণ মিশনের এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া মিশনের সেবকগণকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিবেন এবং আপনারাও দরিদ্র নারায়ণগণের সাধ্যমত সেবায় সৌভাগ্যলাভ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী ফণ্ডের জন্য অর্থসাহায্য
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন,
মঠ, বেলুড় পোঃ হাওড়া,
ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

ঠাকুরের গুরুভাব ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুল।

ঠাকুর এক সময়ে আমাদের বলিয়াছিলেন—"কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মত ইয়ং বেঙ্গলের (Young Bengal) দলই সব এখানে (আমার নিকটে) আস্‌তে সুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু সন্ত, ত্যাগী সন্ন্যাসী, বৈরাগী বাবাজি সব আস্‌ত যেতো, তা তোরা কি জান্‌বি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে, রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে, হাঁটা পথ ধরে সাগরে চান্ (স্নান) করতে ও ৺ জগন্নাথ দেখতে আস্‌ত। রাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দু চার দিন থাকা, বিশ্রাম করা, তারা সকলে কোর্‌তোই কোর্‌তো। কেউ কেউ আবার কিছু কাল থেকেই যেত। কেন জানিস্? সাধুরা 'দিশা জঙ্গল' ও 'অন্ন পানির' সুবিধা না দেখে কোথাও আড্ডা করে না। 'দিশা জঙ্গল,' কি না—শৌচাদির জন্য সুবিধাজনক নিরেলা জায়গা। আর, 'অন্ন পানি,' কিনা—ভিক্ষা। ভিক্ষান্নেই তো সাধুদের শরীর ধারণ? সেজন্য যেখানে সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তারই নিকটে সাধুরা 'আসন' অর্থাৎ থাকিবার স্থান ঠিক করে।

"আবার চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ভিক্ষার কষ্ট সহ্য করেও বরং সাধুরা কোন স্থানে দু এক দিনের জন্য আড্ডা করে থাকে, কিন্তু যেখানে জলের কষ্ট বা পর্য্যাপ্ত নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না এবং 'দিশা জঙ্গলের' কষ্ট বা শৌচাদি যাবার 'ফারাকৎ' (নির্জ্জন) স্থান নেই, সেখানে কখনও থাকে না। ভাল ভাল সাধুরা ওসব (শৌচাদি) কাজ, যেখানে সকলে করে, যেখানে কারো নজরে পড়তে হবে, সেখানে করে না। অনেক দূরে নিরেলা (নিরালয়) জায়গায় গোপনে সেরে আসে। সাধুদের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম—

"একজন লোক ভাল ত্যাগী সাধু দেখবে বলে সন্ধান করে ফির্‌ছিল।

তাকে একজন বলে দিলে যে, যে সাধুকে লোকালয় ছাড়িয়ে, অনেক দূরে গিয়ে শৌচাদি সারতে দেখবে, তাকেই জানবে ঠিক ঠিক ত্যাগী। সে ঐ কথাটি মনে রেখে লোকালয়ের বাহিরে সন্ধান করতে করতে এক দিন এক-জন সাধুকে অপর সকলের চেয়ে অনেক অধিক দূরে গিয়ে ঐ সব কাজ সারতে দেখতে পেলে ও তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে কেমন লোক তাই জানতে চেষ্টা করতে লাগলো। এখন সে দেশের রাজার মেয়ে শুনেছিল যে ঠিক ঠিক যোগী পুরুষকে বিয়ে করতে পারলে সুপুত্তর লাভ হয়; কারণ, শাস্ত্রে আছে, যোগী পুরুষদের ঔরসেই সুপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। রাজার মেয়ে তাই সাধুরা যেখানে আড্ডা করেছিল, সেখানে মনের মত পতি খুঁজতে এসে ঐ সাধুটিকেই পসন্দ করে। বাড়ী ফিরে তার বাপ্‌কে বল্লে যে, সে ঐ সাধুকে বিবাহ করবে। রাজা মেয়েটিকে বড় ভালবাসতো। মেয়ে জেদ করে ধরেছে, কাজেই রাজা সেই সাধুর কাছে এসে 'অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব' ইত্যাদি বলে অনেক করে বুঝালে যাতে সাধু রাজকন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু সাধু রাজার সে সব কথায় কিছুতেই ভুললো না। কাকেও কিছু না বলে রাতারাতি সে স্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল! আগে যার কথা বলেছি, সেই লোকটি সাধুর এই অদ্ভুত ত্যাগ দেখে তখন জানতে পারলে যে, বাস্ত-বিকই সে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দর্শন পেয়েছে। আর তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর মুখে উপদেশ পেয়ে, তাঁর কৃপায় ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করে কৃতার্থ হোলো।

"রাসমণির বাগানে ভিক্ষার সুবিধা, মা গঙ্গার কৃপায় জলেরও অভাব নেই। আবার নিকটেই মনের মত 'দিশা জঙ্গল' যাবার স্থান—কাজেই সাধুরা তখন তখন এখানেই ডেরা কোরতো। আবার, কথা মুখে হাঁটে—এ সাধু ওকে বল্‌লে; সে, আর একজন এদিকে আসচে জেনে, তাকে বল্‌লে—এইরূপে রাসমণির বাগানে যে সাগর ও জগন্নাথ দেখতে যাবার পথে একটি ডেরা করবার বেশ জায়গা, একথাটা সকল সাধুদের ভিতরেই তখন চাউর হয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুর আরও বলিতেন—"এক এক সময়ে, এক এক রকমের সাধুর ভিড় লেগে যেত। এক সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আসতে লাগল। পেট বৈরাগীর দল নয়—সব ভাল ভাল লোক। (নিজের ঘর দেখাইয়া) ঘরে দিন রাত্তির তাদের ভিড় লেগেই থাকত। আর দিবা রাত্তির, ব্রহ্ম ও মায়ার

স্বরূপ, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, * এই সব বেদান্তের কথাই চল্‌তো। ঐ সব কথা নিয়ে তাদের ভিতর ধূম তর্কবিচার লেগে যেত: (আমার) আবার তখন খুব পেটের অসুখ,আমাশয়। হাতের জল শুকাত না! ঘরের কোণে হুদ্‌ সরা পেতে রাখ্‌ত। সেই পেটের অসুখে ভুগ্‌চি,আর তাদের ঐ সব জ্ঞানবিচার শুন্‌চি! আর, যে কথাটার তারা কোন মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারচে না, (নিজের শরীর দেখাইয়া) ভিতর থেকে তার এমন এক একটা সহজ কথায় মীমাংসা মা তুলে দেখিয়ে দিচ্চে!—সেইটে তাদের বলচি, আর তাদের সব ঝগড়া বিবাদ মিটে যাচ্চে!

"একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতিঃ রয়েছে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে! আর সকাল সন্ধ্যা একবার ক'রে ঘরের বাহিরে এসে গাছ, পালা, আকাশ, গঙ্গা, সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ত ও আনন্দে বিভোর হয়ে দুহাত তুলে নাচ্‌ত; কখন বা হেসে গড়াগড়ি দিত, আর বল্‌ত—'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা

* অস্তি, ভাতি, প্রিয—ঠাকুর, ঐ কথা কয়টি বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন। বলিতেন -"সেটা কি জানিস?—ব্রহ্মের স্বরূপ; বেদান্তে ঐ ভাবে বুঝান আছে যিনিই 'অস্তি'—কি না, ঠিক ঠিক বিদ্যমান আছেন—তিনিই 'ভাতি,' কি না—প্রকাশ পাচ্চেন। এখন, 'প্রকাশটা' হচ্চে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনীসটার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নাই সে জিনীসটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্তে বলে, যে জিনীসটার যখনি আমাদের অস্তিত্ব বোধ হ'ল, তখনি অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনীসটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত বলে বোধ হল—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হল। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বলে বোধ হল—অর্থাৎ তার ভিতরের আনন্দস্বরূপ আমাদের মনে প্রিয় বুদ্ধির উদয় করে সেটাকে ভালবাস্‌তে আমাদের আকর্ষণ করলে। এইরূপে যেখানেই আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞান হচ্চে, সেখানেই আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের জ্ঞান হচ্চে। সে জন্য, যেটা 'অস্তি', সেটাই 'ভাতি', ও 'প্রিয়'—যেটা 'ভাতি', সেটাই 'অস্তি'ও 'প্রিয়'—এবং যেটা 'প্রিয়' সেটাই 'অস্তি' ও 'ভাঁতি' বলে বোধ হচ্চে। কারণ, যে ব্রহ্মবস্তু হতে এই জগৎ, ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর স্বরূপই হচ্চে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' বা সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সে জন্যই উত্তর গীতায় বলেছে—জ্ঞান হলে বুঝা যায়, যেখানে বা যে বস্তু বা ব্যক্তিতে তোমার মনকে টান্‌ছে, সেখানে বা সেই সেই বস্তু ও ব্যক্তির ভিতর পরমাত্মা রয়েছেন।—'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদং।' রূপরসেও তাঁর অংশ রয়েছে বলে লোকের মন সেদিকে ছুটে এ কথা বেদেও আছে।"

প্রপঞ্চ বনায়া!' অর্থাৎ, ঈশ্বর কি সুন্দর মায়া বিস্তার করেছেন। তার ঐ ছিল উপাসনা! তার আনন্দ লাভ হয়েছিল।

"আর একবার এক সাধু আসে—সে জ্ঞানোন্মাদ! দেখতে যেন পিশাচের মত—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধূলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মড়ার কাঁথার মত একখান কাঁথা! কালীঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে করতে এমন স্তব পড়লে,যেন মন্দিরটা শুদ্ধ কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল,আর মা যেন প্রসন্না হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন! তার পর কাঙ্গালীরা যেখানে ব'সে প্রসাদ পায়, সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে ব'লে বস্‌তে গেল। কিন্তু তার ঐ রকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বস্‌তে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। তার পর দেখি, প্রসাদ পেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে, সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্চে! একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে রয়েছে, আর একই পাতে ঐ কুকুরটাও খাচ্চে, আর সেও খাচ্চে! অচেনা লোকে ঘাড় ধরেছে, তাতে কুকুরটা কিছু বলছে না বা পালাতে চেষ্টা করচে না! দেখে এসেই হৃদুকে বল্লুম—'হৃদু এ, যে সে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ।' ঐ কথা শুনেই হৃদু তাকে দেখতে ছুট্‌লো। গিয়ে দেখে, তখন সে বাগানের বাহিরে চলে যাচ্চে। হৃদু অনেক দূর তার সঙ্গে সঙ্গে চ'ল্‌লো, আর ব'লতে লাগ্‌ল—'মহারাজ! ভগবান্‌কে কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।' প্রথম কিছুই ব'ল্‌লে না। তার পর যখন হৃদে কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল, তখন পথের ধারের নর্দ্দামার জল দেখিয়ে ব'ল্‌লে—'এই নর্দ্দামার জল, আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন পাবি।' এই পর্য্যন্ত—আর কিছুই ব'ল্‌লে না। হৃদে আরও কিছু শুন্‌বার ঢের চেষ্টা করলে, বল্‌লে, 'মহারাজ! আমাকে চেলা ক'রে সঙ্গে নিন'। তাতে কোন কথাই বল্‌লে না। তার পর অনেক দূর গিয়ে একবার ফিরে দেখ্‌লে, হৃদু তখনও সঙ্গে সঙ্গে আস্‌চে। দেখেই চোখ রাঙিয়ে ইট তুলে হৃদেকে মারতে তাড়া করলে। হৃদে যেমন পালাল অমনি ইট ফেলে সে পথ ছেড়ে কোন্ দিকে যে সরে পড়লো, হৃদে তাকে আর দেখতে পেলে না। অমন অব সাধু লোকে বিরক্ত করবে বলে ঐ রকম বেশে থাকে। ঐ সাধুটির ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছিল। শাস্ত্রে আছে, ঠিক ঠিক পরমহংসেরা বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ হয়ে সংসারে থাকে। সেজন্য পরমহংসেরা ছোট ছোট ছেলেদের আপনাদের কাছে রেখে তাদের মত

হতে শিখে। ছেলেদের যেমন সংসারের কোন জিনীসটার আঁট্ নেই, সকল বিষয়ে সেই রকম হবার চেষ্টা করে। দেখিস্‌নি বালককে, হয়ত এক-খানি নূতন কাপড়, মা পরিয়ে দিয়েচে, তাতে কতই আনন্দ! যদি বলিস্, 'কাপড়খানি আমায় দিবি?' সে অমনি বলে উঠবে, 'না, দোবো না, মা আমায় দিয়েচে।' বলেই আবার হয়ত কাপড়ের খোঁট্‌টা জোর করে ধ'রবে, আর তোর দিকে দেখ্‌তে থাক্‌বে—পাছে তুই সেখানি কেড়ে নিস্! কাপড়খানাতেই তখন যেন তার প্রাণটা সব পড়ে আছে! তার পরেই হয়ত তোর হাতে একটা সিকি পয়সার খেলনা দেখে বলবে 'ঐটে দে, আমি তোকে কাপড়খানা দিচ্চি।' আবার কিছু পরেই হয়ত সে খেল্‌নাটা ফেলে একটা ফুল নিতে ছুটবে। তার কাপড়েও যেমন আঁট, খেল্‌নাটায়ও সেই রকম আঁট। ঠিক ঠিক জ্ঞানীদেরও ঐ রকম হয়।

"এই রকম করে কত দিন গেল। তার পর তাদের (সন্ন্যাসী পরম-হংসশ্রেণীর) যাওয়া আসাটা কমে গেল। তারা গিয়ে, আস্‌তে লাগল যত রামাৎ বাবাজী—ভাল ভাল ত্যাগী ভক্ত বৈরাগী বাবাজী। দলে দলে আস্‌তে লাগলো! আহা, তাদের সব কি ভক্তি, বিশ্বাস! কি সেবায় নিষ্ঠা! তাদের একজনের কাছ (নিকট) থেকেই তো 'রামলালা' * আমার কাছে থেকে গেল। সে সব ঢের কথা।

"সে বাবাজী ঐ ঠাকুরটির চিরকাল সেবা কোরতো। যেখানে যেত, সঙ্গে করে নিয়ে যেত। যা ভিক্ষা পেত, রেঁধে বেড়ে তাকে (রামলালাকে) ভোগ দিত। শুধু তাই নয়—সে দেখতে পেত রামলালা সত্য সত্যই খাচ্চে বা কোনও একটা জিনীস খেতে চাচ্চে, বেড়াতে যেতে চাচ্চে, আবদার করচে, ইত্যাদি! আর ঐ ঠাকুরটি নিয়েই সে আনন্দে বিভোর, 'মস্ত', হয়ে থাকতো! আমিও দেখতে পেতুম, রামলালা ঐ রকম সব কচ্চে! আর রোজ সেই বাবাজির কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতুম্—আর রামলালাকে দেখতুম্!

"দিনের পর যত দিন যেতে লাগ্‌লো, রামলালারও তত আমার উপর

* 'রামলালা' অর্থাৎ বালক বেশী শ্রীরামচন্দ্র। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লোকে, বালক বালিকাদের আদর করিয়া লাল্ বা লালা ও লালী বলিয়া ডাকে। সে জন্যই শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাবস্থার পরিচায়ক ঐ আটধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তিটিকে উক্ত বাবাজি 'রামলালা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্গ ভাষায়ও 'দুলাল, দুলালী' প্রভৃতি শব্দের ঐ রূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পিরীত বাড়্‌তে লাগ্‌লো। (আমি) যতক্ষণ বাবাজির (সাধুর) কাছে থাকি ততক্ষণ সেখানে বেশ থাকে—খেলা ধূলো করে; আর (আমি) যাই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও (আমার) সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে! বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না! প্রথম প্রথম ভাবতুম্, বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে তার (সাধুর) চিরকেলে পূজো করা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবেসে—ভক্তি করে সন্তর্পণে সেবা করে, সে ঠাকুর তার (সাধুর) চেয়ে আমায় ভালবাস্‌বে—এটা কি হতে পারে? কিন্তু ওরকম ভাব্‌লে কি হবে?—দেখ্‌তুম্, সত্য সত্য দেখ্‌তুম্—এই যেমন তোদের সব দেখ্‌ছি, এই রকম দেখ্‌তুম্—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পেছনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌চে। কখন বা কোলে উঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়ত কখন বা কোলে কোরে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাক্‌বে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটা বনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়্‌বে! যত বারণ করি, 'ওরে অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাঁটিস্‌নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি হবে, জ্বর হবে'—সে কি তা শুনে? যেন কে কাকে বল্‌ছে! হয়ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌তে লাগ্‌লো, আর আরো দুরন্তপানা করতে লাগলো বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গি করে ভ্যাঙ্‌চাতে লাগ্‌লো! তখন সত্য সত্যই রেগে বল্‌তুম, 'তবে রে পাজি, বোস্—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো!'—বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি; আর এ জিনীসটা, ও জিনীসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভিতর খেল্‌তে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই দুষ্টামি থাম্‌চে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখ্‌তো! তখন আবার মনে কষ্ট হত; কোলে নিয়ে কত আদর কোরে তাকে ভুলাতাম! এই রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম!"

মায়াবদ্ধ জীব আমরা তো রামলালার ঐ সব কথা শুনিয়া অবাক্! ভয়ে ভয়ে (রামলালা) ঠাকুরটির দিকে তাকাইয়া দেখি, যদি কিছু দেখিতে পাই। ওমা, কিছুই না! আর পাবই বা কেন? রামলালার উপর সে ভালবাসা টান তো আর আমাদের নাই। ঠাকুরের ন্যায় সে ভাবচক্ষু তো

আমাদের খুলে নাই যে ভিতরে শ্রীরামচন্দ্রের ভাবটি ঘনীভূত হয়ে বাহিরেও রামলালাকে জীবন্ত দেখিব! আমরা একটি ছোট পুতুলই দেখি, আর ভাবি, ঠাকুর যা বলিতেছেন, তা কি হইতে পারে বা হওয়া সম্ভব? সংসারে সকল বিষয়েই তো আমাদের ঐরূপ হইতেছে, আর অবিশ্বাসের ঝুড়ি লইয়া বসিয়া আছি! দেখনা—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলিলেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,' জগতে এক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছুই নাই; তোরা যে নানা জিনীস নানা ব্যক্তি সব দেখিতেছিস্, তার একটা কিছুও বাস্তবিক নাই। আমরা ভাবিলাম, 'হবেও বা'। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মবস্তুর নাম গন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না; দেখিতে পাইলাম, কেবল কাট মাটি, ঘর দ্বার, মানুষ গরু, নানা রঙ্গের জিনীস। না হয় বড় জোর দেখিলাম, নীল সুনীল তারকামণ্ডিত অনন্ত আকাশ, শুভ্র কিরীটী হরিৎ-শ্যামলাঙ্গ ভূধর তাহাকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, আর কলনাদিনী স্রোতস্বতীকুল, তাহাকে 'অত স্পর্দ্ধা ভাল না' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে নিম্নগা হইয়া তাহাকে দীনতা শিক্ষা দিতেছে! অথবা দেখিলাম, বাত্যাহত অনন্ত জলধি, বিশাল বিক্রমে সর্ব্বগ্রাস করিতে যেন ছুটিয়া আসিতেছে—কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বেলাতিক্রম করিতে পারিতেছে না! আর ভাবিলাম, ঋষিরা কি কোনরূপ নেসা ভাঙ করিয়া কথাগুলি বলিয়াছে? ঋষিরা যদি বলিলেন 'না হে বাপু, কায়মনোবাক্যে সংযম ও পবিত্রতার অভ্যাস করিয়া একচিত্ত হও, চিত্তকে স্থির কর, তাহা হইলেই আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিতে—দেখিতে পাইবে, দেখিবে, জগৎটা তোমারই ভিতরের ভাবের ঘনীভূত প্রকাশ, দেখিবে তোমার ভিতরে নানা রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরেও নানা দেখিতেছ।'—আমরা বলিলাম, 'ঠাকুর, পেটের দায়ে ইন্দ্রিয়তাড়নায় অস্থির, আমাদের অত অবসর কোথায়?' অথবা বলিলাম, 'ঠাকুর, তোমার ব্রহ্মবস্তু দেখিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া ফর্দ্দ বাহির করিলে, তাহা করা তো দুই চারি দিন বা মাস বা বৎসরের কাজ নয়—মানুষে এক জীবনে করিয়া উঠিতে পারে কিনা সন্দেহ। তোমাদের কথা শুনিয়া ঐ বিষয়ে লাগিয়া তার পর যদি ব্রহ্মবস্তু না দেখিতে পাই, অনন্ত আনন্দটা সব ফাঁকি বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই তো আমার একুলও গেল, ওকুলও গেল—না পৃথিবীর, ক্ষণস্থায়ীই হউক আর যাহাই হউক, সুখগুলো ভোগ করিতে পাইলাম, না তোমার অনন্ত সুখটাই পাইলাম—তখন কি হবে? না,

ঠাকুর! তুমি অনন্ত সুখের আস্বাদ পাইয়া থাক, ভাল—তুমিই উহা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে সুখে ভোগ দখল কর; আমরা রূপরসাদি হইতে হাতে হাতে যে সুখটুকু পাইতেছি, আমাদের তাহাই ভোগ করিতে দাও; নানা তর্ক যুক্তি, ফন্দি ফারকা তুলিয়া আমাদের সে ভোগটুকু মাটি করিও না!'

আবার দেখ--বিজ্ঞানবিৎ আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে যন্ত্র সহায়ে দেখাইয়া দিতেছি; এক সর্ব্বব্যাপী প্রাণপদার্থ ইট কাট সোণা রূপা গাছ পালা মানুষ গরু সকলের ভিতরেই সমভাবে রহিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।' আমরা দেখিলাম, বাস্তবিকই সকলের ভিতরে প্রাণস্পন্দন পাওয়া যাইতেছে! বলিলাম—'বা, বা,তোমার বুদ্ধিখানার দৌড় খুব বটে! কিন্তু শুধু ঐজ্ঞান লইয়া কি হইবে? ও কথাত আমাদের বেদকর্ত্তা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন * বহুকাল পূর্ব্বে। তুমি না হয় উহা এখন দেখাইতেই পারিলে। উহার সহায়ে আমাদের রূপরসাদি ভোগের কিছু বৃদ্ধি হইবে বলিতে পার? তাহা হইলে বুঝিতে পারি।' বিজ্ঞানবিৎ বলিলেন—'হইবে না? নিশ্চিত হইবে। এই দেখনা, তাড়িৎশক্তির পরিচয় পাইয়া তোমার দেশ দেশান্তরের সংবাদ পাইবার কত সুবিধা হইয়াছে; বাষ্পীয় শক্তির কথা জানিয়া তোমার রেল জাহাজ কল কারখানা করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বারা ভোগের মূল, অর্থ উপার্জ্জনের কত সুবিধা হইয়াছে; বিস্ফারক পদার্থ সকলের গূঢ় নিয়ম বুঝিয়া বন্দুক কামান করিয়া তোমার ভোগসুখ লাভের অন্তরায়, শক্রকুল নাশের কত সুবিধা হইয়াছে। এইরূপে আজ আবার এই যে সর্ব্বব্যাপী প্রাণশক্তির পরিচয় পাইলে, তাহা দ্বারাও পরে ঐরূপ কিছু না কিছু সুবিধা হইবেই হইবে।' তখন আমরা বলিলাম, 'তা বটে; আচ্ছা, কিন্তু যত শীঘ্র পার, ঐ নবাবিষ্কৃত শক্তিপ্রয়োগে যাহাতে আমাদের ভোগের বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়টায় লক্ষ্য রাখিয়া যাহা হয় কিছু একটা বাহির করিয়া ফেল; তাহা হইলেই, বুঝিব, তুমি বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ বটে; ঐ বেদ-পুরাণ-বক্তা ঋষিগুলোর মত তুমি নেশা ভাঙ করিয়া কথা কহ না।' বিজ্ঞানবিৎও শুনিয়া আমাদের ধারা বুঝিয়া বলিলেন—'তথাস্তু!'

ধর্ম্মজগতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচারক ঋষিরা ঐরূপে 'তথাস্তু' বলিতে পারিলেন না বলিয়াই তো যত গোল বাঁধিয়া গেল! আর তাঁহাদিগকে

* "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতা।"

সংসারের কোলাহল হইতে দূরে ঝোড়ে জঙ্গলে বাস করিয়া দুই চারিটা সংসার-বিরাগী লোককে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল! তবে ভারতে ধর্ম্ম-জগতে ঐরূপ 'তথাস্তু' বলিবার চেষ্টা যে কোন কালে, কখনও হয় নাই তাহা বোধ হয় না। বৌদ্ধ যুগের শেষের কথাটা স্মরণ কর—যখন তান্ত্রিক কাপালিকেরা মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিপুল প্রসার করিতেছেন, যখন শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে মানবের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপশম ও আরোগ্যের এবং ভূত প্রেত তাড়াইবার খুব ধূম ধাম পড়িয়াছে, যখন তপস্যালব্ধ সিদ্ধাই প্রভাবে অলৌকিক কিছু একটা না দেখাইতে পারিলে এবং শিষ্যবর্গের সাংসারিক ভোগসুখাদি নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে সম্পন্ন হয়, দৈবকে ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা তুমি ধারণ কর, অন্ততঃ এরূপ ভাণ না করিতে পারিলে তুমি ধার্ম্মিক বলিয়াই পরিচিত হইতে পারিতে না—সেই যুগের কথা স্মরণ কর। তখন ধর্ম্মজগৎ একবার ভোগের কামনা পূর্ণ করিবার সহায়ক বলিয়া ধর্ম্মনিহিত গূঢ় সত্য সকলকে সংসারী মানবের নিকট প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু আলোক ও অন্ধকার একত্রে একই স্থানে এক সময়ে থাকিবে কিরূপে? ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই কাপালিক তান্ত্রিকদের যোগ ভুলিয়া ভোগভূমিতে অবরোহণ এবং ধর্ম্মের নামে রূপরসাদি ভোগের সবিস্তার শৃঙ্খলার গুপ্ত প্রচার! তখন দেশের যথার্থ ধার্ম্মিকেরা আবার বুঝিল যে, যোগ ভোগ দুই পদার্থ পরস্পর বিরোধী, একত্রে একাধারে কোনরূপেই থাকিতে পারে না এবং বুঝিয়া, পুনরায় ঋষিকুল-প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী হইয়া জীবনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

আমাদেরও সংসারী মানবের মতে মত দিয়া ঐরূপে "তথাস্তু" বলিবার সুযোগ কোথায়? আমরা যে এক জগৎছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে বসিয়াছি!—যাঁহার মনে ত্যাগের ভাব এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সুষুপ্তাবস্থায়ও হস্তে ধাতু স্পর্শ করিলে হস্ত সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হইয়া যাইত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণের ভিতর বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত করাইত! যাঁহার মনে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান, স্ত্রী-শরীর দেখিলেই উদয় হইত—নানা লোকে নানা চেষ্টা করিয়াও ঐ ভাব দূর করিতে পারে নাই! যাঁহার মনে সহস্র সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিল বলিয়া এমন বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরম অনুগত মথুরকে যষ্টি হস্তে আরক্ত নয়নে প্রহার

করিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন এবং পরেও সে সব কথা আমাদের নিকট কখন কখন বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন—'মথুর ও লক্ষ্মী নারায়ণ মাড়োয়ারি বিষয় লেখা পড়া করে দিবে শুনে মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিয়েছিল—এমন যন্ত্রণা হয়েছিল!' যাঁহার মনে সংসারের রূপরসাদি কখনও আসক্তির কলঙ্ক-কালিমা আনয়ন করিয়া সমাধিভূমির অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভবের বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদ জন্মাইতে পারে নাই! এ সৃষ্টিছাড়া ঠাকুরের কথা বলিতে যাইয়াআমাদের যে অনেক তিরস্কার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, হে ভোগলোলুপ সংসারী মানব, তাহা আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানি। শুধু তাহাই নহে, পাছে তোমার দল বল, আত্মীয় স্বজন, পুত্র পৌত্রাদির ভিতর সরলমতি কেহ এ অলৌকিক চরিত্রের প্রতি আমাদের কথায় সত্য সত্যই আকৃষ্ট হইয়া ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সংসারের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, তজ্জন্য তুমি এ দেবচরিত্রেও যে কলঙ্কার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু জানিলে কি হইবে? যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আর আমাদের বিরত হইবার বা অন্ততঃ আংশিক গোপন করিয়া সত্য বলিবার সামর্থ্য নাই। যত দূর জানি, সমস্ত কথাই বলিয়া যাইতে হইবে। নতুবা শান্তি নাই। কে যেন জোর করিয়া বলাইতেছে যে! অতএব আমরা এ অদৃষ্টপূর্ব্ব মানবদেবের কথা যতদূর জানি বলিয়া যাই, আর তুমি এই সকল কথার যতটা ইচ্ছা 'ন্যাজা মুড়ো বাদ দিয়া' নিজের যতটা 'রয় সয়' ততটা লইও, বা ইচ্ছা হইলে 'কতকগুলো গাঁজাখুরি কথা লিখেছে' বলিয়া পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য নূতন ফুলে 'বিষয়-মধু' পান করিতে ছুটিও। পরে, সংসারের বিষম ঘূরণপাকে পড়িয়া যদি কখন 'বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল, কামাদি কুসুম সকলে'—এমন অবস্থা তোমার ভাগ্যদোষে (বা গুণে?) আসিয়া পড়ে, তখন এ অলৌকিক পুরুষের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িও—নিজেও শান্তি পাইবে এবং আমাদের ঠাকুরেরও 'কদর' বুঝিবে।

'রামলালার' ঐরূপ অদ্ভুত আচরণের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বলিতেন—"এক এক দিন রেঁধে বেড়ে ভোগ দিতে বসে বাবাজি (সাধু) রামলালাকে দেখতেই পেত না। তখন মনে ব্যথা পেয়ে এখানে (ঠাকুরের ঘরে) ছুটে আস্‌ত; এসে দেখত, রামলালা ঘরে খেলা করচে! তখন অভিমানে তাকে কত কি বলত! বলত 'আমি এত করে রেঁধে বেড়ে তোকে

খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্চি, আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস্! তোর ধারাই ঐরূপ, যা ইচ্ছা তাই করবি'; মায়া দয়া কিছু নেই! বাপ্ মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপ্‌টা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না!'—এই রকম সব কত কি বলে, রামলালাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত! এই রকমে দিন যেতে লাগ্‌ল। সাধু এখানে অনেক দিন ছিল—কারণ রামলালা এখান ছেড়ে যেতে চায় না—আর সেও চিরকালের আদরে রামলালাকে ফেলে যেতে পারে না!

"তার পর একদিন বাবাজি হঠাৎ এসে সজল নয়নে বল্‌লে—'রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমন ভাবে দেখ্‌তে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে এখান থেকে যাবে না; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না! আমার এখন আর মনে দুঃখ কষ্ট নাই! তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলা ধূলো করে, তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই! এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ! সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।'—এই বলে রামলালাকে আমাকে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। সেই অবধি রামলালা এখানে রয়েছে।"

আমরা বুঝিলাম ঠাকুরের দেবসঙ্গেই বাবাজির মন স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসার আস্বাদন পাইল এবং বুঝিতে পারিল যে এই প্রেমের উদয় হইলে আর ভালবাসিতের সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। বুঝিল যে, শুদ্ধ প্রেমঘন তাহার উপাস্য তাহার নিকটে সর্ব্বদাই রহিয়াছেন, যখনি ইচ্ছা তখনি তাঁহার দর্শন পাইবে—সাধু এই আশ্বাস পাইয়াই যে প্রাণের রামলালাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়।

ঠাকুর বলিতেন—"আবার এক সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস! সেও রামাৎ; তার সঙ্গে অন্য কিছুই নেই, কেবল একটি লোটা (ঘটি) ও একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা কোরতো ও এক এক বার খুলে দেখ্‌তো। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক করে ব'লে ক'যে বইখানি দেখ্‌তে চেয়ে নিলুম। খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালীতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'ওঁ রামঃ!' সে বল্‌লে, 'মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান্ থেকেই ত বেদ

পুরাণ সব বেরিয়েছে ; আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ ; অতএব চার বেদ, আঠার পুরাণে, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তা তাঁর একটি নামেতে সব রয়েছে। তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি!'—তার (সাধুর) নামে এমনি বিশ্বাস ছিল!"

এইরূপে কত সাধুর কথাই না ঠাকুর আমাদিগের নিকট বলিতেন ; আবার কখনও কখন ঐ সকল রামাইত বাবাজীদের নিকট যে সকল ভগবানের ভজন শিখিয়াছিলেন, তাহা গাহিয়া আমাদের শুনাইতেন। যথা—

(মেরা) রামকো না চিনা হ্যায়, দেল্, চিনা হ্যায় তুম্ ক্যারে ;
আওর্ জানা হ্যায় তুম্ ক্যারে।
সন্ত ওহি যো, রাম রস চাখে
আওর্ বিষয় রস চাখা হ্যায় সো ক্যারে॥
পুত্র ওহি যো, কুলকো তারে
আওর্ যো সব পুত্র হ্যায় সো ক্যারে॥

অথবা—

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।
ভজ্ লে অযোধ্যানাথ দোসরা না কোই॥
হসন বোলন চতুর চাল, অয়ন বয়ন দৃগ্ বিশাল
ভ্রূকুটি কুটিল তিলক ভাল নাসিকা শোভাই॥
কেশর্কো তিলক ভাল, মান রবি প্রাতঃকাল
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাট রতিপতি ছবিছায়ী॥
মোতিন্‌কো কণ্ঠমাল, তারাগণ উরু বিশাল
মান গিরি শিখর ফোরি সুরসরি বহিরায়ী॥
বিহরে রঘুবংশবীর, সখা সহিত সরযূতীর
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ রজপাই।

অথবা গাহিতেন—

'মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে তারণ ওয়ালা।'—এই মধুর গীতটির অপর চরণ সকল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

কখন বা আবার ঠাকুর ঐ সকল সাধুদিগের নিকট যে সকল দোঁহা শিখিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের শুনাইতেন। বলিতেন, 'সাধুরা, চুরি নারী

ও মিথ্যা এই তিনের হাত থেকে সর্ব্বদা আপনাকে বাঁচাতে উপদেশ করে।' বলিয়াই আবার বলিতেন—'এই তুলসীদাসের দোঁহায় সব কি বল্‌ছে শোন্—

সত্য বচন অধীনতা পরধন উদাস।
ইস্‌সে না হরি মিলে তো জামিন্ তুলসীদাস॥
সত্য বচন অধীনতা পরস্ত্রী মাতৃসমান।
ইস্‌সে না হরি মিলে তুলসী ঝুট্ জবান্॥

" 'অধীনতা' কি জানিস্—দীনভাব। ঠিক ঠিক দীন ভাব এলে অহ-ঙ্কারের নাশ হয় ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কবীর দাসের গানেও ঐ কথা আছে—

সেবা বন্দি আওর অধীনতা, সহজ মিলি রঘুরাঈ।
হরিষে লাগি রহরে ভাই॥ ইত্যাদি।"

আবার একদিন ঠাকুর বলিলেন—"এক সময়ে এমনটা মনে হল যে, সকল রকমের সাধকদের যা কিছু জিনীস সাধনার জন্য দরকার, সে সব তাদের যোগাব! তারা সেই সব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঈশ্বর সাধনা করবে, তাই দেখ্‌বো! মথুরকে বল্লুম। সে বল্লে, 'তার আর কি বাবা, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি; তোমার যাকে যা ইচ্ছা হবে দিও।' ঠাকুর-বাড়ীর ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি যার যেমন ইচ্ছা তাকে সেই রকম সিধা দিবার বন্দোবস্ত তো ছিলই—তার উপর মথুর, সাধুদের দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, মায় তারা যে সব নেশা ভাঙ্গ করে, সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদের জন্য—'কারণ,' প্রভৃতি সকল জিনীস দেবার বন্দো-করে দিলে। তখন তান্ত্রিক সাধক সব ঢের আস্‌তো ও শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান কোরতো। আমি আবার তাদের সাধনার আবশ্যক বলে আদা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে, মুড়ি কড়াই ভাজা সব যোগাড় করে দিতুম; আর তারা সব ঐ নিয়ে পূজা করচে, জগদম্বাকে ডাক্‌ছে দেখতুম। আমাকে তারা আবার অনেক সময় চক্রে নিয়ে বস্‌তো অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাতো; 'কারণ' গ্রহণ করতে অনুরোধ করতো। কিন্তু যখন বুঝ্‌তো যে, ওসব গ্রহণ কর্‌তে পারি না, নাম করলেই নেসা হয়ে যায়, তখন আর অনুরোধ করত না। তাদের সঙ্গে বসলে করতে হয় বলে,'কারণ' নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম বা বড় জোর আঙ্গুলে করে মুখে ছিটে দিতুম আর তাদের

পাত্রে সব ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখলুম, তাদের ভিতর কেউ কেউ গ্রহণ করেই ঈশ্বরচিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকে। অনেকেই কিন্তু লোভে পড়ে খায়, আর জগদম্বাকে ডাকা দূরে থাক্, বেশী খেয়ে শেষটা মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐ রকমে বেশী ঢলাঢলি করাতে শেষটা ও সব (কারণাদি) দেওয়া বন্ধ করে দিলুম। রামকুমারকে* কিন্তু বরাবর দেখেছি, গ্রহণ করেই তন্ময় হয়ে জপে বসতো। কখন অন্য দিকে মন দিত না। শেষটা কিন্তু যেন একটু নাম যশ প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক হয়েছিল আর ছেলেপিলে পরিবার ছিল—বাড়ীতে অভাবের দরুণ টাকা কড়ি লাভের দিকেও একটু আধটু মন দিতে হত, শুনেছিলাম। তা যাই হক্, সে কিন্তু বাবু সাধনার সহায় বলেই কারণ গ্রহণ কোরতো; লোভে পড়ে ঐ সব খেয়ে কখন ঢলাঢলি করে নি,—এটা দেখেছি।"

ঠাকুর 'কারণ' গ্রহণ করিতে কখন পারিতেন না—এ প্রসঙ্গে কত কথারই না মনে উদয় হইতেছে! কত দিন না, আমাদের সম্মুখে, তিনি কথা প্রসঙ্গে 'সিদ্ধি', 'কারণ' প্রভৃতি পদার্থের নাম করিতে করিতে নেসায় ভরপূর হইয়া, এমন কি সমাধিস্থ পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিয়াছি! স্ত্রী-শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ, যাহার নাম মাত্রেই সভ্যতাভিমানী জুয়াচোর আমাদের মনে কুৎসিত ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ ভাব উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের ভিতর শিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতেই এ অদ্ভুত ঠাকুরকে কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি! আবার দেখিয়াছি—সমাধিভূমি হইতে কিছু নিম্নে নামিয়া একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াই ঐ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "মা, তুইতো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী; তোর যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ বেদান্ত, সেই সবই তো খিস্তি খেয়ুড়ে! তোর বেদ বেদান্তের ক, খ, আলাদা, আর খেউড়ের ক, খ, আলাদা তো নয়! বেদ বেদান্তও তুই, আর খেউড়ও তুই!"—এই বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! হায়, হায়—বলা বুঝানর কথা

* ইনি কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। কালিঘাটে অনেক সময় থাকিতেন এবং অচলানন্দ নাথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অনেকগুলি শিষ্য প্রশিষ্য রাখিয়া যান। ইঁহার দেহত্যাগের পর শিষ্যেরা কালীঘাটেরই নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে মহাসমারোহে তাঁহার শরীরের মৃৎ সমাধি দেয়।

দূরে যাউক, কে বুঝিবে, এ অলৌকিক দেবমানবের নয়নে জগতের ভাল, মন্দ, সকল পদার্থই কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়, আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর, এক আলোকে প্রকাশিত ছিল! কে সে চক্ষু পাইবে যে, তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিতে জগৎ সংসারটা দেখিতে পাইবে! হে পাঠক অবহিত হও; স্তম্ভিত মনে কথাগুলি হৃদয়ে যত্নে ধারণ কর, আর ভাব এ অদ্ভুত ঠাকুরের মানসিক পবিত্রতা কি সুগভীর, কি দূরবগাহী!

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্র শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

সুরাপান করিনা আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।

আমার মন মাতালে মাতাল করে যত মদমাতালে মাতাল বলে॥ ইত্যাদি। নেশা ভাঙ না করিয়া কেবল ভগবদানন্দে যে লোকে, আমরা যে অবস্থাকে 'বেয়াড়া মাতাল' বলি, তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইতে পারে, এ কথা ঠাকুরকে দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণাই হইত না। আমাদের বেশ মনে আছে, আমাদের জীবনে একটা সময় এমন গিয়েছে, যখন, 'হরি' বলিলেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত—একথা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে কুসংস্কারাপন্ন নির্ব্বোধ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। তখন ঐ প্রকারের একটা, সকল বিষয়ে সন্দেহ—অবিশ্বাসের তরঙ্গ যেন সহরের সকল যুবকেরই মনে চলিতেছিল! তাহার পরেই এই অলৌকিক ঠাকুরের দর্শন! দেখা, দিবসে রাত্রে সকল সময়ে দেখা, নিজের চক্ষে দেখা, যে, কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন বাহ্যজ্ঞানের লোপ—টাকা পয়সা হাতে স্পর্শ করাইলেই ঐ অবস্থাপ্রাপ্তি—'সিদ্ধি' 'কারণ' প্রভৃতি নেশার পদার্থের নাম করিবা মাত্র ভগবদানন্দের উদ্দীপন হইয়া ভরপুর নেশা—ঈশ্বরের বা তদবতারদিগের নামের কথা দূরে থাক, যে নামের উচ্চারণে ইতর সাধারণের মনে কুৎসিত ইন্দ্রিয়জ আনন্দেরই উদ্দীপনা, তাহাতে ব্রহ্মযোনি ত্রিজগৎপ্রসবিনী আনন্দময়ী জগদম্বার উদ্দীপন ও দর্শন হইয়া ইন্দ্রিয়সম্পর্কমাত্রশূন্য বিমল আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়া! এখনও কি বলিতে হইবে, এ অলৌকিক দেবমানবের কি এমন গুণ দেখিয়া আমাদের চক্ষু চিরকালের মত ঝলসিত হইয়া গেল, যাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে হৃদয়ে আসন দান করিলাম?

ঠাকুরের পরম ভক্ত, পরলোকগত ডাক্তার, শ্রীরামচন্দ্র দত্তের সিমলার (কলিকাতা) ভবনে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে অনেক

আনন্দ করিতেন। একদিন ঐরূপে কিছুকাল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আনন্দ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। রামবাবুর বাটীখানি সম্পূর্ণ গলির* ভিতর, বাটীর সম্মুখে গাড়ী আসিতে পারে না। বাটীর কিছু দূরে পূর্ব্বের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে বাড়ীতে আসিতে হয়।। ঠাকুরের যাইবার জন্য একখানি গাড়ী পশ্চিমের বড় রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। ঠাকুর সেদিকে হাঁটিয়া চলিলেন, ভক্তেরা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদানন্দে সে দিন ঠাকুর এমন টলমল করিতেছিলেন যে এখানে পা ফেলিতে, ওখানে পড়িতেছে। কাজেই বিনা সাহায্যে ঐ কয়েক পদ যাইতে পারিলেন না। দুইজন ভক্ত দুই দিক্ হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিল। গলির মোড়ে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহারা ঠাকুরের ব্যাপার বুঝিবেন কিরূপে?—আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'উঃ! লোকটা কি মাতাল হয়েছে হে!' কথাগুলি ধীরস্বরে উচ্চারিত হইলেও আমরা শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; আর মনে মনে বলিলাম, 'তা বটে!'

দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানাটা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাঁট পাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মন্দির হইতে ফিরিলেন—একেবারে যেন পুরো দস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য্য করিতেছেন, ঠাকুর যে তাঁহার নিকটে ঐ ভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন না। এমন সময়ে ঠাকুর মাতালের মত তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া সহসা ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন—'না, না, মদ খাবে কেন?'

* গলির নাম, মধুরায়ের গলি।

ঠাকুর—'তবে কেন টল্‌ছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি মাতাল?'

শ্রীশ্রীমা—'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'

ঠাকুর—'ঠিক বলেছ', বলিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার ভক্তদিগের ঠাকুরের নিকট আগমন ও কৃপালাভের পর হইতেই ঠাকুর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুই একবার কলিকাতায় এভক্ত সেভক্তের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। নিয়মিত সময়ে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে না পারিলে এবং অন্য কাহারও মুখে তাহার কুশল-সংবাদ না পাইলে কৃপাময় ঠাকুর স্বয়ং তাহাকে দেখিতে ছুটিতেন। আবার নিয়মিত সময়ে আসিলেও, কাহাকেও কাহাকেও দেখিবার জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার মন, কোন বিশেষ কারণে চঞ্চল হইয়া উঠিত। তখন তাহাকেও দেখিবার জন্য ছুটিতেন। কিন্তু সর্ব্ব সময়েই দেখা যাইত, তাঁহার ঐরূপ শুভাগমন সেই সেই ভক্তের কল্যাণের জন্যই হইত। উহাতে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও স্বার্থ থকিত না। বরাহ নগরে বেণী সাহার কতকগুলি ভাল ভাড়াটিয়া গাড়ী ছিল। ঠাকুর প্রায়ই কলিকাতা আসিতেন বলিয়া তাহার সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে গাড়ী পাঠাইবে এবং কলিকাতা হইতে ফিরিতে যত রাত্রিই হউক না কেন গোলমাল করিবে না; অধিক সময়ের জন্য নিয়মিত হারে অধিক ভাড়া পাইবে। প্রথমে মথুর বাবু, পরে পানিহাটির মণি সেন, পরে শম্ভু মল্লিক এবং তৎপরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী যদু মল্লিক ঠাকুরের ঐ সকল গাড়ীভাড়ার খরচ যোগাইতেন। তবে যাহার বাটীতে যাইতেন, পারিলে, সেদিনকার গাড়ীভাড়া তিনিই দিতেন।

আজ ঠাকুর ঐরূপে কলিকাতায় যাইবেন—যদু মল্লিকের বাটীতে। মল্লিক মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন—তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন; কারণ, অনেক দিন তাঁহাদের কোন সংবাদ পান নাই। ঠাকুরের আহারাদি হইয়া গিয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু অ—কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর অ—কে দেখিয়াই কুশল প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন, 'তা বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। আমি আজ যদু মল্লিকের বাড়ীতে যাচ্ছি;

অমনি তোমাদের বাড়ীতেও নেবে একবার গি—কে দেখে যাব; সে কাজের ভিড়ে অনেক দিন এদিকে আস্‌তে পারে নি। চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।' অ—সম্মত হইলেন। অ—র তখন ঠাকুরের সহিত নূতন আলাপ, কয়েকবার মাত্র নানা স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। অদ্ভুত ঠাকুরের, আমরা যাহাকে তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য বা দর্শনাযোগ্য বস্তু ও ব্যক্তি বলি, সে সকলকে দেখিয়াও যে ঈশ্বরোদ্দীপনায় ভাবসমাধি যেখানে সেখানে যখন তখন উপস্থিত হইয়া থাকে, অ-তাহা তখনও সবিশেষ জানিতে পারেন নাই।

এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। যুবক ভক্ত লাটু, যিনি এখন স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে সকলের পরিচিত, ঠাকুরের বেটুয়া, গামছাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; আমাদের বন্ধু অ—ও উঠিলেন। গাড়ীর একদিকে ঠাকুর বসিলেন এবং অন্যদিকে লাটু মহারাজ ও অ—বসিলেন। গাড়ী ছাড়িল এবং ক্রমে বরাহ নগরের বাজার ছাড়াইয়া মতিঝিলের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটিল না। ঠাকুর রাস্তায় এটা ওটা দেখিয়া খন কখন বালকের ন্যায় লাটু বা অ—কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; অথবা একথা সেকথা তুলিয়া সাধারণ সহজ অবস্থায় যেরূপ হাস্য পরিহাসাদি করিতেন, সেইরূপ করিতে করিতে চলিলেন।

মতিঝিলের দক্ষিণে একটি সামান্য বাজার গোছ ছিল; তাহার দক্ষিণে একখানি মদের দোকান, একটি ডাক্তারখানা এবং কয়েকখানি খোলার ঘরে চালের আড়ৎ, ঘোড়ার আস্তাবল ইত্যাদি ছিল। ঐ সকলের দক্ষিণেই এখানকার প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ দেবীস্থান ৺ সর্ব্বমঙ্গলা ও ৺ চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যাইবার প্রশস্ত পথ ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথটিকে দক্ষিণে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

মদের দোকানে অনেকগুলি মাতাল তখন বসিয়া সুরাপান ও গোলমাল হাস্য পরিহাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার আনন্দে গান ধরিয়াছিল; আবার কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেও ব্যাপৃত ছিল। আর দোকানের স্বত্বাধিকারী, নিজ ভৃত্যকে তাহাদের সুরা বিক্রয় করিতে লাগাইয়া আপনি দোকানের দ্বারে অন্যমনে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কপালে বৃহৎ এক সিন্দুরের ফোঁটাও ছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের গাড়ী

দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। দোকানী বোধ হয় ঠাকুরের বিষয় জ্ঞাত ছিল; কারণ, ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

গোলমালে ঠাকুরের মন দোকানের দিকে আকৃষ্ট হইল; এবং মাতালদের ঐরূপ আনন্দপ্রকাশ তাঁহার চক্ষে পড়িল! কারণানন্দ দেখিয়াই অমনি ঠাকুরের মনে জগৎকারণের আনন্দ-স্বরূপের উদ্দীপনা!—খালি উদ্দীপনা নহে, সেই অবস্থায় অনুভূতি আসিয়া ঠাকুর একেবারে নেশায় বিভোর, কথা এড়াইয়া যাইতেছে! আবার শুধু তাহাই নহে, সহসা নিজ শরীরের কিয়দংশ ও দক্ষিণ পদ বাহির করিয়া গাড়ীর পাদানে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাতালের ন্যায় তাহাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হচ্চে, খুব হচ্চে, বা, বা, বা!"

অ—বলেন, "ঠাকুরের যে সহসা ঐরূপ ভাব হইবে, ইহার কোন আভাষই পূর্ব্বে আমরা পাই নাই, বেশ সহজ মানুষের মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তার পর মাতাল দেখিয়াই একেবারে হঠাৎ ঐ রকম অবস্থা! আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট; তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে ধরিয়া গাড়ীর ভিতর তাঁহার শরীরটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইব, ভাবিয়া হাত বাড়াইয়াছি, এমন সময় লাটু বাধা দিয়া বলিল, 'কিছু করতে হবে না, উনি আপনা হতেই সামলাবেন, পড়ে যাবেন না!' কাজেই চুপ করিলাম, কিন্তু বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল; আর ভাবিলাম, এ পাগ্লা ঠাকুরের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি। আর কখনও আসিব না। অবশ্য এত কথা বলিতে যে সময় লাগিল, তদপেক্ষা ঢের অল্প সময়ের ভিতরেই ঐ সব ঘটনা হইল এবং গাড়ীও ঐ দোকান ছাড়াইয়া চলিয়া আসিল। তখন ঠাকুরও পূর্ব্ববৎ গাড়ীর ভিতরে স্থির হইয়া বসিলেন এবং ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ঐ সর্ব্বমঙ্গলা, বড় জাগ্রত ঠাকুর, প্রণাম কর,' বলিয়া স্বয়ং প্রণাম করিলেন, আমরাও তাঁহার দেখা দেখি দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া ঠাকুরের দিকে দেখিলাম—যেমন তেমনি, বেশ প্রকৃতিস্থ। মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমার কিন্তু 'এখনি পড়িয়া গিয়া একটা খুনোখুনি ব্যাপার হইয়াছিল আর কি', ভাবিয়া সে বুক ঢিপ্ ঢিপানি অনেকক্ষণ থামিল না!

"তার পর গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া লাগিলে, আমাকে বলিলেন, 'গি—বাড়ীতে আছে কি? দেখে এস দেখি।' আমিও জানিয়া আসিয়া বলিলাম, 'না।' তখন বলিলেন—'তাই তো গি—র সঙ্গে দেখা হ'ল না; ভেবেছিলাম, তাকে আজকের বেশী ভাড়াটা দিতে বল্‌ব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানা শুনা হয়েছে বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান? যদু মল্লিক কৃপণ লোক; সে, সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশী গাড়ীভাড়া কখনও দেবে না। আমার কিন্তু বাবু একে ওকে দেখে ফির্‌তে কত রাত হবে তা কে জানে? বেশী দেরী হলেই আবার গাড়োয়ান 'চল, চল' করে দিক্ করে। তাই বেণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, ফিরতে যত রাতই হোক্ না কেন, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোল কর্‌বে না। যদু দু টাকা চার আনা দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই, আজকের ভাড়ার আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বলছি।' আমি ঐ সব শুনে, একটা টাকা লাটুর হাতে দিলাম এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। ঠাকুরও যদু মল্লিককে দেখিতে গেলেন।"

ঠাকুরের এইরূপ বাহ্যদৃষ্টে মাতালের ন্যায় অবস্থা তো নিত্যই যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার কয়টা কথাই বা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে বলিতে পারি! যাক্ এখন ওকথা, আমরা পূর্ব্ব কথারই অনুসরণ করি।

রাসমণির কালীবাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যত সাধু সাধক আসিতেন, তাঁহাদের কথা ঠাকুর ঐরূপে অনেক সময় অনেকের কাছেই গল্প করিতেন; খালি যে আমাদের কাছেই করিয়াছেন, তাহা নহে। ঐ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার এখনও অনেক লোক জীবিত। তবে আমরা তখন সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজে পাঠ করি। সপ্তাহে বৃহস্পতি বার ও রবিবার, দুই দিন কলেজ বন্ধ থাকিত। শনি ও রবিবারে ঠাকুরের নিকট অনেক ভক্তের ভিড় হইত বলিয়া আমরা বৃহস্পতি বারেও তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উহাতে তাঁহার জীবনের নানা কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার বেশ সুবিধা হইত। ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী তোতাপুরি স্বামীজি, মুসলমান গোবিন্দ—যিনি কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন, পূং নির্ব্বিকল্প ভূমিতে ছয় মাস থাকিবার সময় জোর করিয়া আহার করাইয় ঠাকুরের শরীর রক্ষা করিবার জন্য যে সাধুটি দৈবপ্রেরিত হইয়া কালী

বাটীতে আগমন করেন এবং ঐরূপ আরও দুই একটি ছাড়া নানা সম্প্রদায়ের অপর যত সাধু সাধক সকল দলে দলে তখন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক জীবনালোকের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম্ম-জীবনে নবপ্রাণ-সঞ্চার লাভের জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং তল্লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া ঐ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু সাধক সকলকে সেই সেই পথ দিয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে, তাহাই দেখাইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিখিতেই আসিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পূর্ণ করিয়া যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তোতাপুরি প্রভৃতিও বহুভাগ্যে ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনের সহায়ক স্বরূপে আগমন করিলেও নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে এত কাল ধরিয়া সাধনেও যে সকল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও শক্তিবলে সে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন!

আবার এই সকল সাধু ও সাধকদিগের দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আগমনের ক্রম বা পারম্পর্য্য আলোচনা করিলে আর একটি বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। তাঁহাদের ঐরূপ আগমনক্রমের কথা আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঠাকুরের শ্রীমুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই ভাবে, যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায়, তিনি যেমন করিয়া ঐ সকল কথা আমাদের বলিয়াছিলেন, সেই প্রকারে ঐ সকল কথা পাঠককে বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি এক এক ভাবের উপাসনা ও সাধনে লাগিয়া ঈশ্বরের ঐ ঐ ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যেমন যেমন করিতেন, অমনি সেই সেই সম্প্রদায়ের যথার্থ সাধকেরা সেই সেই সময়ে দলে দলে তাঁহার নিকট কিছু কাল ধরিয়া আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত ঠাকুরের ঐ ঐ ভাবের আলোচনায় তখন তখন দিবারাত্রি কাটিয়া যাইত! রামমন্ত্রের উপাসনায় যাই সিদ্ধি লাভ করিলেন, অমনি দলে দলে রামাইত সাধুরা তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত দাস্যাদি এক একটি ভাবে যেমন যেমন সিদ্ধি লাভ করিলেন, অমনি সেই সেই ভাবের সাধকদিগের আগমন হইতে লাগিল!

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়ে চৌষট্টিখানা তন্ত্রোক্ত সকল সাধন যখন সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেন বা শক্তিসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন, অমনি সে সময়ের

এ প্রদেশের যাবতীয় বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক সকল তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন! পুরি গোস্বামীর সহায়ে অদ্বৈতমতের ব্রহ্মোপাসনা ও উপলব্ধিতে যেমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, অমনি পরমহংস সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধকেরা তাঁহার সমীপে দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন!

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধককুলের ঐ ভাবে ঐ ঐ সময়ে ঠাকুরের দেবসঙ্গ লাভ করিবার যে একটা বিশেষ গূঢ় অর্থ আছে তাহা বালকেরও বুঝিতে দেরী লাগিবে না। যুগাবতারের শুভাগমনে জগতে সর্ব্বকালই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইবে। তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় নিয়মানুসারে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য বা নির্ব্বাপিতপ্রায় ধর্ম্মালোককে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সর্ব্ব কালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের জীবনালোচনায় তাঁহাদের ভিতরেও অল্পাধিক পরিমাণে শক্তি প্রকাশের তারতম্য দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কেহ বা কোন প্রদেশ-বিশেষের বা দুই চারিটি সম্প্রদায়-বিশেষের অভাব মোচনের জন্য আগমন করিয়াছেন—আবার কেহ বা সমগ্র পৃথিবীরই ধর্ম্মাভাব মোচনের জন্য শুভাগমন করিয়াছেন! কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি, আচার্য্য, ও অবতারকুলের দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত আধ্যাত্মিক মত সকলের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিয়া, সে সকলকে বজায় রাখিয়া, তাঁহাদের আবিষ্কৃত উপলব্ধি ও মতের প্রচার করিয়াছেন, দেখা গিয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের দিব্যযোগশক্তিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের আধ্যাত্মিক মত সকলের ভিতর একটা পারম্পর্য্য ও সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া থাকেন। আমাদের বিষয় মলিন দৃষ্টির সম্মুখে ভাবরাজ্যের সে ইতিহাস, সে সম্বন্ধ সর্ব্বথা অপ্রকাশিতই থাকে। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মমত সকলকে 'সূত্রে মণিগণাইব,' এক সূত্রে গাঁথা দেখিতে পান এবং নিজ ধর্ম্মোপলব্ধি সহায়ে সেই মালার অঙ্গই সম্পূর্ণ করিয়া যান। বৈদেশিক ধর্ম্মমত সকলের আলোচনায় এ বিষয়টি আমরা বেশ-স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। দেখ, য়্যাহুদি আচার্য্যেরা যে সকল ধর্ম্মসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ঈশা আসিয়া সে সকল বজায় রাখিয়া নিজোপলব্ধ সত্য সকল প্রচার করিলেন। আবার কয়েক শতাব্দী পরে মহম্মদ আসিয়া ঈশাপ্রচারিত মতসকল বজায় রাখিয়া নিজ মত প্রচার করিলেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, য়্যাহুদি আচার্য্যগণ বা ঈশা-প্রচারিত মত অসম্পূর্ণ, বা ঐ ঐ মতাবলম্বনে চলিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে

ঈশ্বরের যে ভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা করা যায় না। তাহা নিশ্চয়ই করা যায়; আবার মহম্মদ-প্রচারিত মতাবলম্বনে চলিয়া তিনি যে ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাও করা যায়। ভারতীয় ধর্ম্ম-মত সকলের মধ্যেও ঐরূপ ভাব বুঝিতে হইবে। ভারতের বৈদিক ঋষি, পুরাণকার এবং তন্ত্রকার আচার্য্য মহাপুরুষেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যেটি যেটি ঠিক ঠিক অবলম্বন করিয়া তুমি চলিবে, সেই সেই পথ দিয়াই ঈশ্বরের তত্তদ্ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহাই নিয়ম। ঠাকুর একাদিক্রমে সকল সম্প্রদায়োক্ত মতে সাধনায় লাগিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ইহাই আমাদের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আসিয়া জুটে—আধ্যাত্মিক জগতেও যে ইহাই নিয়ম, ঠাকুর সে কথা আমাদের বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন। ঐ নিয়মেই, অবতার মহাপুরুষদিগের জীবনে যাই সিদ্ধিলাভ বা আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ব্ব প্রচারিত বা স্বশক্তিতে আবিষ্কৃত সত্যোপলব্ধি, অমনি উহা জানিবার, শিখিবার জন্য ধর্ম্মপিপাসুগণের তাঁহাদিগের নিকট আকর্ষিত হওয়া—ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের নিকটে একই সম্প্রদায়ের সাধককুল না আসিয়া যে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরাই দলে দলে আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি তত্তৎ সকল পথ দিয়াই অগ্রসর হইয়া তত্তৎ ঈশ্বরীয় ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথের সংবাদ বিশেষরূপে বলিতে পারিতেন বলিয়া। তবে ঐ সকল সাধকদিগের সকলেই যে নিজ নিজ মতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাদের ভিতর যাঁহারা বিশিষ্ট, তাঁহারাই উহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই ঠাকুরের দিব্যসঙ্গগুণে নিজ নিজ পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ঐ পথ দিয়া চলিলে যে কালে ঈশ্বরকে লাভ করিবেন নিশ্চয়, ইহা ধ্রুবসত্যরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজ নিজ পথের উপর ঐরূপ বিশ্বাসের হানি হওয়াতেই যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সাধক নিজ জীবনে ধর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে না, ইহা আর বলিতে হইবে না।

আজ কাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, ঠাকুর ঐ সকল সাধুদের নিকট হইতেই ঈশ্বর-সাধনার উপায় সকল জানিয়া লইয়া স্বয়ং উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং তপস্যার কঠোরতায় এক সময়ে সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছিলেন!

তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং কোনরূপ ভাবের আতিশয্যে বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হওয়া রূপ একটা শারীরিক রোগও চিরকালের মত তাঁহার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল! হে ভগবান্!—এমন পণ্ডিতমূর্খের দলও আমরা! পূর্ণ চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে সমাধিভূমিতে আরোহণ করিলেই যে সাধারণ বাহ্য-চৈতন্যের লোপ হয়, একথা ভারতের ঋষিকুল বেদ, পুরাণ তন্ত্রাদি সহায়ে আমাদের যুগে যুগে বুঝাইয়া আসিলেন ও নিজ নিজ জীবনে উহা দেখাইয়া যাইলেন, সমাধি-শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা—যাহা পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতির ভিতরেই বিদ্যমান নাই—আমাদের জন্য রাখিয়া যাইলেন; সংসারে এ পর্য্যন্ত অবতার বলিয়া সর্ব্বদেশে মানব-হৃদয়ের শ্রদ্ধা পাইতেছেন যত মহাপুরুষ তাঁহারাও নিজ নিজ জীবনে অনুভূতি করিয়া ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানলোপটা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত অবশ্যম্ভাবী, সে কথা আমাদের ভূয়োভূয়ঃ বুঝাইয়া যাইলেন—তথাপিও যদি আমরা ঐ কথা বলি এবং ঐরূপ কথা শুনি, তবে আর আমাদের দশা কি হইবে? হে পাঠক! ভাল বুঝ তো তুমি ঐ সকল অন্তঃসারশূন্য কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর; তোমার এবং যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহাদের মঙ্গলই হউক!—আমাদের কিন্তু এ অদ্ভুত দিব্য পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবার স্বাধীনতাটুকু কৃপা করিয়া প্রদান করিও, ইহাই তোমার নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বা ভিক্ষা। কিন্তু যাহা হয় একটা স্থির নিশ্চয় করিবার অগ্রে ভাল করিয়া আর একবার বুঝিয়া দেখিও; প্রাচীন উপনিষদ্‌কার যেমন বলিয়াছেন, সেরূপ অবস্থা তোমার না আসিয়া উপস্থিত হয়!—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ন্ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ॥

ঠাকুরের ভাবসমাধিসমূহকে রোগবিশেষ বলাটা আজ কিছু নূতন কথা নহে। তাঁহার বর্ত্তমান কালে, পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অনেকে ওকথা বলিতেন। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং এ দিব্য পাগলের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে উচ্চারিত পাগলামিগুলি যতই পূর্ণ হইতে এবং তাঁহার জগৎছাড়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবগুলি পৃথিবীময় যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ও সাধারণে তাহা যতই সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল, ততই ও কথাটার আর জোর থাকিল না। চন্দ্রে ধূলি নিক্ষেপের যে ফল হয়, তাহাই হইয়া লোকে ঐ সকল ভ্রান্ত উক্তির সম্যক্ পরিচয় পাইয়া স্থির হইয়া রহিল। এখনও তাহাই হইবে। কারণ,

সত্য অগ্নির ন্যায় কখনও বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা যায় না। অতএব ঐ বিষয়ে আর আমাদের বুঝাইবার প্রয়াসের আবশ্যক নাই। ঠাকুর নিজেই ঐ সম্বন্ধে যে দু একটি কথা বলিতেন, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের ভাবসমাধিটা স্নায়ুবিকার প্রসূত রোগবিশেষ (Hysteria or epileptic fits) বলিয়া তখন হইতেই আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নির্দ্দেশ করিতেন এবং ঐ সঙ্গে এরূপ মতও প্রকাশ করিতেন যে,ঐ সময়ে ঠাকুর, ইতর সাধারণে ঐ রোগগ্রস্ত হইয়া যেমন অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ হইয়া যান! ঠাকুরের কর্ণে ক্রমে সে কথা উঠে। শাস্ত্রী মহাশয় বহুপূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত আছেন, তখন ঠাকুর ঐ কথা উত্থাপিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেন—"হ্যাঁ শিবনাথ! তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে, ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট্, কাট, মাটি, টাকা, কড়ি এই সব জড় জিনীসগুলোতে দিন রাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিন রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হব--এটা কি কখন হতে পারে? এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার?" শিবনাথ বাবু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর দিব্যোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ, এ সকল কথার ত আমাদের নিকট নিত্য প্রয়োগ করিতেন এবং মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিতেন যে, তাঁহার জীবনে বার বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বলিতেন—"ঝড়ে ধূলো উড়ে যেমন সব একাকার দেখায়, এটা আম গাছ ওটা কাঁটাল গাছ বলে বুঝা দূরে থাক্, দেখাও যায় না, সেই রকমটা হয়েছিল রে; ভাল, মন্দ, নিন্দা, স্তুতি, শৌচ, অশৌচ এ সকলের কোনটাই বুঝতে দেয় নি! কেবল এক চিন্তা, এক ভাব—কেমন করে তাঁকে পাব—এইটেই মনে সদা সর্ব্বক্ষণ থাকত! লোকে বোলতো—পাগল হয়েছে!" যাক্ এখন সে কথা, আমরা পূর্ব্বানুসরণ করি।

দক্ষিণেশ্বরে তখন তখন যে সকল সাধক পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর কেহ কেহ আবার ভক্তির আতিশয্যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস পর্য্যন্ত লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত

নারায়ণ শাস্ত্রী উঁহাদেরই অন্যতম। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রাচীন যুগের নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসর স্বাধ্যায় বা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ষড়্দর্শনের সকলগুলির উপরই সমান অভিজ্ঞতা ও আধিপত্য লাভ করিবার প্রবল বাসনা বরাবর তাঁহার প্রাণে ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে নানা গুরুগৃহে বাস করিয়া পাঁচটি দর্শন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের অধীনে ন্যায়দর্শনের পাঠ সাঙ্গ না করিলে, ন্যায়দর্শনে পূর্ণাধিপত্য লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মধ্যে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব; এজন্য, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আগমন করেন এবং সাত বৎসর কাল নবদ্বীপে থাকিয়া ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করেন। এইবার দেশে ফিরিয়া যাইবেন। আবার এদিকে কখনও আসিবেন কি না সন্দেহ, এই জন্যই বোধ হয় কলিকাতা এবং তৎসন্নিকট দক্ষিণেশ্বর দর্শনে আসিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন।

বঙ্গদেশে ন্যায় পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই শাস্ত্রীজির দেশে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছি, এক সময়ে জয়পুরের মহারাজ শাস্ত্রীজির নাম শুনিয়া সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিবেন বলিয়া উচ্চহারে বেতন নিরূপিত করিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীজির তখনও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা কমে নাই এবং ষড়্দর্শন আয়ত্ত করিবার প্রবল আগ্রহও মিটে নাই। কাজেই তিনি মহারাজের সাদরাহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীর পূর্ব্বাবাস রাজপুতানা অঞ্চলের নিকটেই বলিয়া আমাদের অনুমান হয়।

এদিকে আবার নারায়ণ শাস্ত্রী সাধারণ পণ্ডিতদিগের মত ছিলেন না। শাস্ত্র জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে অল্পে অল্পে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল। কেবল পাঠ করিয়াই যে বেদান্তাদি শাস্ত্রে কাহারও দখল জন্মিতে পারে না, উহা যে সাধনের জিনীস, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেজন্য পাঠ সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক একবার মনে উঠিত—এরূপে তো ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হইতেছে না, কিছু দিন সাধনাদি করিয়া শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিব। আবার একটা বিষয় আয়ত্ত করিতে বসিয়াছেন, সেটাকে অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া সাধনাদি

করিতে যাইলে, পাছে এদিক্ ওদিক্ দুই দিক যায়, সেজন্য সাধনায় লাগিবার বাসনাটা চাপিয়া আবার পাঠেই মনোনিবেশ করিতেন। এইবার তাঁহার এতকালের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, ষড় দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; এখন দেশে ফিরিবার বাসনা। সেখানে ফিরিয়া যাহা হয় একটা করিবেন, এই কথা মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময়ে তাঁহার ঠাকুরের সহিত দেখা, এবং দেখিয়াই, কি জানি কেন—তাঁহাকে ভাল লাগা!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তখন তখন অতিথ, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের থাকিবার এবং খাইবার বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। শাস্ত্রীজি, একে বিদেশী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার সুপণ্ডিত। কাজেই তাঁহাকে যে ওখানে সসম্মানে তাঁহার যত দিন ইচ্ছা থাকিতে দেওয়া হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আহারাদি সকল বিষয়ের অনুকূল এমন রমণীয় স্থানে এমন দেবমানবের সঙ্গ!—শাস্ত্রীজি কিছু কাল এখানে কাটাইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। আর না করিয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের সহিত যতই পরিচয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি কেমন একটা ভক্তি ভালবাসার উদয় হইয়া তাঁহাকে আরও বিশেষভাবে দেখিতে জানিতে ইচ্ছা দিন দিন প্রবল প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরও সরলহৃদয় উন্নতচেতা শাস্ত্রীকে পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথায় কাটাইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রীজি বেদান্তোক্ত সপ্ত ভূমিকার কথা পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রদৃষ্টে জানিতেন, একটির পর একটি করিয়া নিম্ন হইতে উচ্চ-উচ্চতর ভূমিকায় যেমন যেমন মন উঠিতে থাকে অমনি বিচিত্র বিচিত্র উপলব্ধি ও দর্শন হইতে হইতে শেষে নির্ব্বিকল্প সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ অবস্থায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে তন্ময় হইয়া মানবের যুগযুগান্তরাগত সংসারভ্রম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। শাস্ত্রী দেখিলেন, তিনি যে সকল কথা শাস্ত্রে পড়িয়াছেন—কণ্ঠস্থ করিয়াছেন মাত্র,ঠাকুর সে সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! দেখিলেন—'সমাধি' 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি যে সকল কথা তিনি উচ্চারণমাত্রই করিয়া থাকেন, ঠাকুরের সেই সমাধি দিবারাত্রি, যখন তখন,ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে হইতেছে! শাস্ত্রী ভাবিলেন, 'এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ জানাইবার বুঝাইবার এমন লোক আর কোথায় পাইব? এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। যেরূপে হউক ইঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম-

সাক্ষাৎকার লাভের উপায় করিতে হইবে। মরণের তো নিশ্চয় নাই—কে জানে কবে এ শরীর যাইবে? ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ না করিয়া মরিব? তাহা হইবে না। একবার তল্লাভে চেষ্টাও অন্ততঃ করিতে হইবে। রহিল এখন, দেশে ফিরা।'

দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, শাস্ত্রীর বৈরাগ্য-ব্যাকুলতাও ততই ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাণ্ডিত্যে সকলকে চমৎকৃত করিব, মহামহোপাধ্যায় হইয়া সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাম যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—এ সকল বাসনা, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান হইয়া মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শাস্ত্রী যথার্থ দীনভাবে শিষ্যের ন্যায় ঠাকুরের নিকট থাকেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাক্যাবলী একচিত্তে শ্রবণ করিয়া ভাবেন—আর অন্য কোন বিষয়ে মন দেওয়া হইবে না; কবে কখন শরীরটা যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দেখিয়া ভাবেন—'আহা, ইনি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহা জানিবার, যাহা বুঝিবার, তাহা বুঝিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন!—মৃত্যুও ইঁহার নিকট পরাজিত; 'মহারাত্রির' করাল ছায়া সম্মুখে ধরিয়া ইতর সাধারণের ন্যায় ইঁহাকে আর অকূল পাথার দেখাইতে পারে না! আচ্ছা, উপনিষদ্‌কার তো বলিয়াছেন, এরূপ মহাপুরুষ সিদ্ধসংকল্প হন; ইঁহাদের ঠিক ঠিক কৃপালাভ করিতে পারিলে মানবের সংসার-বাসনা মিটিয়া যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। তবে ইঁহাকেই কেন ধরি না; ইঁহারই কেন শরণ গ্রহণ করি না?' শাস্ত্রী মনে মনে এইরূপ নানাবিধ জল্পনা করেন ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। কিন্তু পাছে ঠাকুর অযোগ্য ভাবিয়া আশ্রয় না দেন, এজন্য সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন না। এইরূপে দিন কাটিতে থাকিল।

শাস্ত্রীর মনে দিন দিন যে সংসার-বৈরাগ্য তীব্রভাব ধারণ করিতেছিল, ইহার পরিচয় আমরা নিম্নের ঘটনাটি হইতে বেশ পাইয়া থাকি। এই সময়ে রাসমণির তরপ হইতে কি একটি মকদ্দমা চালাইবার ভার, বঙ্গের কবিকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মকদ্দমার সকল বিষয় যথাযথ জানিবার জন্য তাঁহাকে রাণীর কোন বংশধরের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে আসিতে হইয়াছিল। মকদ্দমা সংক্রান্ত সকল বিষয় জানিবার পর এ কথা সে কথায় তিনি ঠাকুর এখানে আছেন

জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া হইলে ঠাকুর মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে প্রথম শাস্ত্রীকেই পাঠান এবং পরে আপনিও তথায় উপস্থিত হন। শাস্ত্রীজি মধুসূদনের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশার ধর্ম্মাবলম্বনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। মাইকেল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পেটের দায়েই ঐরূপ করিয়াছেন! মধুসূদন, অপরিচিত পুরুষের নিকট আত্মকথা খুলিয়া বলিতে অনিচ্ছুক হইয়া ঐ ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ঠাকুর এবং উপস্থিত সকলেরই মনে হইয়াছিল তিনি আত্মগোপন করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে যে ঐরূপ বলিলেন, তাহা নহে, যথার্থ প্রাণের ভাবই বলিতেছেন। যাহাই হউক, ঐরূপ উত্তর শুনিয়া শাস্ত্রীজি তাঁহার উপর বিষম বিরক্ত হন, বলেন—'কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা?—এ কি হীন বুদ্ধি! মরিতে তো এক দিন হইবেই—না হয় মরিয়াই যাইতেন!' ইঁহাকেই আবার লোকে বড় লোক বলে, এবং ইঁহার গ্রন্থ আদর করিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া শাস্ত্রীজির মনে বিষম ঘৃণার উদয় হইয়া তিনি বাক্যালাপে বিরত হন।

অতঃপর মধুসূদন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কিছু ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ঠাকুর আমাদের বলিতেন—(আমার) মুখ যেন কে চেপে ধর্‌লে—কিছু বলতে দিলে না! হৃদয় প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐ ভাব না কি চলিয়া গিয়াছিল এবং তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদিগের কয়েকটি পদাবলী মধুর স্বরে গাহিয়া মধুসূদনের মন মোহিত করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যপদেশে তাঁহাকে, ভগবদ্ভক্তিই যে সংসারে একমাত্র সার পদার্থ, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মাইকেল বিদায় গ্রহণ করিবার পরেও শাস্ত্রীজি মাইকেলের ঐরূপে স্বধর্ম্মত্যাগের কথা আলোচনা করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন, এবং পেটের দায়ে স্বধর্ম্মত্যাগ করা যে অতি হীনবুদ্ধির কাজ, এ কথা ঠাকুরের ঘরে ঢুকিবার দরজার পূর্ব্ব দিকের দালানে দেয়ালের গায়ে একখণ্ড কয়লা দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখেন! দেয়ালের গায়ে সুস্পষ্ট বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা শাস্ত্রীর ঐ বিষয়ের মনোভাব আমাদের অনেকেরই নজরে পড়িয়া আমাদিগকে কৌতূহলাক্রান্ত করিত। পরে একদিন জিজ্ঞাসায়

সকল কথা জানিতে পারিলাম। শাস্ত্রী অনেক দিন এ দেশে থাকায় বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এইবার শাস্ত্রীর জীবনের শেষ কথা। সুযোগ বুঝিয়া শাস্ত্রীজি একদিন ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন এবং নাছোড়-বান্দা হইয়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে হইবে! ঠাকুরও তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে সম্মত হইয়া শুভদিনে তাঁহাকে ঐ দীক্ষা প্রদান করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই শাস্ত্রী আর কালীবাটীতে রহিলেন না। বশিষ্ঠাশ্রমে বসিয়া সিদ্ধকাম না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টায় প্রাণপাত করিবেন বলিয়া ঠাকুরের নিকট মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন এবং সজল নয়নে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও শ্রীচরণ বন্দনান্তে চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! ইহার পর নারায়ণ শাস্ত্রীর কোনও নিশ্চিত সংবাদই আর পাওয়া গেল না!

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

ইতিপূর্ব্বেই বলেছি স্বামীজি প্রথমবার বিলাত থেকে যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক স্বামীজির নিকট যাতায়াত করিত। সেই সময় দেখা গিয়েছে, স্বামীজি অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিষয় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—সন্ন্যাস লওয়ার বিষয়ে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না কেবল তাহাই নহে,—বহুজন হিতকর, বহুজন সুখকর ঐহিক কোন কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ হয় না। তিনি সর্ব্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকগণের সমক্ষে স্থাপন করিতেন; এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সমধিক উৎসাহিত করিতেন ও কৃপা করিতেন। তাঁহার উৎসাহবাক্যে তখন কতিপয় ভাগ্যবান্ যুবক সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। ইহাদের মধ্যে স্বামীজি যে চারিজনকে প্রথম সন্ন্যাস দেন তাঁহাদের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল। সেই দিন শিষ্যের মনে এখনো জাগরূক রহিয়াছে।

ইদানীং যাঁহারা স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে সুপরিচিত তাঁহাদের সকলেই স্বামীজির নিকট ঐ দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আলমবাজার মঠে সন্ন্যাসিগণের মুখে শিষ্য শুনিয়াছে যে ইহাঁদের মধ্যে এক জনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামীজি তদুত্তরে বলেন "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধার সাধনে পশ্চাৎপদ হই তাহা হইলে ইহাদের কে দেখবে—তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।" স্বামীজির বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজি নিজ কৃপাগুণে তাহাকেও সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুদিন থেকে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন "তুইত ভটচায্ বামুন; আগামী কল্য এদের শ্রাদ্ধ করাতে হবে; পরদিন এদের সন্ন্যাস হবে। তুই কাল এদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি—আজ পাঁজি পুঁথি সব পড়ে শুনে দেখে নিস্।" শিষ্য স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বদিন সন্ন্যাস ব্রত ধারণে কৃতনিশ্চয় উক্ত ব্রহ্মচারী চতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন। গঙ্গা স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং স্বামীজির স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন।

এখানে ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে না যে যাঁহারা শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধ আপনি করিতে হয়। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে তাঁহাদের আর অধিকার থাকে না। পুত্র পৌত্রাদি কৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া সংসারের এমন কি নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদির সকল দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ সাধন করিতে হয়। ইহাকেই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিবাস ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। শিষ্য দেখিয়াছে, স্বামীজি এই সকল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্রমতে ঐ সকল ক্রিয়া কাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহা বিরক্ত হইতেন। আজ কাল যেমন গেরুয়া পরে বাহির হইলেই

অনেকে সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন, স্বামীজি সেরূপ মনে করিতেন না। গুরু পরম্পরাগত আবহমান কাল প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা সাধন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের প্রাগমুহূর্ত্তে নৈষ্ঠিক সংস্কার গুলি ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন। আরও শুনিয়াছি যে পরমহংস দেবের অপ্রকট হইবার পর তিনি সন্ন্যাস লইবার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যে সকল উপনিষদাদি শাস্ত্রে আছে সে সকল আনাইয়া স্বীয় গুরু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে একত্রে ঠাকুরের ছবির সমক্ষে বৈদিক মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলমবাজার মঠে উপর তলায় যে জলের ঘর ছিল, তাহাতে শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্য সম্ভার আনীত হইয়াছে। স্বামী নিত্যানন্দ পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া অনেক বার করিয়াছিলেন; সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাড়ের কোন বিষয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। শিষ্য স্নানান্তে স্বামীজির আদেশে পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রাদির যথাযথ পঠন পাঠন হইতে লাগিল। স্বামীজি এক একবার এসে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারী চতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড নিজ নিজ পদে অর্পণ করিয়া আজ হইতে সংসার সমক্ষে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন, শিষ্য তখন নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইল; সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইল। পিণ্ডাদি লইয়া যখন ইঁহারা গঙ্গায় চলিয়া গেলেন তখন স্বামীজি শিষ্যের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া বলিলেন "এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে?" শিষ্য নত মস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে। ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশু।"

স্বামীজির কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি গুলাইয়া গেল,—শাস্ত্র জ্ঞানাস্ফালন দূরীভূত হইল, আর ভাবিতে লাগিল কার্য্যে ও কথায় এত প্রভেদ!!!

ইতিমধ্যে কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারী চতুষ্টয় গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ - ধন্য, তোমাদের গর্ভধারিণী।" "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

সেই দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজি কেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম বিষয়েই কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

উপস্থিত সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে উপলক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বল্‌ছে—এ সংসারও কর্‌বো, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদবেই নিবিনি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে—এতটুকু কামনা যার রয়েছে—এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয়, তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায় 'একূল ওকূল দুকূল রেখে চল্‌তে হবে।' ও সব পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ—অশাস্ত্রীয়—অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভও হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শিষ্য—মহাশয় শাস্ত্রেও দেখতে পাই এ কথা বল্‌ছে—"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"।

স্বামীজি—এ সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কাহারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়ে থাকতেই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রহিয়াছে, ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাক্‌বে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয় অর্থের দাস—নয়—মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়্‌লে তবে ত মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যত কেন না বলিস্—আমি বুঝেছি, এ সব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে—সন্ন্যাস গ্রহণ না কর্‌লে—কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য—সন্ন্যাস নিলেই কি সিদ্ধ হয়?

স্বামীজি—সিদ্ধি হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়্‌তে পার্‌ছিস্—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়্‌তে পার্‌ছিস্—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য—সন্ন্যাসের কি কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে?

স্বামীজি—সন্ন্যাসধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বল্‌ছেন "যদহরের

বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ” যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা কর্‌বে। তোর বাশিষ্ঠেও রয়েছে—

“যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।”

জীবনের অনিত্যতা বশতঃ যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হইবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়। (১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) মর্কট সন্ন্যাস, এবং (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ বৈরাগ্য হলো; তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এটী প্রাগ্‌জন্মসংস্কার না থাক্‌লে হয় না। তার পর আত্মতত্ত্ব জান্‌বার প্রবল বাসনা থেকে—শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন কত্তে লাগ্‌লো—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়নায় স্বজন-বিয়োগে বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম মর্কট সন্ন্যাস। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন “বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকুরী বাগিয়ে নিলে; তার পর চাই কি পরিবার আন্‌লে বা আবার বে করে ফেল্লে।” আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে—যেমন মুমূর্ষু রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচিবার আশা নাই। তখন তাকে সন্ন্যাস দিবে। মরে ত পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল। পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হয়। আর যদি বেঁচে যায় ত তার আর গৃহে যাইবার অধিকার নাই। যেমন তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী আতুর সন্ন্যাস দিয়েছিল! সে মরে গেল; কিন্তু এই সন্ন্যাস গ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে।

শিষ্য—তা হলে কি বুঝতে হবে, সন্ন্যাস না নিলে আর আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই।

স্বামীজি—তা আর একবার বল্‌তে?

শিষ্য—গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজি—সুকৃতি বশতঃ কোন না কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবেই হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার ওপারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু একটা Exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম্ম পালন করেও দু একটী মুক্ত পুরুষ হ'তে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে নাগ মহাশয়।

শিষ্য—এই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও তেমন উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

. স্বামীজি—পাগলের মত কি বলছিস্। এই বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্ জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে কি জানিস্—আমার বিশ্বাস—ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগ ব্রত আর বৈরাগ্য ও বিষয়-বিতৃষ্ণাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ত্যাগ বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম্ম Absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে। ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায় নি।

শিষ্য—তবে কি বুঝ্‌তে হবে, বুদ্ধদেবের জন্মাবার আগে দেশে ত্যাগ বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল—সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজি—তা কে বল্‌লে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, বৈরাগ্য-দার্ঢ্য ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়েও শান্তি পেলেন না। তার পর "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" ব'লে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিজেই ব'সে পড়লেন্। প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষে এই যে সব সন্ন্যাসীদের মঠ ফঠ দেখতে পাচ্ছিস্—এ সব বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধিকারে ছিল—হিন্দুরা এখন তাদের রঙ্গে রঙ্গিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান্ বুদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালাস্থিতে প্রাণসঞ্চার ক'রে গেছেন।

এই সময় স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বল্‌লেন "বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।" স্বামীজি বল্‌ছেন "তোর মন্বাদি সংহিতা কি ভারতাদি পুরাণ ত সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান্ বুদ্ধ তার ঢের আগে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বল্‌ছেন "তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে, বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকতো; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা দেখা যায় না—তখন তুমি কি করে বল্‌বে বুদ্ধদেব তাঁর আগেকার লোক। যদিও দু চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে—তা দেখে এরূপ বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।"

স্বামীজি—History (ইতিহাস) পড়ে দেখ্ না। দেখতে পাবি, তোর হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি Absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ—আমি বলি, হিন্দুধর্ম্মের ভাবগুলিই বুদ্ধদেব, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা সজীব করে গেছেন মাত্র। এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

স্বামীজি—তা যাই বলিস্, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার ত তোদের কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। History (ইতিহাস) যদি Authority (প্রমাণ) বলে মান্‌তে হয় তো পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান্ বুদ্ধদেবই জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন, দেখতে পাবি।

রামকৃষ্ণানন্দ—তা বল্‌তে পার। কিন্তু বেদ উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণাদিই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বলে ধরা চল্‌তে পারে। এ সকলকে Mythology (মিথ্যা কাহিনী) বল্‌লে সব দেশের ধর্ম্মগ্রন্থকেই ঐরূপ বলা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের কথা হ'তে হ'তে পুনরায় সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রসঙ্গ চল্‌তে লাগ্‌লো। স্বামীজি বললেন "তা যেখানেই এর Origin (উৎপত্তি) হো'ক, মানব-জন্মের Goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে, এই ত্যাগব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া, এই সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। যাদের এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে—সংসার-বিষয়ে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য—মশায়,আজ কাল অনেকে এরূপ ব'লে থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসী-দের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির ক্ষতি হয়েছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হয়ে এই সকল সাধুরা নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘুরে বেড়ান ব'লে এঁরা বলেন, উঁহারা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়কারী হন না।

স্বামীজি—লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানেটা কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্?

শিষ্য—পাশ্চাত্য যেমন বিদ্যা সহায়ে, দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞান সহায়ে দেশে বাণিজ্য, শিল্প, পোষাক পরিচ্ছদ, রেল টেলিগ্রাফ, নানা বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতেছে সেইরূপ করা।

স্বামীজি—মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হ'লে এসব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও ত রজোগুণের বিকাশ নাই। কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে সকল পড়ে রয়েছে। এই যে সব সন্ন্যাসী দেখছিস্, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড। যথার্থ সন্ন্যাসী, গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের

উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়ে গৃহীরা ঠিক ঠিক জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হতে পারে। ধরে নিলুম, আমাদের উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা আমাদিগকে অন্নবস্ত্র দেয়। এ আদান প্রদান না থাক্‌লে এতদিন ভারতবর্ষের লোক এমেরিকার Indians (আদিম নিবাসীদের) মত Extinct (উজাড়) হয়ে যেত। আমাদের দুমুঠো খেতে দেয় বলে এখনো উন্নতির পথে যাচ্ছে। আমরা কর্ম্মহীন নই। আমরাই কর্ম্মের Fountain head (উৎস)। আমাদের Ideas (উচ্চ ভাব সকল) নিয়েই গৃহীরা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হচ্ছে। এই পবিত্র সন্ন্যাস Institution (ধর্ম্মানুষ্ঠান) থেকে ও আমাদের পবিত্র ভাব থেকেই মানুষ ঠিক ঠিক কর্ম্মতৎপর হচ্ছে। তোরা গৃহী; ভাবছিস্ বুঝি আমাদের উপদেশ না পেলে তোরা একদিনও চল্‌তে পাত্তিস্। আমরা নিজ জীবনে ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিফলিত করে তোদের সব বিষয়ে উৎসাহিত কর্‌ছি। তার বিনিময়ে তোরা দু'মুটো অন্ন দিচ্ছিস্। সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের স্নেহাশীর্ব্বাদেই তোদের বর্দ্ধিত হচ্ছে। যে দেশে সন্ন্যাস Institution (পদ্ধতি) নাই সে দেশ ও সে জাতি ধ্বংসমুখে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা হাল ধরে আছি; তাই তোদের সংসারসাগরে নৌকা ডুবছে না। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—মহাশয়, আপনার মত কর্ম্মতৎপর সন্ন্যাসী কয় জন দেখতে পাওয়া যায়?

স্বামীজি—হাজার বৎসর পরে একটা বিবেকানন্দ আসে ত ভরপুর। সে যে সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবে, তা তার জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে নিয়ে চল্‌বে। এই সন্ন্যাস Institution (পদ্ধতি) ছিল বলেই বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছে। দোষ সব আশ্রমেই আছে—তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এই আশ্রম সকলাশ্রমের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ও থাক্‌বে। আমরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করি—তোদের ভাল কত্তেই আমাদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হোস্ ত তোদের ধিক্—শত ধিক্।

বলিতে বলিতে স্বামীজির মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নয়নে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরব প্রসঙ্গে স্বামীজি যেন শতসিংহপরাক্রমদীপ্ত মূর্ত্তিমান্ সন্ন্যাসরূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

এইবার তামাক খেতে খেতে স্বামীজি কথঞ্চিৎ সাম্যভাব ধারণ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় আমাদের জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যারা এই Ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—"বৃথৈব তস্য জীবনং"। পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগণভেদী ক্রন্দন নিবারণ কত্তে, বিধবার অশ্রু মুছাইতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান কত্তে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী কত্তে—শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত কত্তে—আমাদের জন্ম হয়েছে। আমরা বুঝি তেমনি সন্ন্যাসী ঠাওরেছিস। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" আমাদের জন্ম। কি কচ্চিস ব'সে ব'সে? ওঠ—জাগ—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—"উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

শ্রীশ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।]

(৩)

ভিত্তি দৃঢ় না হইলে মজবুত বাটী নির্ম্মাণ করা চলে না। যে বৃক্ষ-মূল যত শক্ত ও যত ভূগর্ভমধ্যে প্রবেশ করে, সে বৃক্ষ তত ঝড় জল সহ্য করিতে পারে। দার্শনিক মত সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যে মতের মূল যত দৃঢ় ও দুরব্যাপী হয়, সে মত তত প্রতিপক্ষের পরাক্রম পরাভব করিতে পারে। গ্রন্থকার শ্রীনিবাস দাস এক্ষণে সেই দিকে অধিক মনো-যোগী। তাঁহার গ্রন্থপাঠে বেশ বুঝা যায়, তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভ

হইতেই ঐ সম্বন্ধে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় উপলক্ষ করিয়া প্রমা ও প্রমাণের লক্ষণ বিচার সম্বন্ধে যেরূপ সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন দেখা যায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলোচনাকালে তদপেক্ষা অধিক সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার টীকাকারও তাঁহার আশয় এ স্থলে অতি দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এক্ষণে সেই বিষয়টীই আলোচনা করিব। প্রথম প্রত্যক্ষের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক।

রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ এইঃ—যাহার সাহায্যে জ্ঞান হয়, তাহা যখন ঠিক ঠিক বিষয় সহ সংযুক্ত হয়, অন্য কিছুর সাহায্য গ্রহণ করে না, তখন তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত। সুতরাং যে সকল বিষয়ের ইন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান হইবার কথা, তাহাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-পদবাচ্য হইবে। মুক্ত ও নিত্য জীবের এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য প্রয়োজন নাই। সে জন্য তাহাকে ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয় না। পরন্তু যে দিব্যশক্তি-বলে তাঁহাদের ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই শক্তি ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকে রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে বলিয়াই সাধারণতঃ বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। রামানুজ মতবাদীরা বলেন, এইজন্যই অপরাপর মতে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার কেবল সেই কথা বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিলেন না, মুক্ত জীব ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পর্য্যন্ত গ্রন্থোক্ত লক্ষণের মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। আবার ঐরূপ করাতে রামানুজ মতে ঈশ্বর প্রভৃতির প্রত্যক্ষের সহিত যে বদ্ধজীবের অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণের সহিত গোল বাধিল, তাহাও নহে। কারণ, অন্য কিছুর সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানই এ মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। অতএব অনুমান দ্বারা অথবা বিশ্বাসী ব্যক্তির বাক্য শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল ; কারণ, এই সকল স্থলে ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কিছুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া তবে জ্ঞান হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় কিরূপে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার কালে আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়,

মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয় অর্থ বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। এই ইন্দ্রিয়গণের এমন একটী ক্ষমতা আছে যে, উহারা যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। আলোকরশ্মি যেমন কোন বস্তুর উপর পড়িয়া তাহাকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাদের মতে আত্মজ্যোতিঃও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আসিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত বিষয়কে প্রকাশিত করে।

এইবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ আলোচ্য। ইহাদের ঐ বিভাগ কার্য্যেও বেশ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া নিম্নে উহার একটী চিত্র প্রদান করিলাম। যথা—
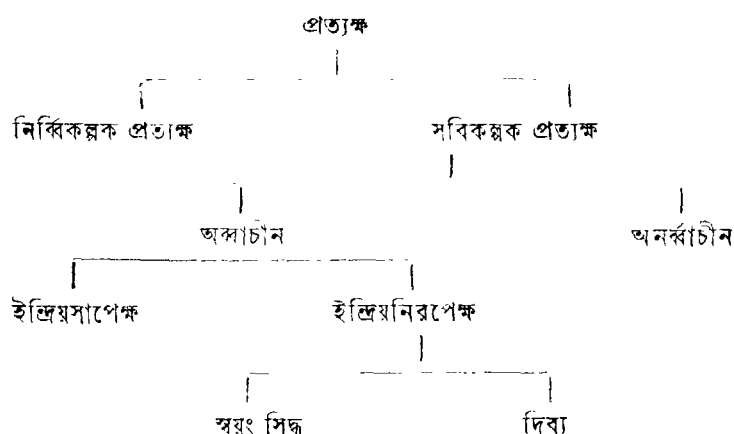
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ; যথা—

নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ তৎপরে আবির্ভূত হয়। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ না হইলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে না। যাহা হউক, এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ আবার দ্বিবিধ, যথা—অর্ব্বাচীন ও অনর্ব্বাচীন। অর্ব্বাচীন আবার দ্বিবিধ, যথা ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ ও ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ। ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ আবার দ্বিবিধ ; যথা - স্বয়ংসিদ্ধ ও দিব্য। ইহাদের মধ্যে যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ অর্ব্বাচীন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান (টেবিল দেখুন), তাহাই যোগিজন লাভ করিয়া থাকেন ; এবং যাহা ঐ জাতীয় দিব্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা ভগবৎপ্রসাদে জীবের ভাগ্যে ঘটিতে পারে।

ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ অর্ব্বাচীন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল জীবেরই সম্পত্তি। কিন্তু যাহা অনর্ব্বাচীন সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহা মুক্ত ও নিত্য জীব এবং ভগবানেরই নিজস্ব সম্পত্তি। বদ্ধজীবের উহা হওয়া সম্ভব নহে। এমন কি, সাধারণ যোগীদিগেরও ইহা হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক শব্দ দুইটীর অর্থ কি? বাস্তবিক ইহাদের অর্থবোধ না হইলে অতঃপর অগ্রসর হওয়া বড় সুবিধাজনক নহে। 'বিকল্প' শব্দ দ্বারা নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক এই পদ দুইটী গঠিত হইয়াছে। বিকল্প যাহাতে আছে, তাহা সবিকল্পক এবং বিকল্প যাহাতে নাই, তাহা নির্ব্বিকল্পক। সুতরাং 'বিকল্প' শব্দের অর্থ বুঝিলে ঐ দুইটী শব্দেরও অর্থ বোধ হইবে। অভিধানে দেখা যায়, বিকল্প শব্দে—সংশয়, বিভিন্ন কল্পনা, বিবিধ কল্পনা ও বিশেষ ইত্যাদি অর্থ বুঝায়। বস্তুতঃ একটু ভাবিয়া দেখিলে ঐ চারিটী অর্থই এক সূত্রে গাথা। সে সূত্রটী "তুলনা"। কোন একটা কিছু দেখিয়া তাহা আমার পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান ঐ চারিটী অর্থের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সূত্র ব্যতীত যেমন মালা গাঁথা হয় না, তদ্রূপ তুলনা না করিয়া সংশয় বা বিবিধ জ্ঞান, বিভিন্ন কল্পনা ও বিশেষ জ্ঞান কিছুই হয় না। সুতরাং বিকল্প শব্দে আমরা এক কথায় বুঝিব, যাহা তুলনাসিদ্ধ জ্ঞান।

অতএব রামানুজ-মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান মানে—যে জ্ঞান আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত তুলনা না করিয়া উপস্থিত জন্মে, এবং সবিকল্পক জ্ঞান মানে—যে জ্ঞান উহার সহিত তুলনা করিয়া উৎপন্ন হয়।

এক্ষণে একে একে এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচনা করা যাউক। রামানুজ-"মতে" নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান প্রথম হয়। ইহাতে বস্তুর গুণ ও আকৃতি প্রভৃতি বিশেষণগুলি সেই বস্তুর সহিত মিশ্রিত ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। তাহার পর এই প্রথম জ্ঞানটী আমরা আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সহিত তুলনা বা আলোচনা করিয়া অথবা মিলাইয়া দেখি; এবং মিলাইবার পর যে একটী জ্ঞান জন্মে, তাহা উক্ত প্রথম জ্ঞান হইতে পৃথক দেখিতে পাই; তখন আমরা বলিতে পারি, এটী এই এবং এটী এই নহে। এই দ্বিতীয় জ্ঞানই সবিকল্পক। মনে করুন, আমি এক মনে বসিয়া লিখিতেছি, হঠাৎ পশ্চাতে দণ্ড-হস্তে অপরিচিত জনৈক সন্ন্যাসী

আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। আমি চাহিয়া দেখিবামাত্র কি দেখি? যাহা দেখি—যাহা আসিয়া হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়, তাহার মধ্যে দণ্ড ও সন্ন্যাসী এই দুইটীই একই কালে থাকে। অগ্রে দণ্ড পরে নরাকৃতি সন্ন্যাসি-বপু—এ ভাবে আমার দেখা হয় না। ইহার পর এই জ্ঞানটী, আমার হৃদয়ের মধ্যে দণ্ড জ্ঞান ও সন্ন্যাসী জ্ঞানের সহিত, আমি মিলাইয়া দেখি। মিলাইবার পর আমার জ্ঞান হয়, ইনি একজন দণ্ডী সন্ন্যাসী। মিলাইবার অগ্রে ইনি দণ্ডী সন্ন্যাসী কিম্বা লগুড় হস্তে দ্বারবান, অথবা আর কিছু, সে জ্ঞান হয় না। এ জন্য মিলাইবার পূর্ব্বের জ্ঞান এমতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান, এবং পরের জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞান।

এস্থলে টীকাকার বড় সুন্দর একটী বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে এক ঢিলে দুইটী পাখী মারার কাজ হইয়াছে। তিনি এই বিচারে এক শ্রেণীর নৈয়ায়িকের মত খণ্ডনচ্ছলে অদ্বৈতবাদীর মত পর্য্যন্ত দূষিয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রশংসনীয়। অদ্বৈত-বাদী, নৈয়ায়িক এবং রামানুজা এই তিনেরই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সবি-কল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ।

অদ্বৈতবাদীর মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রথমে হয়, পরে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়। রামানুজ ও নৈয়ায়িকের মতে কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ প্রথমে নির্ব্বিকল্পক এবং পরে সবিকল্পক জ্ঞান হয়। রামানুজ-মত ন্যায়মতের সহিত ঐ বিষয়ে কতকাংশে এক হইলেও পার্থক্য যথেষ্ট আছে। ন্যায়ের যাহা নির্ব্বিকল্প, রামানুজ তাহা অস্বীকার করেন এবং ন্যায়ে যাহা সবিকল্পক জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহাই তাঁহার মতে নির্ব্বি-কল্পক জ্ঞান; এবং ন্যায় সবিকল্পক জ্ঞানের পরও আর এক প্রকার জ্ঞান যে স্বীকার করেন, ঐ জ্ঞানই রামানুজ-মতে যথার্থ সবিকল্পক জ্ঞান। ওদিকে অদ্বৈতবাদীর সহিত রামানুজ-মতের এই কথা যদি মিলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, রামানুজের নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয়বিধ জ্ঞানই অদ্বৈতবাদীর মতে সবিকল্পক জ্ঞান। কারণ, অদ্বৈত-বাদী যাহাকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলেন, তাহা প্রথমে হয় না, পরে হয়।

ন্যায়ের মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অনুমেয়; অদ্বৈতবাদী ও রামানুজী-মতে কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ। ন্যায়ের মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত, যথা—ঘট-জ্ঞান। সকলেই জানেন ঘট-জ্ঞানের উদয় হইবার প্রথমে একটা বস্তু

মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বস্তুটা দেখিয়া পরে যখন তাহাকে ঘট-জাতীয় বলিয়া জ্ঞান হয়, তখনই ঘট-জ্ঞান হয়। সুতরাং ঘট-জ্ঞানে ঘট বস্তু ও ঘটত্ব জাতি এই দুইটী অঙ্গ বিদ্যমান থাকে। ঘটটী বিশেষ্য পদার্থ এবং ঘটত্ব জাতিটী বিশেষণ পদার্থ, অর্থাৎ যে পদার্থ টী ঘটকে গো মনুষ্যাদি অন্যজাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ঘট বস্তুটী দেখিবামাত্র ঘটত্ব-জাতির জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু ঘটত্ব-জাতিজ্ঞান ও ঘট-বস্তুজ্ঞান, এক নহে। ন্যায়ের মতে ঘট-বস্তু দেখিয়া যে ঘটত্ব-জাতির জ্ঞান হয়, সেই ঘটত্ব জাতির জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। উহা ঘট বস্তুটীর সহিত সংযুক্ত হইলে তবে ঘটটীর পূর্ণ জ্ঞান হয়। তাহাই সবিকল্পক-জ্ঞান-পদ-বাচ্য হয়। ঘটত্ব জাতির জ্ঞান না হইলে এজন্য ঘট-জ্ঞান পূর্ণ হয় না। অতএব এই ঘটত্ব-জাতি জ্ঞান ঘটের পূর্ণ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই যে আমাদের মনে উদিত হয়, ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। এজন্যই নৈয়ায়িক বলেন, ঐ নির্ব্বিকল্পক ঘটত্ব-জাতি-জ্ঞানটী অনুমেয়।

রামানুজ বলেন, না, উক্ত ঘটত্বজাতিজ্ঞান ও ঘটবস্তুজ্ঞান একাধারে একই কালে উদয় হয়। উহাদিগকে পৃথক্ গ্রহণ করা হয় না, সুতরাং ন্যায়-মতের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ঠিক নহে। ন্যায়ের এই কথাটী খণ্ডন উপলক্ষেই টীকাকার, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। তিনি ন্যায়ের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান-খণ্ডনাবসরে অদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়ের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি—এইবার আমরা অদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, তাহা হইলে টীকাকার এক খণ্ডনে দুইটী মতেরই খণ্ডন কেমন করিয়া করিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে। অদ্বৈতবাদীর মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান, সর্ব্ববিধ-সম্বন্ধশূন্য জ্ঞান। ইহাতে বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না। বেদান্ত-পরিভাষায় একথা বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝান হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। তবে তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তুমিই সেই (তত্ত্বমসি) বা এই সেই রামচন্দ্র, এবংবিধ জ্ঞানে যে চিন্মাত্র পদার্থ অথবা রামচন্দ্র পদার্থমাত্রটুকুর জ্ঞান হয়, তাহাই তাঁহাদের মতে নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এ জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞান বাধিত হইয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইবার পর হয়।

সবিকল্পক জ্ঞান বাধিত হওয়ার অর্থ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের জ্ঞানটা

নষ্ট হয়। এই সেই রামচন্দ্র এস্থলে "এই সেই" এই দুই বিশেষণ ত্যাগ করিয়া যখন রামচন্দ্র মাত্রটুকু গ্রহণ করা হয়, তখনই তাহাকে বাধিত বলা হয়। "এই সেই" এই বিশেষণ দুইটীর সার্থকতা বোধ থাকিলে রামচন্দ্র পদার্থেও ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া পড়িতে বাধ্য। কিন্তু কার্য্যে তাহা হয় না, আমরা পূর্ব্বদৃষ্ট রামচন্দ্র এবং এখন দৃষ্ট রামচন্দ্রে কোন ভেদবুদ্ধি করি না। এইজন্য বিশেষণরহিত যে বিশেষ্য-প্রত্যক্ষ, তাহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান।

এখন দেখা যাউক, টীকাকার এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে কি করিয়া খণ্ডন করিতেছেন। টীকাকার বলেন—যদি জাতি ও ব্যক্তি জ্ঞান—বিশেষণ ও বিশেষ্য জ্ঞান একসঙ্গে তোমার মনে উদিত না হইয়া পূর্ব্বাপর উদিত হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে সংযুক্ত কর কোথা হইতে? দণ্ডসংযুক্ত সন্ন্যাসী দেখিযাই ত "দণ্ডী সন্ন্যাসী' বল? তুমি প্রথমে দণ্ড দেখিলে পরে সন্ন্যাসী দেখিলে ; কিন্তু বল দেখি,তুমি কিজন্য তাহাদিগকে সংযুক্ত করিতেছ? এই সংযুক্ত করা ত তোমার খেয়াল নহে,তুমি দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখিয়া দণ্ড ও সন্ন্যাসীকে সংযুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং কেন না বল যে, তুমি উহা একই কালে দেখিয়াছ। তুমি যে অনুমান করিয়া ব্যক্তিতে জাতিত্ব-জ্ঞানের পৃথক্ প্রত্যক্ষ ধরিয়া লইতেছ, তাহার প্রয়োজন কি? আমরা বলি, উহা নিষ্প্রয়োজন। দণ্ড ও সন্ন্যাসীর জ্ঞান এক সঙ্গেই তোমার হয়। ঘটত্ব জাতি ও ঘটবস্তু জ্ঞান এক কালেই হয়—ইহারা এক সামগ্রীতেই বর্ত্তমান থাকে ; সুতরাং পৃথক্ গ্রহণের সম্ভাবনা কোথায়? আর যদি অদ্বৈতবাদীর পক্ষ আশ্রয় করিয়া বল যে, না, উহা সম্বন্ধ জ্ঞানের পর হয়—তাহাও ঠিক নহে। কারণ, সম্বন্ধ জ্ঞানের পর পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইলে সম্বন্ধ জ্ঞানটা ভাঙ্গিয়া গেল। পৃথক্ জ্ঞানের অভাবেই সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব যেখানে বর্ত্তমান, সেখানেই পৃথক্ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকারে এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহারও প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ফলে এতদ্দ্বারা তাঁহাদের মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে গুণ ও আকৃতি প্রভৃতি বিশেষণ বিষয়ের সহিত একত্র প্রতিভাত হয় বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, এক দিকে যেমন নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষবাদী নৈয়ায়িকের মত খণ্ডন করা হইল, অপর দিকে, তদ্রূপ অদ্বৈতবাদেরও সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা হইল। অদ্বৈতবাদী বলেন

নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশেষণের জ্ঞান হয় না; কিন্তু ইঁহারা ঐ কথা অস্বীকার করেন, এবং নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষেও যে বিশেষণের অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ভাবে প্রমাণ করিয়া থাকেন।

ইহার পর গ্রন্থকার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, তিনি ন্যায়ে যেরূপ দ্রব্যের সহিত রূপ গুণের সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণানুমোদিত সংযুক্তাশ্রয়ণসম্বন্ধ নামক সম্বন্ধ স্বীকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। রামানুজী মতে স্বীকৃত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের পোষক বলিয়াই তিনি ইহা স্বীকার করিতে একরূপ বাধ্যই হইয়াছেন। উক্ত বিষয়টী আলোচনা করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকের জন্য, সম্বন্ধ কত প্রকার এবং তাহাদের লক্ষণ কি ইত্যাদি জটিল বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। এজন্য এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। ফল কথা, সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে রামানুজ মতের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সংযুক্তাশ্রয়ণ-সম্বন্ধে তাহা হয় না। সংযুক্তাশ্রয়ণ অর্থে বুঝায় যে, গুণ ও দ্রব্য পরস্পরে এমন ভাবে সংযুক্ত যে, তাহাদের পৃথক্ গ্রহণ অসম্ভব।

টীকাকারের পূর্ব্বোক্ত বিচার সকলের সারমর্ম্ম যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা এই—রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। এই উভয় প্রত্যক্ষেই বিশেষ্য ও বিশেষণ একই কালে প্রত্যক্ষ হয়; নৈয়ায়িকের মতের মত তাহা পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না, অথবা অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে তাহা বিশেষণবিহীনরূপে প্রত্যক্ষ হয় না। সকল প্রত্যক্ষই বিশেষণ সম্বলিত, ঐরূপ স্বীকার করায় লাভ কি হইল? লাভ এই যে, যদি কেহ বলেন, নির্ব্বিশেষ ভগবৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহা রামানুজ মতে অসম্ভব বা ভ্রম বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। ফল কথা, এই বিচারে প্রকারান্তরে অদ্বৈতমতেরই উপর আক্রমণ হইল—নৈয়ায়িক মত নিরাশ করাটা উপলক্ষ মাত্র, অদ্বৈতবাদীরা যেরূপ নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন ইঁহাদের মতে তাহা হইতেই পারে না, তাহা নিশ্চিতই সবিশেষ পদার্থ হইতে বাধ্য; এই রূপে অনুমান প্রভৃতি সমুদায় প্রমাণেই গ্রন্থকার দেখাইবেন যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ অসম্ভব; সুতরাং ওকথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অসঙ্গত কথাই বলেন। আর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যখন কোন্ প্রকারেই হইতে পারে না প্রমাণিত হইল, তখন যাঁহারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ভিন্ন আর

কি পদবী লাভ করিতে পারিবেন? কোনরূপ প্রমাণ দ্বারা যদি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ দ্বিবিধ ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদিগণকে আর কিছুতেই হটাইতে পারা যাইবে না; এজন্য ইহারা গোড়াতেই এমন বাঁধুনি বাঁধিলেন যে অদ্বৈতবাদীর আর সে কথা বলিবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না।

বস্তুতঃই এই প্রকার পাকা "চাল" আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব সাধারণ। ইহা তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ কথা। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহার প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ সাবধানতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা স্বভাবতঃ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহার মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। উক্ত মূল ও তাহার টীকা অবলম্বনে আমার যেরূপ প্রতীতি হইল, তাহাই লিখিলাম। এক্ষণে মূল গ্রন্থ জানিতে পারিলে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ আমার ত্রুটী সংশোধনে সমর্থ হইবেন, আশা করি।

মূলানুবাদ—

উক্ত প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ ভেদে তিনটী। ইহাদের মধ্যে সাক্ষাৎকারী প্রমাকরণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমানাদির সহিত পৃথক্ করিবার জন্য সাক্ষাৎকারী শব্দ প্রযুক্ত হইল। দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিবার অভিপ্রায়ে প্রমাশব্দ ব্যবহৃত হইল। উক্ত প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। নির্ব্বিকল্প শব্দে গুণ ও সংস্থানাদি-বিশিষ্ট প্রথম পিণ্ড গ্রহণ বুঝায়; এবং সবিকল্প শব্দে আলোচনা পূর্ব্বক গুণ সংস্থানাদি-বিশিষ্ট দ্বিতীয়াদি পিণ্ড জ্ঞান বুঝায়। এই দুইটীই বিষয় বিশিষ্ট। অবশিষ্ট গ্রাহিজ্ঞান অসম্ভব। কারণ, তাহার উপলম্ভ ও উপপত্তি হয় না। গ্রহণের প্রকার এই :— আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ প্রাপ্য বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হেতু ঘটাদিরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকট হইলে ঘটপটাদি চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে। এই প্রকার স্পর্শ-বিষয়ক প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে। দ্রব্য গ্রহণে, চক্ষু ও তাহার বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সংযোগ সম্বন্ধ বলে। দ্রব্যগত রূপাদি গ্রহণকালে যে সম্বন্ধ হয়, তাহা সমবায় সম্বন্ধে স্বীকার না করিলে সংযুক্তাশ্রয়ণ সম্বন্ধ নামে অভিহিত হয়। নির্ব্বিকল্পক, ও সবিকল্পক ভিন্ন

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, যথাঃ— অর্ব্বাচীন ও অনর্ব্বাচীন। অর্ব্বাচীন আবার দ্বিবিধ, যথাঃ—ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ ও ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ। ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ দ্বিবিধ, যথাঃ—স্বয়ং সিদ্ধ ও দিব্য। যাহা যোগ জন্য, তাহা স্বয়ং সিদ্ধ। যাহা ভগবৎপ্রসাদ জন্য, তাহা দিব্য। অনর্ব্বাচীন বলিতে কিন্তু ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মুক্ত ও নিত্য ঈশ্বরের জ্ঞান বুঝায় এবং তাহা পরে প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইয়াছে। এই প্রকারে সাক্ষাৎকারী প্রমার করণ প্রত্যক্ষ ইহা সিদ্ধ হইল।

অতঃপর "স্মৃতিকে" প্রমাণ মধ্যে গণ্য করা উচিত কি না, এবং যদি গণ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহা উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত কিম্বা পৃথক্ এই বিষয় আলোচ্য॥

সুহৃদ্বর ৺বিপিনবিহারী।

[শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।]

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear
Full many a flower is born to blush unseen,
Aad waste its sweetness in the desert air."
(Gray.)

কলিকাতায় বাগবাজার একটী সুপ্রসিদ্ধ পল্লী। বহুপ্রাচীন সময় হইতে এই পল্লীতে বহু সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বংশাবলীর বাস। এই পল্লীতে "বাগবাজার ষ্ট্রীট" নামক রাস্তার উপর 'বসুপাড়া' পল্লীর পশ্চিমে, অধুনা বিলুপ্ত এক বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য কিছুকাল পূর্ব্বে দেখা যাইত। তরঙ্গায়িত (ঢেউ-খেলান) মস্তক প্রাচীরে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত সুন্দর বৃক্ষা-বলীসমাচ্ছন্ন এরূপ সুবৃহৎ আবাস-বাটী এ অঞ্চলে আর তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাগবাজারে স্বর্গীয় "ভগবতী গাঙ্গুলীর" বাটী বাস্তবিকই একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। দু এক স্থলে প্রাচীরের নিম্নভাগের

অংশবিশেষ ব্যতীত সেই নয়নাভিরাম প্রাসাদতুল্য ভবনের চিহ্নমাত্রও এখন আর নাই। বাটীখানির সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে সুন্দর বাগান ছিল। ফুল ফলের নানাবিধ বৃক্ষলতায় ও কয়েকটী পুষ্করিণীতে বাগানখানি শোভিত ছিল। বর্ত্তমানে সেই স্থান দু একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী, দু একটী মাঠ-কোটা ও অসংখ্য খোলার ঘরে পরিপূর্ণ বস্তীতে পরিণত হইয়াছে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মহা কুলীন "বেগের গাঙ্গুলী" নামক প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভব। শুনিতে পাই, বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুটুম্ব-স্থানীয় ছিলেন বলিয়া এবং ঐ সূত্রে তাঁহাদের জমিদারীর কিয়দংশ কালে প্রাপ্ত হইয়াই এই গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। আমাদের আলোচ্য বিপিন বিহারী এই উচ্চ কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ খগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে 'নকুড় গাঙ্গুলী'। এখনও বাগবাজার পল্লীতে এমন কোন পুরাতন বাসিন্দা পরিবার বর্ত্তমান নাই, যাঁহারা এই খ্যাতনামা গঙ্গোপাধ্যায় বংশের সৌজন্যতা, অমায়িকতা, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণসমূহের সহিত পরিচিত নহেন। লোকে বলে "মা লক্ষ্মী চঞ্চলা"। কিন্তু তিনিই যথার্থ চঞ্চল-স্বভাবা হউন বা তাঁহার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল সেবকগণই তাঁহাকে চঞ্চলা করিয়া তুলুক, সময়ে সময়ে অনেককেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি চিরকালের নিমিত্ত হারাইতে হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারও কালে উহা হারাইয়াছিলেন। সেজন্য বিপিন বিহারী উচ্চবংশোদ্ভব হইয়াও সামান্য গৃহস্থের সন্তানের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব-পুরুষগণের অশেষ সমৃদ্ধির কোন অংশই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বর্ত্তমান লেখকের সহিত বিপিন বিহারীর কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানাইবার আবশ্যক করে না। তবে সাধারণ ভাবে তিনি আমাদের পরম হিতৈষী, চরিত্র বান্, সমবয়স্ক, আদর্শ বন্ধু ছিলেন। বাল্যে বিপিন বিহারীর সহিত আমাদের এক পল্লীবাসী বলিয়া পরিচয় ঘটে; কৈশোরে আমরা সহাধ্যায়ী; এবং যৌবনে সতীর্থ ও সহচর রূপে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। প্রথম দিন হইতেই সেই সরল, উদার, শান্ত ও অন্তরে বাহিরে সুন্দর প্রকৃতি আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। কৈশোরে ও যৌবনে একত্র পাঠাভ্যাসে ও সদালাপে এক সঙ্গে বহুকাল অতিবাহিত করায় সেই আকর্ষণ

বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমাদের বেশ মনে পড়ে, যখন আমরা পূজ্যপাদ অধ্যাপক ও আচার্য্য শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "The New Indian School" এ অধ্যয়নে নিযুক্ত, তখন হইতেই বিপিনবিহারীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া পরিচিত মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে। তখন আমরা চৌদ্দ বা পনের বৎসরের মাত্র হইব। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য উভয়েই প্রস্তুত হইতেছিলাম। এক পল্লীতে বাস এবং এক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের জন্য আমরা উভয়ে এক স্থানে প্রায় সর্ব্বদা বাসের বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম এবং নানাবিধ আলাপে যৌবনের আনন্দোজ্জ্বল দিবসগুলি আমাদের কত সুন্দর ভাবে যে কাটিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। বিপিনবিহারীর অসামান্য সরলতা, উন্মুক্ত-হৃদয়তা ও বন্ধু-প্রীতি সর্ব্বদাই আমাদের উপভোগ্য ছিল। সেই সময়ে বৈকালে আরাম ও অবসর-লাভেচ্ছায় আমরা প্রায়ই পূতসলিলা, কলিকাতা-পবিত্র-কারিণী ভাগীরথী-তীরে সান্ধ্য ভ্রমণে একত্রিত হইতাম ও কত রহস্য, কত সদালাপেই না সময়াতিপাত করিতাম। সন্ধ্যার পরে আবার স্থানীয় বালকগণের সাধারণ পাঠাগারে আমরা পুনরায় মিলিত হইয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি এক সঙ্গে পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় কতক্ষণ অতিবাহিত করিয়া তবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম।

এইরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আমাদের আনন্দে কাটিতেছিল। ঐ সময়ে একদিন আমরা রাস্তার দেয়ালে বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না?" এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 'ষ্টার থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চে দিবেন। বিপিনবিহারী এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং শুনিতেও যাইলেন। আমাদের স্মরণ আছে, ইহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম উন্মেষ। স্বর্গীয় ডাক্তার মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে একে একে অনেকগুলি বক্তৃতা এইরূপে প্রদান করেন। প্রায় সকলগুলিতেই বিপিনবিহারী উপস্থিত থাকিয়া ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলেন। ফলে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল ও তিনি কাঁকুড়গাছিস্থ রাম বাবুর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির-শোভিত উদ্যানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় এইরূপে ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার পড়াশুনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কিন্তু পাঠাভ্যাসে বীতশ্রদ্ধ

হইতে আমরা তাঁহাকে কথনও দেখি নাই। তবে একই মন সমানুরাগে সমভাবে দুই দিকে চলিতে পারে না, সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বোক্ত অনুমান করিতেছি। ইতিপূর্ব্ব হইতেই আমরাও দক্ষিণেশ্বরের পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধনেতিহাস ও তাঁহার প্রদত্ত মানবকল্যাণকর অমৃতময় উপদেশাবলী কিছু কিছু শ্রবণ করিতেছিলাম। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই আমাদের পাড়ার ভক্তচূড়ামণি ৺বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে প্রায় যাতায়াত করিতেন। ইঁহারা আমাদের ন্যায় অনেককেই ঐ সকল কথা শুনাইয়া মুগ্ধ ও উদ্দীপিত করিতেন। অতএব ঐ বিষয়েও বিপিনবিহারীর সহিত আমাদের আদানপ্রদানের বেশ সুযোগ হইয়াছিল। বিপিনবিহারী কাঁকুড়গাছী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক নূতন তথ্য আনিয়া আমাদের দিতেন, আর আমরাও শ্রীযুক্ত ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গমনাগমন করিয়া উল্লিখিত ভাবে অমৃতময়ী রামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম। এই সকল আলোচনায় দু এক স্থলে আমাদের কখন কখন মতদ্বৈধও ঘটিত; কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব, প্রীতি বা আনন্দের কখন অভাব হইত না। কি কারণে যে আমাদের মধ্যে ঐরূপ ভিন্ন মতের উদয় হইত, তাহাও আমরা তখন ঠিক ঠিক বুঝিতাম না। কিন্তু ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইল যে, কিছুকাল পরে বিপিনবিহারী স্বয়ংই স্বীয় মতের ভ্রমগুলি বুঝিতে পারিয়া পরিবর্ত্তন করেন এবং তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রথমোপদেষ্টার মতসমূহও যে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। এ সকল কথার আবশ্যকতা ছিল না। তবে উত্থাপনের কারণ এই যে, আমাদের আলোচ্য বিপিনবিহারী হৃদয়ের ধন ধর্ম্মমত বা বিশ্বাস সকল ভ্রম-সঙ্কুল বুঝিতে পারিবা মাত্র উহাদের অসমীচীন অংশসমূহ ত্যাগ করিয়া এই সময়ে যে অসামান্য সারল্য ও সত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহাই পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস। এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সিকাগো (Chicago) সহরের বিরাট প্রদর্শনী-স্থিত-ধর্ম্ম-সঙ্ঘে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত হইয়াছেন। The Indian Mirror নামক কলিকাতার খ্যাতনামা সংবাদপত্রে সে সময় আমরা প্রায়ই ঐ মহাত্মার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় ও আমেরিকায় অসামান্য

প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতাম ও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতাম।

আমাদের পল্লীস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার কৃপাবারিস্পর্শে ও অমৃতময় উপদেশাবলী হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাগবাজার পল্লীর অনেকেই নূতন ভাবে জীবন গঠনে তখন সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসী সেবকগণও বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ভবনে প্রায়ই যাতায়াত ও কখন কখন অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থানও করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র দর্শন লাভে পবিত্রীকৃতজীবন পল্লীর পূর্ব্বোক্ত বয়োবৃদ্ধগণ এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী পল্লীর নূতন যুবকগণের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই তজ্জন্য হইয়াছিল। বৃদ্ধদিগের ভিতর অনেকে পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথের এই অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় ভবিষ্যদ্বাণীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখেই শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সেই লোকোত্তর পুরুষের উল্লিখিত কথাগুলি এইরূপে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের জীবনে সফল হইতে দেখিয়া মহানন্দানুভব করতঃ মনোযোগ সহকারে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বিপিনবিহারীর স্বামীজির উপর ভক্তি অনুরাগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। আমাদের জীবনেও অনেক বিপর্য্যয় ঘটিল। কেহ কেহ তখনও পাঠে নিযুক্ত, আবার কেহ কেহ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাক্‌রীর সন্ধানে ঘুরিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবিখ্যাত বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পিপাসুগণের ধর্ম্মতৃষ্ণা মিটাইতে অনন্যমনে সাহায্য করিতেছিলেন। বাগবাজারে উক্ত বসু মহাশয়ের ভবনে পূজ্যপাদ স্বামীজি একটী ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করায় কলিকাতার বহু ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য হইতেছিল। দলে দলে যুবকগণ আসিয়া এই মহামনীষীর চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছিলেন। আমাদের মধ্যেও অনেকেই এই শুভ মুহূর্ত্তে আপন আপন জীবন নূতন পথে চালিত করিতে সক্ষম হইলেন। বিপিনবিহারীর ধর্ম্মজীবনও এই মহা সুযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-আলোকে সম্যক্ বিকাশিত হইয়া উঠিল। প্রাতের শিশিরসিক্ত, ফুল্লোজ্জ্বল কুসুমের ন্যায় তাঁহার

নিষ্কলঙ্ক পূত চরিত্র ও ঈশ্বরানুরাগ এখন হইতে তাঁহাকে সকলের আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিল। এই সময় হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণভক্তের অনেকে তাঁহাকে শান্ত-স্বভাব, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সরল ও ধর্ম্মচিন্তাপরায়ণ যুবক বলিয়া চিনিলেন ও হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রীতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বিপিনবিহারী Messrs John Dickinson-এর আফিসে চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আফিসের অনেকেই তাঁহার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্। পল্লীবাসিগণও সেই মত—আর বন্ধুবান্ধবগণও সতীর্থ। সকল দিকেই বিপিনবিহারীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রজীবনালোচনার সমান সুযোগ। আফিসের কার্য্যাবকাশে বেলুড় মঠে ও কাঁকুড়গাছীতে যাতায়াত তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। এদিকে একে একে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কার্য্যাদিতে যোগদান করিয়া ধন্য হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কার্য্যের যথাসাধ্য সাহায্য করা বিপিন বাবুর জীবনেরও একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল।

পূজ্যপাদ স্বামীজির দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সোসাইটী নামে এক সভা কলিকাতার স্কুল কলেজ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইল। উদ্দেশ্য,—সভ্যগণের স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে জীবন-গঠন-চেষ্টা ও ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে এই মহানুভবের অমূল্য চিন্তারাশি বিস্তৃত ও আদৃত হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা। এই সভার কার্য্যে বিপিনবিহারী প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং উহার পরিরক্ষণে একটী স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই সভা কর্ত্তৃক একটী ছাত্রাবাস (Boarding) প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-কল্পে বেশ সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাব ও নানা কারণে ছাত্রাবাস পরিচালনে সভা অক্ষম হইলেন। সাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের জন্য ধর্ম্মবিষয়ের নানা আলোচনা করিয়াই অতঃপর সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। বেলুড় মঠের পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অনেকে উহাতে যোগদান করিয়া নানা সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা দান ও কথোপকথন ক্লাসে, উপস্থিত জিজ্ঞাসুগণের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে তৃপ্ত করিতেন। এই সভার কয়েকটী বিশেষ অধিবেশনে সভার কয়েকজন সভ্যও সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠ করেন। বিপিনবিহারী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও প্রকাশ্যভাবে সাহিত্য-সেবা

করেন নাই। কেবল মাত্র অবকাশকালে প্রতিনিয়ত স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন; এবং সাধারণ্যে যাহাতে এই সকল মহামূল্য চিন্তারাশির প্রচার ও প্রসার হয়, তজ্জন্য লালায়িত ছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় এখন তিনি অদম্য উৎসাহে কয়েকটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণ্যে পাঠ করেন। গত দুই বৎসরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ-পরিচালিত 'উদ্বোধন' পত্রে উহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—১ম, "আমাদের জাতীয়তা", ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ২য়, "দেশহিতৈষণা" (১ম প্রস্তাব) ঐ ৯ম।১০ম সংখ্যা। ৩য়, ঐ (২য় প্রস্তাব) ঐ, ১২শ সংখ্যা। চতুর্থ, "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার", ১১শ বর্ষ, ৩য়।৪র্থ সংখ্যা। এই সকল প্রবন্ধ পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, বিপিনবিহারীর প্রতিভা বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমায় নাই। কালে তিনি স্বারস্বত-সেবায় যে সম্পূর্ণ সফল-মনোরথ হইতেন, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

অপর দিকে আবার ধর্ম্ম-প্রাণ বিপিনবিহারী নিভৃত সাধন-ভজনের অনুরাগী হইয়া ইত্যবসরে গোপনে বেলুড় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র, ধর্ম্মৈকপ্রাণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি, এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে ও সাহায্যে তাঁহার বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্ত আধ্যাত্মিক আলোকে দিন দিন অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া ধর্ম্মজগতের গূঢ় সত্য সকল অনুভব ও ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গত পূর্ব্ব বৎসরে কলিকাতায় যে বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের (Convention of Religions) অনুষ্ঠান হয়, বিপিনবিহারী তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা। রামকৃষ্ণ-মঠ ও বিবেকানন্দ সোসাইটীর উদ্যমে যে সকল লোকহিতকর কার্য্য সহরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হইত, বিপিনবিহারী উহাদের প্রায় সকলগুলিতেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের সুষ্ঠু সমাধান কল্পে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিতেন। এক কথায়, বিপিনবিহারী গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় সৎকার্য্যানুরাগী, স্বার্থত্যাগী ও পরিশ্রমী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিপিন বাবুর যতটুকু চিত্র আমরা প্রদানে সমর্থ হইলাম, তাহাতে সকলে ইহাই কেবল বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ সেবকগণের মধ্যে একজন চরিত্রবান, অধ্যবসায়শীল, পরহিতচিকীর্ষু ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু ধর্ম্ম-চিন্তাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইলেও তাঁহার মনে আরও দু একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেগুলিতেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে সকল কথার উত্থাপন না করিলে তাঁহার জীবনের পূর্ণাবয়ব চিত্র পাঠকের মনে অঙ্কিত হইবে না, এজন্য সেই সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গদেশে নাট্যকলা চর্চ্চার এক প্রকার জন্মভূমি বলিয়া কলিকাতার বাগবাজার পল্লীকে অনেকে গণনা করেন। নাট্যশালা-সমূহের ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে, কথাটা অনেকটা ঠিক। এই পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও প্রতিবাসী বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকলা-বিশারদ আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার অনুরাগী হইয়া অবসরকালে বিপিনবিহারী সৎ নাটকাদি পাঠে ও তাহাদের অভিনয় দর্শনে কিছু কিছু সময় ব্যয় করিতেন। ইহার ফলে, তাঁহার মন অভিনয়-কলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় ও চরিত্রবান থাকিয়া উৎকৃষ্ট অভিনেতা হওয়া একটা আনন্দের বিষয় বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ক্রমে অভিনয়-কলার অনুরাগী হইয়া পড়েন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে "The Calcutta University Institute" নামক সভার তরুণ সভ্যগণ যখন প্রথম বাঙ্গালা নাটকাভিনয় করেন, তখন আমরা উভয়ে তাহাতে ব্রতী হইয়াছিলাম। আজীবন-সহচর বিপিন বাবুর উল্লিখিত অনুরাগের পরিচয় পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু পাইয়াই আমরা তাঁহাকে ঐ দলভুক্ত করিয়া লই। অমর কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' (নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত) এক্ষেত্রে অভিনীত হয়। তাহাতে বন্ধুবর একটী ভূমিকা সানন্দে গ্রহণ করেন। ভূমিকাটী স্ত্রীলোকের। কিন্তু অনেক পুরুষ-ভূমিকা অপেক্ষা সেটী কঠিন। 'নৃমুণ্ড-মালিনীর' বিচিত্র ভূমিকা বিপিন বাবু এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত অভিনয় করেন। একই দৃশ্যে আমরা দুই জনে কথোপকথনচ্ছলে অভিনয় করি। কিন্তু, বন্ধু-প্রীতিতেই হউক, বা অন্য কারণে হউক, তাঁহার অভিনয় ও আবৃত্তি আমার সুন্দর লাগিয়াছিল। এই অভিনয়স্থলে বহু-স্কুল কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী, বাণী ও রমার বঙ্গের বহু বরেণ্য সন্তান, এমন কি, মহামান্য বঙ্গেশ্বর ছোট লাট Sir John Woodburn বাহাদুরও পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ই বিপিন বাবুর ঐ বিষয়ের প্রথম উদ্যম।

দ্বিতীয় বারেও আমরা একত্রে নাট্যাভিনয়ে ব্রতী ছিলাম। প্রথম বারের ন্যায় এই অভিনয়ও বহু সম্মানার্হ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে সম্পন্ন হয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে আমরা কবিবর নবীন চন্দ্রের 'কুরু-ক্ষেত্র' কাব্যের অংশবিশেষ নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করি। ইহাতে বন্ধুবর 'অভিমন্যুর' শ্রেষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয় অতীব হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। বঙ্গের প্রথিতনামা 'সোমপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই অভিনয়ের অন্যান্য ভূমিকার প্রশংসা-বাদের পর এইরূপ লিখিয়াছিল। * * * * * "কৃষ্ণ ও অভিমন্যু তাঁহাদের স্ব স্ব অংশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। * * * * * * * ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহামান্য জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লোক অভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।" (কৃষ্ণের ভূমিকা বাগবাজার পল্লীর সুপরিচিত আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, গ্রহণ করিয়াছিলেন।) অভিনয় নিশ্চিতই সুন্দর হইয়াছিল। তাহা না হইলে সেদিন ঝড়বৃষ্টির মহা দুর্য্যোগে বাণীর ঐ সকল খ্যাতনামা বরপুত্রগণ আমাদের ক্ষুদ্র অভিনয় দর্শনের জন্য তাঁহাদের মহামূল্য সময়ের অতটা অতিবাহিত করিতেন না।

তৃতীয় বারে এই পরিষদেরই নবম বার্ষিক অধিবেশনে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, আমরা বিপিন বাবুকে Model Recitation Club নামক সম্প্রদায়ভুক্ত দেখি এবং তাঁহাদের অভিনীত শ্রীমতী কামিনী রায় মহাশয়ার 'একলব্য' নাটকের 'দ্রোণাচার্য্য'-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই। সম্প্রদায়স্থ অন্যান্য অভিনেতৃগণ অপেক্ষা এ ক্ষেত্রেও তাঁহার অভিনয় ভাল হইয়াছিল। শুনিতে পাই, বিপিন বাবু শিকদার পাড়ার কোনও ক্লাবের সংস্রবে 'সংসার' নাটকের 'প্রিয়নাথ' ও 'প্রফুল্ল' নাটকের 'মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া' নামক ভূমিকা-দ্বয় গ্রহণ করিয়া অভিনয় করেন। এই দুইটী অভিনয় দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। এজন্য বন্ধুবরের এই দুইটী অভিনয় সম্বন্ধে আমি মতামত প্রকাশে অক্ষম।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এদিক্‌কার কথা শেষ করিব। দুই বৎসর হইল, বাগবাজার পল্লীতে 'সোসিয়াল ইউনিয়ান' নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে পল্লীস্থ যুবকগণ মিলিত হইয়া অবকাশকাল সদালোচনায় অতিবাহিত করিবার জন্য বিশুদ্ধ ভাবের সঙ্গীতাদি বিশেষতঃ

নাটকাভিনয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। স্থানীয় বহু গণ্য মান্য বিজ্ঞ সাহিত্য ও নাট্যরথিগণ এই সভার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া উপদেষ্টা-ভাবে যোগদান করিয়াছেন। গত বর্ষের আগষ্ট মাসে এই সভা কর্ত্তৃক 'মেঘনাদবধ' নাটকাভিনয় হয়। বিপিন বাবু এই সভার অভিনেতৃগণের অগ্রণী হইয়া শ্রেষ্ঠ ভূমিকা মেঘ-নাদের অভিনয় করেন। পরে নভেম্বর মাসে ঐ সভার বার্ষিক অধিবেশনে 'বুদ্ধ-দেব' নাটকের অংশ-বিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। ইহাতেও তিনি বুদ্ধ-দেবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই দুই অভিনয়েও তিনি স্থানীয় সমবেত শিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-যুবকগণের চিত্তা-কর্ষণ ও মনোরঞ্জন করেন। বিপিন বাবুর এই সকল অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কালে তিনি একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইতে পারিতেন। এই সকল অভিনয় ব্যতীত তিনি বেলুড় মঠের নানা সভার অধিবেশনে বহু উৎকৃষ্ট কবিতার সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি শুনাইয়া অনেককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। নিজ লিখিত প্রবন্ধসমূহ এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রবন্ধাবলী পাঠকালীন তাঁহার আবৃত্তি অতীব শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইত। যাঁহাদের এই সকল আবৃত্তি শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের কর্ণে এখনও সেই মধুস্রাবী মর্ম্মস্পর্শী স্বর ধ্বনিত হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মারুণরাগরঞ্জিত মুখমণ্ডল ও ও তপ্তচামীকরশুদ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে এখনও সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে।

আর একটি বিষয়ের উজ্জ্বলানুরাগ আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি; উহা বিপিন বাবুর স্বদেশানুরাগ। তিনি সর্ব্বদাই স্বদেশের ও স্বজাতির হিত চিন্তা করিতেন ও দেশের ও দশের কোনও অকল্যাণ দেখিলে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন। কিন্তু তা বলিয়া তিনি বর্ত্তমানকালের স্বদেশী কোনও দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এবং রীতিমত বিচার, চিন্তা ও গবেষণা না করিয়া কোনও মত বা ভাব গ্রহণ করিতেন না। ঐ বিষয়ের বহু আলোচনা ও অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি কখনও কোনও সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হয়েন নাই। কখনও কখন রাজনীতি আলোচনার কিছু কিছু ঝোঁক ও তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি, কিন্তু পরে তিনি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড ধর্ম্ম; ধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। সেই জন্য গভীর চিন্তার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ

অল্প কথায় যে সকল মহান্ সত্য দেশের হিতের জন্য প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ভিতর হইতে কোন কোন কথা লইয়া উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর অধিবেশনের জন্য প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন, এবং সাধারণে যাহাতে ঐ সকল সত্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং ঐ ভাবে জীবন গঠন করিয়া ধন্য হয়েন তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির নাম আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, দেশানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ তিনেরই এক কালে পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর উপরোক্ত বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়ানের বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি "সামাজিক সম্মিলনীর আবশ্যকতা" নামক এক সুন্দর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতেও দেশের ও দশের অনেক হিত-কথা ছিল।

আমরা এ যাবৎ যাহা কিছু বলিলাম, তাহাতে বিপিন বাবুর বিশেষ বিশেষ গুণের কথারই আলোচনা হইল। এক্ষণে সাধারণ ভাবে তাঁহার বিষয়ে দু দশটা কথা বলা আবশ্যক। তাঁহার সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, সেরূপ সদানন্দময়, সহাস্যবদন, সরলান্তঃকরণ, মিষ্টভাষী, সদালাপী, রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, বালক-স্বভাব ও চরিত্রবান ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। কোন একটি বিশেষ গুণের আধারই সাধারণতঃ সংসারে নয়নগোচর হয়, কিন্তু এরূপ বহুগুণাধার পুরুষ সাধারণে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বহুবর্ষব্যাপী প্রগাঢ় সখ্যতায় তাঁহার সহিত আবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। বলিতে কি—এবং বলিলেও সকলে বিশ্বাস করিবেন কি না বলিতে পারি না, তাঁহার মিত্র ব্যতীত শত্রু কেহ ছিল না। কারণ, তিনি সকলেরই দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণভাগ মাত্র গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিক এমন গুণগ্রাহী ব্যক্তি সংসারে যথার্থই দুর্লভ। বিপথগামী বিপন্ন বন্ধুর জন্য তাঁহার ন্যায় সহৃদয় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমরা স্বল্প লোককেই দেখিয়াছি। লোভমোহাদির প্রলোভনে পদস্খলিত হইলে সংসারে আত্মীয় স্বজনও বিরোধী হয়, কিন্তু বিপিন বাবুর উন্নত হৃদয় সে সময়েও ঐ হতভাগ্য পুরুষের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া তাহার মঙ্গল-চিন্তায়ই মগ্ন থাকিত। বলিতে কি, তিনি কখনও কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই।

বিপিন বাবুর আর একটি গুণ তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়। সাধারণের ন্যায় আফিসের কার্য্যাদি কোনরূপে গোলমাল করিয়া সারিয়া বাটী যাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেন না। ঠিক ঠিক ভাবে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তজ্জন্য কর্ম্মচারীর হিসাবেও তাঁহার আফিসে সুনাম ছিল ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইতেছিল। অবকাশ পাইলেই বাটী আসিয়া তিনি তাস দাবায় মত্ত হইতেন না। আবার আফিসের 'হাড়ভাঙ্গা খাটুনি' খাটিয়া নির্গত হইয়াই প্রত্যহ তিনি বেলুড়মঠ বা বিবেকানন্দ সোসাইটীর কোনও না কোন কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, এবং শরীরপাত পণ করিয়া ঐ সকলের সাফল্যের দিকে যত্ন করিতেন। আবার কখন কোন কার্য্যাদির ভার হস্তে না থাকিলে বাটীতে আসিয়া তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থ সৎ নাটকাদি পাঠ ও উহাদের সুন্দর সুন্দর অংশগুলির আবৃত্তির অভ্যাস করিতেন; অথবা সুচরিত্র কাব্যানুরাগী যুবকগণ প্রতিষ্ঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করিতেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সদালোচনায় নিজ জীবনের উন্নতি সাধন করিতেন। এইরূপে তাঁহাকে আমরা বৃথা কালক্ষেপ করিতে দেখি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে বিনীত ছাত্রের ন্যায় বসিয়া কখন কখন তাঁহাকে বহুক্ষণব্যাপী কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতেও আমরা দেখিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ ঘোষজ মহাশয় তাঁহাকে পুত্রোপম স্নেহে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ দেখিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন! এইরূপে সুহৃদ্বর বিপিনবিহারী বহুগুণে আবালবৃদ্ধের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং কালে আমাদের দেশের ও সমাজের তিনি যে একজন পরম ভরসার স্থল হইবেন, তদ্বিষয়ে সকলের হৃদয়েই আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন! কিন্তু প্রফুল্ল মুকুল বিকশিত হইয়াই প্রখর রবিতাপে ঝলসিয়া গেল! আমাদের ভাগ্যে উহার মনোজ্ঞ সৌরভ মাত্রই উপভোগ হইল—রসনা-তৃপ্তিকর ফলের আস্বাদে প্রাণের ক্ষুধা শান্ত করিবার অবসর আর ঘটিয়া উঠিল না! সুহৃদ্বর বিপিনবিহারী অকালে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যাইলেন!

বিপিনবিহারীর স্বাস্থ্য কখনও মন্দ ছিল না। দুএকবার সামান্য সামান্য অসুখ হইয়াছিল মাত্র। সে কমনীয় অথচ বলিষ্ঠ দেহ দর্শনে কাহারই বা

মনে হইত যে, তিনি এত স্বল্পকালে আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া চির-কালের জন্য আমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন। সর্ব্বদা হাস্যবদন,সদা-লাপী, বন্ধুবৎসল,পরদুঃখকাতর বিপিনবিহারীর প্রেম-জ্ঞান-বিস্ফারিত বিশাল নয়নযুগল ও সুন্দর সুদৃঢ় শরীর দেখিয়া সকলের অনন্ত জীবনের কথাই মনে উদয় হইত। মৃত্যুর করাল ছায়া যে তাঁহার এত নিকটে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, একথা কাহারও মনে কখনও আসিত না। আমাদের সকল আশা উন্মূলিত করিয়া এ বিপরীত সংঘটন কেন হইল, কে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? দয়াধর্ম্মের স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল কামকাঞ্চনকীটদষ্ট সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এ দেবভোগ্য পবিত্র হৃদয় অধিক দিন সংসারে থাকিলে পাছে কলুষিত ও আবিল হয়, এই-জন্যই কি শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সাদরাহ্বানে নিজ সমীপে ডাকিয়া লইয়া অনন্ত কালের মত শ্রীচরণপার্শ্বে স্থান দিলেন? আর হতভাগ্য পৃথিবীর আমরা সে সুন্দর রত্ন হারাইবার পর এ পাপ-পঙ্কিল সংসারে উহার কত মূল্য বুঝিতে পারিয়া বিরহ-ব্যথিত-চিত্তে, ছল ছল নেত্রে, আবার যদি তাঁহার দর্শন পাই তবে যথাযথ যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইব ভাবিয়া এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি!

বিপিনবিহারী সংসারী হইয়াও সংযমী ছিলেন। একটি কন্যা ও একটি মাত্র পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার পর হইতেই তিনি, দেবীসদৃশা রূপ-যৌবন-সম্পন্না সর্ব্বগুণভূষিতা স্ত্রীর সহিত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে যে রত ছিলেন, একথা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি। সংসারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত মাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকি-তেন। অপর সাধারণের ন্যায় পার্থিব নানা সুখ-ভোগের কামনা রাখিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার জীবিতকালে তিনিই একমাত্র সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বিপিনবিহারী তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবী ও অনুজ সহোদরের উপরেই সংসারের সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই বিপিনবিহারী এক মহা শোক প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বালক পুত্রটিকে অকস্মাৎ হারাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হয়েন, এবং এই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন অতি শীঘ্রই নিজ ইষ্টদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে স্বয়ং স্থান লইলেন। গত ২০শে আষাঢ় সোমবার (৪ঠা জুলাই) টাইফয়েড (বাত-

শ্লেষ্মাবিকারোত্থ) নামক দারুণ রোগে আট দিন মাত্র ভুগিয়াই ৩৪ বৎসর বয়সে বিপিনবিহারীর সোণার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল! স্বপ্নেও যাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই তাহাই সংঘটিত হইল! সুহৃদ্বর, এ হাহাকার-দীর্ণ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুমি চির শান্তির অধিকারী হইলে, কিন্তু তোমার পরমারাধ্যা শোকলুণ্ঠিতা দুঃখিনী মাতা, বিয়োগ-বিধুরা দগ্ধহৃদয়া সহধর্ম্মিণী, সুখ-লালিতা বালিকা কন্যা, শোকাকুল ভ্রাতা, সন্তপ্তা সহোদরা, বিচলিত-হৃদয় অশীতিপর বৃদ্ধ পূজনীয় খুল্ল পিতামহ ও বিরহ-কাতর বন্ধু-বান্ধবগণকে কি বলিয়া কে সান্ত্বনা দিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। ঐ দেখ ভাই, তোমার অদর্শনে সন্ন্যাসী ও গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ, বিবে-কানন্দ সোসাইটীর বন্ধুগণ, বাগবাজারে সোসিয়াল ইউনিয়ানের সভ্যগণ ও তোমার শোককাতর পরিবারবর্গ কিরূপ কাতর হইয়া রহিয়াছেন! ভাই, তুমি সংসারের মায়ামোহে অপর সাধারণের ন্যায় লিপ্ত না থাকিলেও যথার্থ প্রেমিক ছিলে। সে প্রেমে আজ আমাদের বঞ্চিত করিও না। স্বর্গে তোমার আরাধ্য দেব সমীপে প্রার্থনা করিয়া তোমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা মাতৃ-দেবী ও বিরহকাতর অন্য সকলের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দাও! আর প্রফুল্ল-মুখে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমারই ন্যায় সুন্দর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া আপামর-সাধারণের কল্যাণ-চিন্তায় দেহপাত করিতে পারি—তুমি যেমন নিভৃতে, নীরবে, পার্থিব নামযশে উদাসীন থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক উন্নত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছ, আমরাও যেন নিজ নিজ জীবনের শেষ কয়টা দিন সেইভাবে যাপন করিয়া তোমারই ন্যায়, আমাদের উভয়ের আরাধ্য দেবের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় চির-শান্তির অধিকারী হইতে পারি।

ওঁ শান্তি! হরি ওঁ!

* * *

"Farewell, Dear Brother, Thou wert one of 'God's own kin,'

" Thy home of peace and rest thou now hast entered in!"

(J. C. Wyman.)

মন ।

(১)

ওহে অশরীরী দেব ! নিত্য লীলাময় !
শরীরের কোন্ গুপ্ত নিভৃত নিলয়ে,
কর তুমি অবস্থান নাহিক নির্ণয়,
স্থূলের মাঝারে অতিসূক্ষ্ম দেহ লয়ে ;
শোণিত অস্থির সনে, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্তমনে,
নেপথ্যে থাকিয়া কর নানা অভিনয়,
অসম্ভব কার্য্য তব বিশ্বের বিস্ময় !

(২)

সর্ব্ব-শক্তিমান্ তুমি শক্তির আধার,
অসাধ্য তোমার কিছু দেখিনা কোথাও ;
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলে করহ বিহার,
নিমেষে অপার সিন্ধু পারে চ'লে যাও ;
জলে, স্থলে, শূন্যোপরে, দুর্গম গিরি গহ্বরে,
কানন, প্রান্তর, মরু, গ্রহ গ্রহান্তরে,
সর্ব্বত্র অবাধ গতি বিশ্ব চরাচরে ।

(৩)

ভীষণ কৃপাণ করে ভয়ঙ্কর বেশে,
শত্রুর শিবিরে পশি নির্ভয় হৃদয়ে,
নাশিয়া অসংখ্য অরি চক্ষের নিমেষে,
ফিরে আস হাসি মুখে জয় ধ্বজা লয়ে ।
প্রজ্জলিত হুতাশনে, প্রবেশ অম্লানাননে,
অবহেলে অশনিরে পেতে লও শিরে,
এত কঠোরতা ধর কোমল শরীরে ।

(৪)

নন্দন উদ্যানে কর সমীর সেবন,
কৌমুদীপ্লাবিত সুখবাসন্তী নিশায়,
প্রস্ফুটিত পারিজাত কুঞ্জ নিকেতন,
সুর বিলাসিনীকুল বিহরে যেথায়,
সোমরস সুরাপানে, উন্মত্ত উন্মুক্ত প্রাণে,
মোহ মুগ্ধ কর্ণে শোন অপ্সরার গান ;
সে ভোগ তোমারি ভাগ্যে ওহে ভাগ্যবান্ !

(৫)

কল্পনা-বিমান-রথ অপূর্ব্ব তোমার,
সজ্জিত স্বর্গীয় পুষ্পে পুণ্য-পতাকায়,
পৃথিবীর মলিনতা অশান্তি আগার,
ত্যজি' অনেক উর্দ্ধে নিয়ে চলে যায়,
শত স্বপ্নরাজ্য পারে, শান্তি-মন্দিরের দ্বারে,
শোকতাপ নিরানন্দ পরিশূন্য দেশে,
অপ্রীতির পূতিগন্ধ যেথা না প্রবেশে।

(৬)

তোমার প্রসাদে পঙ্গু লঙ্ঘে হিমাচল,
তোমার প্রসাদে মূর্খ হয় সুপণ্ডিত,
তোমার প্রসাদে রুগ্ন লভে স্বাস্থ্য, বল,
তোমার প্রসাদে মূক গায় সুললিত।
তুমি সুপ্রসন্ন যারে, সে ভয় করিবে কারে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলে তার ;
সুফল কুফল ফলে ইচ্ছায় তোমার।

(৭)

সুচতুর যাদুকর কৌশলে যেমন,
কটিতে বাঁধিয়া ডুরি নাচায় বানরে ;
অন্তরে থাকিয়া নিজে তুমিও তেমন,
করিতেছ আকর্ষণ ভাগ্য-সূত্র ধ'রে।
ভিখারী সাজায়ে কারে, গৃহস্থের রুদ্ধদ্বারে,
ফিরাও বৃথায়, তীব্র জঠরাগ্নি দিয়া,
হা অন্ন রবে সে মাটি ভিজায় কাঁদিয়া।

(৮)

কাহারে স্বর্ণ সৌধে রাখিয়া যতনে,
ক্ষীর, সরে, পুষ্ট কর ক্রম কলেবর,
অফুরন্ত ধনরত্ন পুত্র পরিজনে—
পরিবৃত সদা, হাস্য-পূর্ণ-ওষ্ঠাধর।
যারে দাও হিংসা দ্বেষ, দেখিতে পরের ক্লেশ,
সতত উৎসুক সেই দুষ্ট দুরাচার,
স্বার্থপর, শুধু খোঁজে সুখ আপনার।

(৯)

জীবাত্মা বা পরমাত্মা জানিনা কেমন,
কবির কল্পনা বলি অনুমান হয়;
বুঝিতে পারিনা কিছু শাস্ত্রের বচন,
তোমার অস্তিত্বে কিন্তু নিত্য নিঃসংশয়;
অরূপ যদিও বটে, প্রতি ঘট প্রতি পটে,
তোমার জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখি বিদ্যমান,
সর্ব্বব্যাপী তুমি, সর্ব্ব কর্ম্মের নিদান।

(১০)

ভক্তি, প্রীতি, ধৃতি, স্মৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল,
শম, দম, সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, বিনয়,
তিতিক্ষা, সন্তোষ, দয়া, সঞ্চিত সকল
অক্ষয় ভাণ্ডারে তব, ফুরাবার নয়;
যে যাহা প্রার্থনা করে, দাও তাহা অকাতরে,
জ্ঞান, মান, সুখৈশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়-বিষয়;
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি, তোমাতেই লয়।

(১১)

জপ, তপ, পূজা, ধ্যান, ধারণা, সমাধি,
তোমার সংযোগ বিনা সকলি নিষ্ফল,
আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যোগবল আদি,
দেহ জড় বস্তু মাত্র ইন্দ্রিয় বিকল।
তোমা বিনা আঁখি অন্ধ, নাসিকা না পায় গন্ধ;
শ্রবণ বধির, ত্বক্ স্পর্শ-বোধ-হীন,
রসনা আস্বাদ-শূন্য; মরুভূমে মীন।

(১২)

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বেদে যাঁরে কয়,
শুদ্ধ, স্বত্ব, গুণাতীত, অনাদি অশেষ,
সত্য, নিত্য, নির্ব্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়,
এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ,
অসীম চৈতন্য সিন্ধু, হ'য়ে তার এক বিন্দু,
পঙ্কময় "দেহভাণ্ডে" আবদ্ধ হইয়া,
কি সুখে রয়েছ মন! ক্ষুদ্রত্ব লইয়া?

(১৩)

জ্ঞানদণ্ডে "আমি-ভাণ্ড" চূর্ণ ক'রে দাও;
ঘুচে যাক্ ব্যবধান অস্থায়ী অসার,
আপনারে চিরস্থায়ী অনন্তে মিশাও,
মহাসিন্ধু সনে বিন্দু হোক একাকার।
রামকৃষ্ণ নাম রথে, চড়ি চল সেই পথে,
সংসার-শ্মশানে কেন দাঁড়াইয়া আর,
ছুটেছে মোহের নেশা, টুটেছে আঁধার।

(১৪)

ওই শোন কাণে তাঁর করুণ আহ্বান,
অনন্ত অম্বর হ'তে বোলে আয়, আয়;
ধরিয়াছে মর্ম্মগ্রন্থী-ছিন্নকারী টান;
অসহ বিরহ ব্যথা সহা নাহি যায়।
সব কায থাক প'ড়ে, সব যাক্ জ্ব'লে পুড়ে,
আমি যাঁর তাঁর কাছে নেযাও আমায়;
এ মহা মিলনে মন তুমিই সহায়।

শ্রী—